রাণী লক্ষ্মীবাঈ

ঐতিহাসিক চরিতাখ্যান

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি.
২০৪, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

দাম তিন টাকা

প্রিণ্টার :—শ্রীপরাণচন্দ্র ঘোষ
পরাণ প্রেস
৫৭।২, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

পরিচয়

মাসিক বসুমতী পত্রিকায় এই দীর্ঘ কাহিনীটি ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। তৎপরে শ্রীগুরু গ্রন্থ-প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী প্রীতিভাজন শ্রীভুবনমোহন মজুমদারের আগ্রহে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। তেজস্বিনী, মনস্বিনী, ধর্মপ্রাণা, কর্মময়ী, নারী কুলোত্তমা রাণী লক্ষ্মীবাঈএর সমগ্র জীবনকথা ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকবর্গের সহিত ইতিহাসের প্রমাণ-পঞ্জী অবলম্বনে নূতন ধরণের এই চরিত-আখ্যায়িকায় বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠাগারে আদর্শ গ্রন্থমালার তালিকাভুক্ত হইবার এবং উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ পাঠ্য, তথা—দ্রুতপাঠ্য ও পারিতোষিক শ্রেণীভুক্তির দাবী যে ইহার কতখানি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণই সে সম্বন্ধে বিচার ও বিবেচনা করিবেন।

সাহিত্য-ভবন
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আষাঢ়-১৩৬১ (জুন-১৯৫৪)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্পণ

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীগোবিন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে—

সম্প্রীতি ও আত্মীয়তা-বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ

বহুযত্নে রচিত এই গ্রন্থখানি

সাদরে সমর্পিত হইল

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণী লক্ষীবাঈ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা

স্বাধীন ভারতে যেরূপ ঘটা ও আড়ম্বরে গুর্জর প্রদেশে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দীপ্তিময়ী তারকা বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈএর স্মৃতি-মন্দিরও সেইরূপ বিশেষ আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর যোগ্য স্মৃতিরক্ষা করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাহিরে সিঙ্গাপুরে তাঁর বিখ্যাত আজাদ হিন্দ বাহিনীর নারী-শাখা-রূপে ঝাঁসীর রাণী বাহিনী গঠনে অবহিত হয়ে। অবশ্য ১৮৫৮ অব্দের ১লা জুন তারিখে তৎকালীন যে সিন্ধিয়া-মহারাজের গোয়ালিয়র দুর্গের সহিত রাজধানী অধিকার করে রাণী লক্ষ্মীবাই পরে ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ ও স্যার রবার্ট নেপিয়ারের সম্মিলিত বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ১৮ই জুন গোয়ালিয়ারের বক্ষেই রণমৃত্যু বরণ করেন, তার সোত্তর বছর পরে ১৯২৯ অব্দে সেই সিন্ধিয়া মহারাজের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী রাজপ্রাসাদ সন্নিহিত রাজপথের পাশে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা পাঁচ-ছয়-কাঠা পরিমিত একটি ক্ষুদ্র উদ্যান মধ্যে রাণী লক্ষ্মীবাঈএর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সমাধি মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। ছয় সাত হাত উঁচু ইটের চবুতারার গায়ে প্রস্তর ফলকে রাণীর বিপুল শৌর্য্য ও রণমৃত্যুর কাহিনীও খুব সংক্ষেপে উৎকীর্ণ করা হয়। রাণীর প্রতি চির বিদ্বেষী ইংরেজ সরকারের আমলে সিন্ধিয়া মহারাজের পক্ষে এর চেয়ে বেশী আড়ম্বরে রাণীর স্মৃতি-মন্দির তোলা হয়ত সম্ভবপর ছিলনা, বরং এই দুঃসাহসিকতার জন্য তিনি তৎকালে দেশবাসীর প্রশংসা লাভও করেছিলেন, কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র নায়কগণের পক্ষে দেশবিশ্রুত

কীর্তি এই পুণ্যশ্লোকা নারীদেবীর উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে।

উক্ত প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ কাহিনী থেকে প্রকাশ পায় যে, ১৮৫৮ অব্দের ১৮ই জুন রাণী লক্ষ্মীবাঈ গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে হাতাহাতি যুদ্ধে নিহত হন। রাণীর বিশ্বস্ত দেহ রক্ষীরা রণক্ষেত্রের অদূরেই তাঁর পবিত্র দেহের সৎকার করেন। ভারত ইতিহাসের গৌরবোজ্জল চরিত্র—ভারতীয় নারীত্বের একটি ভাস্বর অবদান মহীয়সী বীরাঙ্গনা রাণীলক্ষ্মীবাঈএর জীবন-দীপ এই ভাবে এই স্থানেই অকালে নির্বাপিত হয়।

ইংরেজ ঐতিহাসিক কিনকেড্ রাণী লক্ষ্মীবাঈএর গোয়ালিয়ার বিজয় ও গোয়ালিয়রের যুদ্ধে মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা বলেছেন। যথা: কাল্পীর পরাজয়ের পর দশ দিনের মধ্যেই রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তান্তিয়া তোপী ও রাও সাহেবের নেতৃত্বে সিপাহীরা গোয়ালিয়ার আক্রমণ করে। দুর্গের বিদ্রোহভাবাপন্ন সিপাহীদল ছাড়াও মহারাজার বাহিনীতে দশ হাজার বিশ্বস্ত দেহরক্ষক, সাত হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী ও কয়েক শত গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। মহারাজ ইউরোপীয় সেনানীদের তত্ত্বাবধানে এই সুশিক্ষিত ও পরাক্রান্ত বাহিনী নিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে আক্রমণকারী সিপাহীদের বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। ইউরোপীয় পরিচালকদের নেতৃত্বে মহারাজের সুবিখ্যাত গোলন্দাজ বাহিনী অবিশ্রান্তভাবে গোলবর্ষণ করে সিপাহী-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। সেই সময় রাণী সহসা ঘোড়ায় চড়ে মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁর নিজস্ব সওয়ারদের নিয়ে ঝড়ের বেগে গোলন্দাজ-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতাহাতি যুদ্ধে তাদের হঠিয়ে দিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল, এবং যেখানে সিপাহীপক্ষের ছত্রভঙ্গ হবার কথা, শুধু এই রাণীর বীরত্বে পরাক্রান্ত গোয়ালিয়ার বাহিনীই ভেঙ্গে পড়ল। মহারাজ তখন হতাবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে আগ্রা অভিমুখে পলায়নপর হলেন। বিপুল রণসম্ভার সহ গোয়ালিয়র

দুর্গ সিপাহীদের হস্তগত হলো। এইসঙ্গে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত গোয়ালিয়রের তোষাখানার প্রভুত ধনসম্পদও বিজয়ী পক্ষের আয়ত্তে আসায় আবার নূতন করে তাদের ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল।

রাণী লক্ষ্মীর অসামান্য শৌর্য্যে এই বিজয় সাধিত হলেও, রাওসাহেব অধিনায়করূপে এখানে সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। নায়কস্থানীয় বিভিন্ন দলপতিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি দরবারের নামে সৌখীন মজলিস বসিয়ে আমোদ প্রমোদে কালহরণ করতে লাগলেন। সিন্ধিয়ার রাজকোষের বিপুল অর্থে পদস্থ ব্যক্তিদের ভোজ-পর্ব চলল বিশাল প্রাসাদ যুড়ে। এই সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায় এবং প্রার্থী প্রত্যার্থীদের তুষ্টি কল্পে দান-সাগর উৎসব চলল দিনের পর দিন ধরে। বিজয় উৎসবের এগুলি যে অপরিহার্য্য অঙ্গ, বিজয়ী রাওসাহেবের পক্ষে কি এর ব্যতিক্রম সম্ভব?

রাওসাহেবের এই কাণ্ড দেখে রাণী উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর কাজের প্রতিবাদ করলেন: এসব আপনি কি করছেন? এখন কি এভাবে অর্থ নষ্ট করবার সময়? গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া মহারাজের অসংখ্য দলত্যাগী সিপাহী রয়েছে, বহুকাল ধরে তারা বেতন পায়নি, যে বিপুল ধনসম্পদ সিন্ধিয়ার কোষ থেকে পাওয়া গেছে, তা থেকে আগে ওদের টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করে আমাদের দলভুক্ত করা হোক। পূর্ব্বে ইংরেজ সেনানীরা এদের চালনা করত, এখন বেছে বেছে মারাঠা সেনানী নিযুক্ত করে এদের নিয়ন্ত্রিত করুন। রোজ সাহেব চুপ করে নেই, শীঘ্রই গোয়ালিয়ার উদ্ধার করতে আসবেন। আমাদের এখন এক মুহূর্ত্তও বাজে কাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

রাওসাহেব কিন্তু রাণীর কথায় কাণ দিলেন না, তিনি বললেন: আমরা ভালো ভাবেই জেনেছি যে, রোজ সাহেব এখন লড়াই করতে আসবে না— যেহেতু সামনে বর্ষা কাল। এরই মধ্যে আমরা সব ঠিক করে নেব, আর— এগুলোও করণীয় কাজ।

কিন্তু রাণীর কথাই নির্ঘাত সত্য হয়ে দাঁড়ল। গুপ্তচর মুখে

গোয়ালিয়রের খবর পেয়ে জেনারেল রোজ আর বর্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। ইতিমধ্যে স্যার রবার্ট নেপিয়ার নূতন মারাণাস্ত্র এনফিল-রাইফেল-সজ্জিত নবাগত গোরা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তিনি পরিপূর্ণ উৎসাহে সম্মিলিত সেনাদল নিয়ে একেবারে গোয়ালিয়রের উপকণ্ঠে এসে পড়লেন। তখন রাওসাহেবের চৈতন্য হলো। রাণীও রাওসাহেবের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে দূরবর্তী ঘাঁটিতে কর্মব্যস্ত নানা সাহেবকে অবিলম্বে গোয়ালিয়রে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই রোজ সাহেব গোয়ালিয়র আক্রমণ করে তাঁর এ প্রয়াস ব্যর্থ করে দিলেন। ১৭ই ও ১৮ই জুন দুদিন অহোরাত্র সহরতলী ও সহর যুড়ে যুদ্ধ চলে। ১৮ই জুন জেনারেল স্লিম নূতন সেনাদল নিয়ে ইংরেজ পক্ষে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধের গতি ফিরে যায়। এই যুদ্ধের পর কি ভাবে রাণীর মৃত্যু হয় গ্রন্থ শেষে তা বিবৃত হয়েছে এবং সেই কাহিনীই যথার্থ।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ

প্রথম পর্ব

বাল্যলীলা

(১)

ইংরেজদের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। প্রায় সারা ভারতবর্ষের রাজপাটগুলি তারা দখল করে বসেছে। কলকাতা হয়েছে বৃটিশ ভারতের রাজধানী। একশো বছর আগেও ইংরেজ এ দেশে বণিক-বেশে এসে বাণিজ্যের বেসাতি করত—তার কুঠি নির্মাণের জন্যে স্থানের প্রত্যাশায় এ দেশের রাজাদের দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে কত ধর্ণা দিত, প্রার্থনা জানাত। কিন্তু কালের এমনি আশ্চর্য্য গতি আর নিয়তির অদ্ভুত পরিহাস যে, সেই রাজাদের অপদার্থ বংশধরেরাই হলেন ইংরেজের কৃপা-ভিখারী! কেউ রাজপাট রক্ষায় অসমর্থ হয়ে—রাজ্য প্রজা ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে তার বিনিময়ে বাঁধা বৃত্তি পেয়েই সন্তুষ্ট। কেউ বা ইংরেজের অভিপ্রেত অবমাননাকর সর্ত্তে আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ হয়ে

কোন রকমে রাজপাট বজায় রেখেছেন। কথায় কথায় এঁদের ইংরেজ রেসিডেণ্টের মন যুগিয়ে চলতে হয়—পাণ থেকে যদি চুণটুকু খসে তাহলে আর নিস্তার থাকে না—এমনি তাঁদের অবস্থা। কিন্তু রাজ্যের মায়ায় রাজারা নত-মস্তকে ইংরেজের প্রভুত্ব স্বীকার করলেও, রাজপরিবার বা রাজসভায় এমন অনেক স্বাধীনচেতা বিচক্ষণ মনীষীও ছিলেন, যাঁরা এ ভাবে বিদেশী শাসকের মন জুগিয়ে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদ আঁকড়ে পড়ে থাকতে আর রাজি হলেন না—রাজ্য ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে তাঁরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন। হিন্দুরা রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে হলেন কাশীবাসী। আর মুসলমানরা মক্কায় বা ভারতের বাহিরে মুসলমান-রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

মহারাষ্ট্র-চক্রের নেতা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮১৮ সালে যখন তাঁর রাজপাট ইংরেজকে অর্পণ করে বৃত্তি নিয়ে বিঠুরে বসবাস করতে গেলেন, তখন তাঁর রাজধানী পুণায় হাহাকার পড়ে গেল। সেই দুঃসময়ে পেশোয়ার স্নেহধন্য বহু পদস্থ রাজপুরুষ রাজনীতির সংস্রব ছিন্ন করে বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নেবার আশায় কাশী যাত্রা করলেন। এই দলে ছিলেন ভূতপূর্ব্ব পেশোয়ার অনুজ চিমনজী আপ্পা এবং তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন কর্ম্মচারী মোরপন্থ তাম্বে। এঁর পিতা বলবন্ত রাও পেশোয়ার জনৈক সেনানায়ক ছিলেন। পেশোয়ার পতনের পর পুণার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন বিঠুরে তাঁর অনুগমন করেন,

সে সময় চিমনজীও আহূত হয়েছিলেন। কিন্তু এই দারুণ বিপর্য্যয়ে চিমনজী এমন গভীর ব্যথা পেয়েছিলেন যে, ইংরেজের বৃত্তিভোগী অগ্রজের সংস্পর্শও তাঁর পক্ষে বিষের মত অসহ্য হয়েছিল। তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কাশীবাসই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

চিমনজী আপ্পার বাসভবনেই* মোরপন্থ তাম্বে বাস করতে লাগলেন। কাশীর এই নিভৃত অঞ্চলটি উদ্বাস্তু বহু মারাঠী-পরিবারের সমাগমে অল্প দিনের মধ্যেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। মোরপন্থ সপরিবারে চিমনজী আপ্পার সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। চিমনজী আপ্পার মত মোরপন্থজীও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; উভয়েই তেজস্বী ও ধর্ম্মশীল—শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার ভিতর দিয়ে সদ্ভাবেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল।

কিছু কাল পরে পন্থজীর পত্নী ভাগীরথী বাঈ এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করলেন। এই কন্যাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। কিন্তু পিতা কন্যার নাম রাখলেন—মনুবাঈ। এই নামেই ইনি শৈশবে পরিচিতা হলেন।

সাধারণতঃ মারাঠী কন্যারা স্বাস্থ্যবতী, রূপসী ও বলশালিনী হলেও পন্থজীর এই কন্যাটি বাল্যকালেই স্বাস্থ্য, রূপ ও শক্তিতে

* কাশীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের সামনে সংকীর্ণ রাস্তার অপর পারে সেই পুরাতন বাড়ী আজও বিদ্যমান। এই বাড়ীখানির মধ্যে বহু কক্ষ; নিম্নতলে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলি আজও পূজিত হয়ে থাকে।

সমবয়স্কা মেয়েদের প্রত্যেককে অতিক্রম করে অতুলনীয়া হয়ে উঠলেন। এই অপরূপা বালিকা যেন বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শুধু রূপে নয়, দৈহিক শক্তি ও নানাপ্রকার বিশিষ্ট গুণের জন্য শৈশবেই তিনি সবার আলোচ্য হয়ে উঠলেন। কিন্তু পন্থজীর অদৃষ্টক্রমে প্রবাস-জীবনের এই সুখটুকু আকস্মিক এক শোকের আঘাতে বিকৃত হয়ে গেল—তাঁর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ভাগীরথী বাঈ অকালে কাশীলাভ করলেন। পন্থজী একসঙ্গে পিতা ও মাতার স্নেহ নিয়ে কন্যা মনুকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। শৈশবেই মনু ধর্ম্মশীলা ও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি-মতী হয়ে ওঠেন। অনুকূল পরিবেশেই এ সুযোগ ঘটে। বাড়ীর সামনেই মহামায়ার মন্দির, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে শত শত ভক্তকণ্ঠের 'মা মা' ধ্বনি অন্তরে জাগায় ভক্তির প্রেরণা; বাড়ীতেও দেবার্চ্চনার নিত্য নিয়মিত ব্যবস্থা, পণ্ডিতদের পূজাপাঠ, শাস্ত্রালোচনা; বাড়ীর নিম্নেই কাশীর পবিত্র গঙ্গা—সেখানেও ভক্তবৃন্দের মধুর বন্দনা জলের তালে-তালে প্রাণে আনন্দের স্পন্দন তোলে। এমন বিশুদ্ধ পরিবেশের প্রভাবে বালিকার শিশু-মন যেমন ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়, পক্ষান্তরে শক্তিরূপা মহামায়ীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত শক্তির প্রতীকগুলিও বালিকাকে শক্তিময়ী করে তোলে। শাক্ত পুরোহিত যখন তারস্বরে ভদ্রকালীর স্তোত্র পাঠ করেন, বালিকা তখন তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠের সময় বালিকা মনু সব কাজ ফেলে সবার

আগে সেখানে গিয়ে দাঁড়ান—মনোযোগ দিয়ে শোনেন রণচণ্ডীর রণলীলার অপূর্ব্ব আখ্যান। বালিকার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে—নিত্য নিয়মিত ভাবে শুনে-শুনে চণ্ডীর দুরূহ শ্লোকগুলিও কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। এর ফলে শিশু-বয়সেই বালিকা নিজেকে শক্তিরূপা মনে করে সমবয়স্ক সকলের উপরেই প্রভুত্ব স্থাপন করতে চাইতেন। শিশুদের সঙ্গে খেলাতেও তাঁর শক্তির লীলা প্রকাশ পেত; খেলা-ঘরের খেলার ধারা মনুই মাথা খেলিয়ে বার করেন; সেই খেলায় এক জন হবে রাণী, তার পরে মন্ত্রী সেনাপতি নগরপাল পাত্র-মিত্র রাণীই দল থেকে বেছে নেবেন। তার পর থাকবে সৈন্য প্রহরী প্রজা। এদের মধ্যে অভিযোক্তা, অপরাধীও থাকা চাই—কেন না, রাণী তাদের বিচার করবেন। দলের প্রত্যেকেই চায় রাণী হোতে—কিন্তু চাইলেইতো রাণী হওয়া যায় না; তার জন্যেও পরীক্ষা থাকে। পরীক্ষায় জয়ী না হলে রাণী হবার যো নেই। এর জন্যে এক-এক দিন এক-এক রকমের পরীক্ষা হয়। এক দিন হয়ত দৌড়ের ব্যবস্থা হলো। একটা স্থান ঠিক করে বলা হলো—একসঙ্গে সবাই দৌড়াতে সুরু করে সবার আগে সেই স্থানটিতে যে পৌঁছিতে পারবে—সেই হবে সেদিনের জন্যে রাণী। এর পর বালক-বালিকাদের দল বেঁধে একসঙ্গে ছোটবার কি ধুম! কিন্তু এই দৌড়-বাজীতে মনুই সবার আগে ঘুঁটি ছুয়ে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে সেদিনের রাণীর আসনটি দখল করে নেন, আর দলের সকলেই তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য হয়। এখানে কেউ অবাধ্য

হলেই মুস্কিল; রাণী তখন রণমুখী হয়ে তাকে এমন শাস্তি দেবেন যে, কারুর সাধ্য হয় না তাতে বাধা দিতে। এই জন্যে দলের সকলেই মনুকে ভয় করে, তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ বড় একটা সাহস পায় না।

এক দিন এমনি একটা খেলায় রাণী হয়ে মনু একটা অবাধ্য ছেলেকে রীতিমত শাস্তি দেন। ছেলেটি তখন সরোদনে বলতে থাকে: বর্গীদের মেয়ে কি না, তাই এমনি মারকুটে!

মনুর ইচ্ছা ছিল, ছেলেটিকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করবেন—কেন সে তাকে বর্গীর মেয়ে বললে! কিন্তু ছেলেটি কথাটা বলেই পাথরের আসন থেকে মনুর ওঠবার আগেই ছুটে পালিয়ে যায়। কথাটা কিন্তু মনুর মনে ব্যথা দেয়; তাই তিনি তখনি খেলা ভেঙে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

চিমনজী আপ্পা তখন বৈঠকখানায় বসে পন্থজীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছিলেন। সেখানে আরও কয়েক জন পণ্ডিত বসেছিলেন। এমন সময় মনু তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকে পন্থজীর কোলের কাছে বসে পড়ে বললেন: বাবা, একটা ছেলে আজ আমাকে বর্গীর মেয়ে বলেছে। আমি তাকে শাস্তি দেব; কিন্তু তার আগে জানতে চাই—কেন আমাকে ও-কথা বললে? আমরা কি বর্গী? এ কথার মানে কি বাবা?

বালিকার মুখে এমনি তেজের কথা শুনে ঘরশুদ্ধ সকলেই অবাক্ হয়ে তার আরক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে রইলেন। পন্থজী আস্তে-আস্তে মেয়ের মাথায় হাতখানি রেখে শ্রদ্ধেয় চিমনজীর

দিকে চেয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন: তোমার কথা বাপুজী শুনেছেন, উনিই বলবেন মা—বর্গী কাদের বলা যায়, আর—ও কথার মানে কি?

চিমনজীকে মারাঠীরা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বাপুজী বলতেন। সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ এবং মিষ্টভাষী সদাশয় ব্যক্তি ইনি। মুখখানি প্রসন্নতায় ভরা, সর্ব্বক্ষণই যেন মিষ্ট হাসির আভায় ঝলমল করছে। মনু তাঁরও পরম স্নেহের পাত্রী—মহাভারতের ও মহারাষ্ট্রের যোদ্ধাদের কত গল্পই তিনি তাকে প্রত্যহ শুনিয়ে থাকেন। বালিকার কথা শুনে এখন তাঁর মনে পড়ল—এ সম্বন্ধে কিছুই তিনি মনুকে বলেননি। তাই অপরাধীর মত মুখভঙ্গী করে তিনি মনুর দিকে চেয়ে বললেন: এর জন্যে তোমার বাপুজীই দায়ী মা, কেন না, বর্গীদের কথা কোন দিনই তোমাকে বলিনি; এখন বলছি মা, শোনো: শিবাজী মহারাজের গল্প তোমাকে বলেছি—মনে আছে ত?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে মনু সেই মহাপুরুষকে যোড়হাতে প্রণাম জানালেন। বাপুজী বলতে লাগলেন: শিবাজী মহারাজের অনেক রকমের সৈন্য ছিল। যারা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই করত, তাদের বলা হোত পদাতিক। আবার ঘোড়ায় চড়ে যারা যুদ্ধ করতে যেত, তারা অশ্বারোহী বলে গণ্য হোত। এদের আবার দু'টো দল ছিল। যে-সব মারাঠা যোদ্ধা রাজার পরোয়া না করে দেশের খাতিরে নিজেরাই হামরাই হয়ে ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-পোষাক নিয়ে যুদ্ধের সময় হাজির হোত,

তাদের নাম ছিল—'শিলাদার'। আর যারা সরকার থেকে ঘোড়া, সাজ-পোষাক, অস্ত্র-শস্ত্র ও নিয়মিত বেতন পেত, তাদের বলা হোত—'বারগীর'। এই বারগীর কথাটাই কালে 'বর্গী' হয়ে দাঁড়ায়। এদের গল্প তোমাকে পরে বলব মা!

এ সব কথা সেই বয়সে মনু কত দূর বুঝেছিলেন বলা যায় না; কিন্তু এই প্রশ্ন থেকে বালিকার অনুসন্ধিৎসা দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হোলেন। এক মারাঠী জ্যোতিষী সেদিন চিমনজীর কাছে এসেছিলেন; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতক্ষণ বালিকাকে দেখছিলেন। চিমনজীর কথার পর তিনি মনুকে কাছে ডেকে তার হাতের রেখাগুলি নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করতে লাগলেন। খানিক পরে তিনি পন্থজীকে লক্ষ্য করে বললেন: আপনার মেয়ের হাতে যে চিহ্ন দেখছি পন্থজী, তাতে রাজরাণী হবার কথা।

পন্থজী অবিশ্যি কথাটা প্রত্যয় করলেন না; তাঁর মত পরাশ্রিত বিত্তহীনের কন্যা রাজরাণী হবে, এ যে কল্পনারও অতীত। সাধারণত তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, দুরাশাকেও মনে স্থান দিতেন না। মৃদু হেসে তিনি জ্যোতিষীর কথাকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু জ্যোতিষী তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন: আমার কথা মনে রাখবেন পন্থজী, ভবিষ্যতে এ কথা মিলিয়ে নেবেন—ঠিক সময়েই আমি দেখা করব।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে চিমনজী আপ্পা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ব্যাধি থেকে এ

যাত্রা আর রক্ষা পাবেন না। আশ্রয়দাতার এই অবস্থা দেখে পন্থজীও ভেঙে পড়লেন। মনু খেলা-ধূলা সব ছেড়ে বাপুজীর শিয়রে বসে অক্লান্ত ভাবে সেবা করেন; একটু অবসর পেলেই ছুটে গিয়ে মন্দিরে দেবী প্রতিমার সামনে জানু পেতে বসে আর্ত্ত স্বরে প্রার্থনা করতে থাকেন: তুমি ত মঙ্গলময়ী মা—সর্ব্বমঙ্গলা তুমি, আমার বাপুজীকে ভালো করে দাও!

এ কথাও বাপুজীর কানে যায়, তিনি মনুর মৃণালের মতন হাত দু'খানি ধরে গাঢ় স্বরে বলেন: আমার জন্যে তুমি নাকি মন্দিরে মহামায়ীর কাছে ভারি কান্নাকাটি কর, মাথা খোঁড়! ছি মা, তাতে যে দেবী ব্যথা পান। এখানে থাকার দিন যদি শেষ হয়ে থাকে আমার, মা কি তা রদ করতে পারেন? তাঁকেও যে নিয়ম মেনে চলতে হয়। দেখো মা, এই নিয়ে যেন মন্দিরের মায়ের উপর অভিমান ক'র না, বিশ্বাস হারিয়ো না? তিনি মঙ্গলময়ী, যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

বাপুজীর কথা শুনে মনুর ম্লান মুখখানি অশ্রুধারায় ভরে যায়—তার বুকের ভিতর কে যেন হাহাকার করে ওঠে।

মৃত্যুর আগে চিমনজী আপ্পা পন্থজীকে ডেকে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন: আমার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হলে তুমি মনুকে নিয়ে বিঠুরে যেও। অভিমান করে এখানে পড়ে থেকে কোন লাভ নেই। তুমি গেলে আমার দাদা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন। মনুর জন্যেই তোমাকে যেতে হবে—এ কথা মনে রেখো!

এর পর চিমনজী আপ্পা ইষ্টদেবতার নাম নিয়ে একদা দেহত্যাগ করলেন। এই সদাশয় মহাপ্রাণ ঋষিতুল্য মনীষীর মৃত্যুতে কাশীবাসী মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। কাশীর মত বিঠূর ও পুণায় তাঁর আত্মীয় স্বজন ও গুণমুগ্ধগণ শোকে অভিভূত হলেন। বিঠূরে ইংরেজের বৃত্তিভোগী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অনুজ আপ্পাজীর মৃত্যুসংবাদে নিদারুণ আঘাত পেলেন; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আত্মীয় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাশীতে পাঠালেন আপ্পাজীর পরিজনদের সঙ্গে তাঁর পরিবারভুক্ত সকলকেই সাদরে বিঠূরের প্রাসাদে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। এবার তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। অনুরুদ্ধ হয়ে পন্থজীও সকন্যা আপ্পাজীর পরিজনবর্গের সঙ্গে বিঠূরে গেলেন।

(২)

আপ্পাজীর অন্তিম বাণী বর্ণে-বর্ণে ফলে গেল; তাঁর অগ্রজ দ্বিতীয় বাজীরাও পন্থজী ও তাঁর আদরিণী কন্যা মনুবাঈকে পরমাদরে গ্রহণ করলেন। রাজপাট ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে বিঠূরে এসেও ইনি বিরাট জাঁকজমকে অতীতের বাহ্যিক ঠাট-ঠমক সব বজায় রেখে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী বিলাসী রাজার মত বিশেষ দপদপায় জীবনযাপন করছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে কোন রাজ্যের রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর অদৃষ্টে নানা দুর্ভোগই ঘটে থাকে—যু[illegible] বিজেতার কাছে পদে পদে তাঁকে অপদস্ত হতে

হয়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত রাজ্যচ্যুত পেশোয়ার সম্বন্ধে চিরা-চরিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে পন্থজী ও তাঁর কন্যা মন্নুবাঈ অবাক হয়ে গেলেন। বালিকা হলেও, বাপুজীর কাছে নানা দেশের যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্প শুনে মন্নুর মনেও এই ধারণা হয়েছিল যে, বাপুজীর মতন তাঁর দাদাও বুঝি বিঠুরে এসে খুব সাধারণ ভাবেই কালযাপন করেন। কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে সে ভুল তাঁর ভেঙে গেল। বড় বড় রাজাদের রাজৈশ্বর্য্য, নানা রকম জাঁকজমক আর দপদপার যে-সব গল্প মন্নু বাপুজীর কাছে শুনেছিলেন, বিঠুরে এসে তার প্রত্যেকটি চাক্ষুস দেখে চমকে উঠলেন। রাজবাড়ীর সেই প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, দ্বার-মুখে সশস্ত্র প্রহরী, বিশাল প্রাঙ্গণে পাহাড়ের মত কত সব অতিকায় হাতী, কত জাতের কত ঘোড়া; গল্পের সেই চমৎকার বাগান—কত রকমের বাহারী গাছ, কত রঙ-বেরঙের ফুটন্ত ফুলের বাহার, কৃত্রিম পাহাড়ের কেমন সুন্দর ঝরণা—যেন সত্যিকার পাহাড় থেকে ঝুর-ঝুর করে জল পড়ছে। কত সুন্দর সুন্দর হরিণ, ময়ূরগুলো প্যাখম তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ছুটছে—খেলা করছে। ওদিকে কত বড় বাড়ী, এক মহলের পর আর এক মহল, তার পর আর এক মহল, যেন শেষ হয় না; রাজবাড়ী ত নয়—যেন মস্ত একখানা সহর। তার পর ঘরগুলি কি সুন্দর; ঘরে ঘরে কত সব ছবি, কত দামী দামী মহার্ঘ্য আসবার-পত্র—হাতীর দাঁতের খাট-পালঙ, বসবার আসন,—আরো কত কি! কত রকমের বাতিদান, দেওয়ালগিরি, ঝুলানো আলোর ঝাড়।

দরজার গায়ে জানালার গরাদের উপরে কিংখাপের পরদা ঝুলছে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত বসন-ভূষণ—মণি-মুক্তার বাহার। অন্দর-মহলে যেমন অসংখ্য পরিজন, তেমনি তাদের পরিচর্য্যার জন্যে কত দাস-দাসী। বহির্মহলে কি অপূর্ব্ব মন্দির—মাথার চুড়োগুলি সোনা দিয়ে মোড়া, ভিতরের কারুকাজ দেখলে চোখ ঝলসে যায়; আর যেমন অনুপম দেবমূর্ত্তি, তেমনি অপরূপ তাঁর সাজ-সজ্জা—স্বর্ণখচিত রত্নালঙ্কারগুলির আভা বুঝি সূর্য্যের প্রভাকে ম্লান করে দিচ্ছে। দেউড়ীর উপরে নহবতখানা—প্রহরে প্রহরে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নানাবিধ বাদ্যের সুর। এক দিকে দেওয়ান সাহেবের সেরেস্তা ও মহাফেজখানা। সেখানে নানা ধরণের লোকজন সব গিস্-গিস্ করছে। মহাফেজখানায় যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ, বিচার-সংক্রান্ত নথী ও কাগজপত্র। অন্য দিকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয়—প্রত্যহ দুই বেলা বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। এর পরে আরও ভিতরে পেশোয়ার সভাগৃহ। রাজসভার যে সব গল্প মনু শুনেছেন—জাঁকজমকপূর্ণ এই সভাগৃহের সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছে। পুণায় যে রাজকীয় আসনে বসে মহাপরাক্রান্ত পেশোযাগণ একদা আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের উপর শাসনদণ্ড চালনা করতেন, পতনের পরও রাজ্যচ্যুত পেশোয়া সেই মহান্ আসন বিঠুরের প্রাসাদে এনে নূতন করে 'পেশোয়ার গদী' স্থাপিত করেছেন। এই আসনে বসে তিনি এখন বিঠুরের জায়গীর শাসন করে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে থাকেন।

আগেই বলা হয়েছে, পেশোয়া সকন্যা পন্থজীকে সাদরেই তাঁর এই বিপুল জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু আশ্রিত ভাবে গ্রহণ করা নয়, তাঁকে সেরেস্তার একটি বিশিষ্ট পদে নিয়োগ করে যথেষ্ট মর্য্যাদা দানেও কার্পণ্য করেননি। পেশোয়ার সভায় পন্থজীকে বিশিষ্ট সভাসদরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়, আর পন্থজীর কন্যা কুমারী মন্নুবাঈ প্রথম দিনেই পেশোয়াকে একেবারে যেন বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেন। বালিকাকে দেখেই সভার সকলের সামনেই পেশোয়া বলে ওঠেন: বা, বা! কি চমৎকার মেয়ে আপনার পন্থজী? এমন রূপ ত কখনো দেখিনি!

পিতার পাশেই কন্যা মন্নু স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। পেশোয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কি মা?

মৃদু হেসে কন্যা উত্তর দিলেন: মন্নুবাঈ।

পেশোয়া বললেন: এ রূপের সঙ্গে ও নাম মানায় না, তুমি যেন 'ছবেলী'—আমরা তোমাকে ছবেলী বলে ডাকব। কেমন? এ নাম তোমার পছন্দ হয়েছে মা?

তেমনি মৃদু হেসে বালিকা তাঁর সুন্দর গ্রীবাটি একটু দুলিয়ে সম্মতি জানালেন। মারাঠা ভাষায় ছবেলী শব্দের অর্থ 'ময়না'। পেশোয়ার কথা সবাই মেনে নিলেন—বিঠুরে মন্নু ছবেলী নামেই পরিচিতা হলেন।

পেশোয়ার সভায় তাঁর দুই পুত্রও উপস্থিত ছিলেন। আসলে পেশোয়া ছিলেন অপুত্রক। কালক্রমে আশ্রিত পরমাত্মীয়দের

দু'টি পরম সুন্দর গুণবান পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হচ্ছেন—ধুন্দুপন্থ নানা, আর কনিষ্ঠ রাও গঙ্গাধর। এঁরাই পরে 'নানা সাহেব' ও 'রাও সাহেব' নামে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিখ্যাত হন। এঁরা দুজনেই নবাগতা বালিকাকে দেখে খুশী হয়ে ভাবতে থাকেন—তাঁদের সঙ্গে খেলবার এক সঙ্গিনী এলেন।

ধুন্দুপন্থ নানা শৈশব থেকেই অত্যন্ত জেদী ও সদালাপী। পরম সুন্দর প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠদেহ কিশোর। নানা আগেই এগিয়ে এসে বালিকা মনুকে সম্বর্দ্ধনা করে বললেন : আমরাও তোমাকে ছবেলী বলে ডাকব, কেমন? আমাদের বোন নেই—তুমি আমাদের বোন হবে?

সুন্দর ছেলেটিকে দেখে, তার মুখে এ ভাবে মিষ্ট সম্বোধন শুনে মনুর মনটিও আনন্দে ভরে গেল; হাসিমুখে বললেন : বেশ ত, আমারো ভাই নেই, তুমি আমার ভাই হবে—কেমন?

প্রথম দেখা ও দু'টি কথাতেই দু'জনের মধ্যে দিব্যি ভাব হয়ে গেল। নানা জানলেন, ছবেলী তাঁর পরম স্নেহের বোন হলেন; ছবেলীও বুঝলেন যে, এখানে এসেই সুন্দর একটি ভাই পেয়ে গেলেন। তাহ'লে কাশীর মতন এখানেও খেলতে পাবেন।

এর পরেই ছোট ভাই রাওএর সঙ্গেও মনুর আলাপ হয়ে গেল। ইনি পেশোয়ার কনিষ্ঠ দত্তক পুত্র—বয়সে নানার চেয়েও দু'-তিন বছরের ছোট। ইনিও মনুকে ছোট বোন বলে মেনে নিলেন। মনুকে সঙ্গে করে দুই ভাই বিঠুরের ব্রহ্মাবর্ত্ত

প্রাসাদের বিভিন্ন মহল্লা প্রাঙ্গণ উদ্যান সব দেখালেন। দেখতে দেখতে মন্নু কোন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে, নানা বেশ সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—কোনটির কি নাম, তার পিছনের কাহিনী। শুনে মন্নুর কি আনন্দ!

খানিক পরে মন্নু দেখলেন, নানা ভাইটি আগের পোষাক বদল করে যোদ্ধার মতন আঁটসাঁট করে পোষাক পরে প্রাঙ্গণের দিকে চলেছেন—তাঁর কোমরবন্ধে দিব্যি রঙচঙে খাপে-ভরা তলোয়ার ঝুলছে। দেখেই মন্নুর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দের ঝলকে; ছুটে গিয়ে নানার হাত ধরে বললেন: গল্পের রাজপুত্রের মতন কোমরে তলোয়ার বেঁধে কোথায় চলেছ ভাই?

মন্নুর কথাগুলি নানার বড় ভালো লাগলো। তাঁর পথটি রুখে হাসিমুখে এমনই মিষ্টি ভঙ্গিতে মন্নু কথাগুলি বললেন, নানাকে তখনি থমকে দাঁড়িয়ে কথার জবাব দিতে হলো। তিনিও বীর বালকের মত সোজা হয়ে মুখখানি দৃপ্ত করে বললেন: লড়াই করতে চলেছি বোন! তবে সত্যিকার লড়াই নয়—কি করে তলোয়ার চালিয়ে লড়াই করতে হয়, ওস্তাদজীর কাছে তাই শিখি কি না! এই সময়ে নিত্যই আমরা তলোয়ার খেলি যে! চলো না আমার সঙ্গে ছবেলি—তলোয়ার খেলা দেখবে। যাবে?

মুখখানা অমনি গম্ভীর করে মন্নু বললেন: বা রে! তোমরা তলোয়ার খেলবে, আর আমি বুঝি খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? তা হবে না ভাই, আমিও খেলব।

মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়ে নানা বললেন : তুমিও খেলবে বলছ ! কিন্তু এ খেলা যে তলোয়ার নিয়ে হয়—তুমি তলোয়ার চালাতে পারবে ?

মুখে মিষ্টি হাসিটুকু ফুটিয়ে মনু বললেন : কেন পারব না—তবে তোমার বোন হয়েছি কি জন্যে ? শীগ্‌গির আমার জন্যে একখানা ছোট তলোয়ার এনে দাও—একসঙ্গে আমরা খেলব।

ছবেলীর মুখে এ-রকম সাহসের কথা শুনে নানা খুব খুশি হলেন। ঠিক এই সময় সেজে-গুজে রাও সাহেবও এসে পড়লেন। তাঁকে দেখেই নানা বললেন : ভাই রাও, ছবেলী বলছে আমাদের সঙ্গে তলোয়ার খেলবে—তুমি ছুটে গিয়ে তোষাখানা থেকে আমাদের আগেকার একখানা ছোট তলোয়ার নিয়ে এসো।

সহর্ষে রাও সাহেব বললেন : বা, বেশ হবে তাহ'লে—আমি এখনি ছবেলীর মতন তলোয়ার আনছি।...এক-নিশ্বেসে কথাগুলি বলেই রাও সাহেব তোষাখানার দিকে ছুটলেন।

নানা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কাশীতেও কি তলোয়ার খেলতে বোন ?

মনু উত্তর দিলেন : না, সেখানে বাপুজীর কাছে তলোয়ার খেলার গল্প শুনতুম। আর, আমি কি খেলতুম শুনবে—লুকোচুরি, দৌড়োদৌড়ি, দড়ি-টানাটানি—এই সব। আচ্ছা, তোমরা এখানে দৌড়োদৌড়ি খেল না ?

নানা বললেনঃ খেলি—তবে পাওদলে নয়,—আমরা ঘোড়ার পীঠে চড়ে ঐ খেলা রোজ খেলি।

শুনেই বালিকা চোখ ছু'টো বিস্ফারিত করে বললেনঃ তাই না কি! ঘোড়ায় চড়ে খেল? দেখো ভাই, আমি কত দিন স্বপ্ন দেখিছি, যেন ঘোড়ায় চড়ে ছুটছি···সেই থেকে ঘোড়ায় চড়তে আমার ভারি সাধ। তুমি যখন ঘোড়ায় চড়ে খেলবে, আমাকেও কিন্তু ঘোড়ার পীঠে তুলে নিতে হবে। এক ঘোড়ায় ছু'জনে ছুটবো—কি মজা!

এমন ভঙ্গিতে কথাগুলি বললেন মন্নু, যেন নানার সঙ্গে তেজস্বী একটা ঘোড়ার পীঠে চড়ে ছু'জনে চলেছেন! এই সময় রাও সাহেব খাপে ভরা ছোট একখানি তলোয়ার কোমর-বন্ধ শুদ্ধ এনে বললেনঃ দাদা, তোমার ছোটবেলার তলোয়ার-খানাই বেছে-বেছে এনেছি ছবেলীর জন্যে—এই নাও, তুমি ওর কোমরে বেঁধে দাও।

তলোয়ার দেখে মন্নুর আর আনন্দ ধরে না—বছর কয়েক আগে দশ বছর বয়সে এই তলোয়ার কোমরে বেঁধে নানা টহল দিয়ে বেড়াতেন—এই তলোয়ার নিয়েই তাঁর শিক্ষা সুরু হয়। সে ইতিহাস শোনাতে শোনাতে তিনি মন্নুর কোমরে সেই তলোয়ার বেঁধে দিলেন। মারাঠী মেয়েরা পুরুষদের মতন কাছা দিয়ে লম্বা সাড়ী দিব্যি গুছিয়ে আঁট-সাঁট করেই পরে থাকেন। মন্নু সেদিন একখানা রক্তবর্ণের কাপড় পরে বেরিয়েছিলেন। সেই কাপড়ের উপরে স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য কোমরবন্ধের সঙ্গে বিচিত্র

বর্ণের খাপে-ভরা তলোয়ারখানি ঝুলতেই তাঁর সে সজ্জা যেন আরো মনোরম হলো।

এর পর খেলার মাঠে গিয়ে মন্নুও সেদিন অস্ত্র-চালনার দীক্ষা নিলেন ওস্তাদের কাছে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সুরু হলো। বালিকা মন্নুর হাতের শক্তি ও ক্ষিপ্রতা দেখে গুরু পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

খেলার পর আহ্লাদে নাচতে নাচতে নিজেদের মহল্লায় এসে মন্নু পিতাকে বললেন : বাবা, দেখ নানা ভাই আমাকে কেমন তলোয়ার উপহার দিয়েছেন। আমিও ওঁদের সঙ্গে আজ তলোয়ার খেলেছি বাবা! এখন থেকে রোজ খেলব।

পন্থজী কন্যার মাথায় সস্নেহে হাতখানি রেখে আদর করে বললেন : ভালোই ত মা! শিবাজী মহারাজাই প্রথমে নিয়ম করেন—ছেলেদের মতন মেয়েরাও তলোয়ার খেলবে, ঘোড়ায় চড়বে, লড়াই শিখবে। এইটুকুই সুখের কথা মা, পেশোয়াজী রাজপাট ছেড়ে বিঠুরে এসেও সাবেক চালগুলি বজায় রেখেছেন।

পিতার এই কথা থেকেই মন্নু তার মনের কতকগুলো চাপা কথা এই সময় বলে ফেলল। এখানে এসে অবধি কতকগুলি ব্যাপারে তার মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। পুণায় মহান্ পেশোয়াদের বিপুল প্রতিষ্ঠা,প্রতিপত্তি ও দপদপার কথা গল্পের মতন তিনি কানেই শুনেছেন কাশীতে বাপুজীর কাছে। তিনি ভেবেছিলেন, সেই পেশোয়ার বংশধর রাজ্য হারিয়ে বিঠুরে এসে

খুব সাধারণ ভাবে, গরীবানি চালেই থাকেন। কিন্তু বিঠুরে এসে তাঁর রাজার মতন জাঁক-জমক, রাজবাড়ীর বাহার, আদব কায়দা, চারিদিকে আড়ম্বর দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যান। তিনি ভেবে পাননি যে, রাজ্য হারিয়ে রাজা না হয়েও এই পেশোয়া এ রকম করে রাজার মতন জাঁকজমকে কি করে আছেন? এত ঐশ্বর্য্য এখানে এলো কি করে? আজ কথার সূত্রে সুযোগ পেয়ে পন্থজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হ্যাঁ বাবা, তবে যে শুনেছিলুম আমাদের পেশোয়া রাজ্য হারিয়ে ইংরেজের হাততোলা বৃত্তির উপর ভরসা করে বিঠুরে রয়েছেন। কিন্তু এখানে এসে যে সব কাণ্ড দেখছি—কে বললে ইনি রাজা নন? এর কারণ কি বাবা?

কন্যার কথা শুনে একটু হেসে পন্থজী বললেন: এর কারণ হচ্ছে মা, আগের মহান্ পেশোয়াদের বিরাট প্রতিপত্তির প্রভাব। গোড়া থেকে সে-সব কথা না শুনলে তুমি মা বুঝতে পারবে না। মহাত্মা শিবাজীর গল্প তুমি বাপুজীর কাছে শুনেছ। তিনি যেমন আঘাতের পর আঘাত হেনে মোগল-শক্তিকে চূর্ণ করেছিলেন, তেমনি মারাঠা জাতটাকে শক্ত করে গড়েও তুলেছিলেন। তাই শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে শম্ভুজী শক্তির অহঙ্কারে আর নিজের দোষে অকালে অপঘাতে মরলেও জাতটা বেঁচেছিল। শম্ভুজীর ছেলে শাহুজী ছিলেন ভীতু প্রকৃতির লোক, পিতার অপমৃত্যু দেখে তিনি যুদ্ধ হাঙ্গামায় লিপ্ত হতে চাইতেন না—অথচ রাজ্যের চার দিকেই তখন যুদ্ধের হিড়িক

চলেছে। এই সময় তাঁর খুল্লতাত শিবাজীর ছোট ছেলে রাজারামের বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ তাঁকে হুমকী দিয়ে বললেন—'তুমি হোচ্ছ দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ, রাজ্য চালানো তোমার কাজ নয়—ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি বসবো ছত্রপতির সিংহাসনে।' শাহুজী ত ভেবেই অস্থির! এমনি সময় তাঁর সেরেস্তার একজন ব্রাহ্মণ কেরাণী—নাম তাঁর বালাজী বিশ্বনাথ, তিনি বললেন—'বিশ্বাস করে মহারাজ আমার হাতে রাজ্য-রক্ষার সব ভার ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করব।' শাহুজী তাঁর কথা শুনে রাজি হয়ে গেলেন—তাঁরই হাতে তুলে দিলেন ছত্রপতি শিবাজীর তরবারি, আর সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব। সত্যিই তিনি করলেন এক অসাধ্য সাধন—সব শত্রুদের দাবিয়ে মহারাজ শাহুজীকে করলেন নিষ্কণ্টক। কৃতজ্ঞ মহারাজও তখন করলেন কি, 'পেশোয়া' নামে এক সম্মানজনক পদ সৃষ্টি করে বালাজীকে সেই পদের বিশিষ্ট আসনে অভিষিক্ত করে রাজ্যরক্ষা ও শাসন সম্পর্কে যাবতীয় কর্তৃত্ব তাঁর উপরে ছেড়ে দিলেন। সেই থেকে শাহু ও তাঁর বংশধরেরা হলেন ঠুঁটো জগন্নাথ, আর বালাজী ও তাঁর বংশীয়েরা হলেন রাজ্যের শাসক। এঁরা রইলেন নামে মাত্র রাজা হয়ে, আর পেশোয়ারা তাঁদের সেই পেশোয়া পদকে বাদশাহী পদের মতন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও শক্তিসম্পন্ন করে প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব করতে লাগলেন। আগে সেতারা ছিল মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী, প্রথম পেশোয়া সেখান থেকেই রাজ্য

চালাতেন। কিন্তু দ্বিতীয় পেশোয়া মহাবীর বাজীরাও পেশোয়ার গদী সেতারা থেকে পুণায় তুলে নিয়ে গেলেন; তখন থেকে পুণাই হলো রাজধানী। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বংশপরম্পরায় পেশোয়াদের রাজত্ব চলতে লাগলো। তাঁদের কত কীর্ত্তি—কত ইতিহাস! সে সব পরে এক দিন বলব তোমাকে। শেষে এল এই পেশোয়ার আমল—আজ আমরা বিঠুরে যাঁর আশ্রয়ে এসেছি। নানা রকমের অনাচার আর গৃহবিবাদে পেশোয়ার প্রতাপেও তখন ভাঙন ধরেছে। ওদিকে বিদেশী ইংরেজরা এ দেশ থেকে বেছে বেছে লক্ষ লক্ষ সাহসী বলিষ্ঠ বীরপুরুষ সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেককে নূতন প্রণালীতে যুদ্ধবিছা শিখিয়ে ওদেশের ভীষণ ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রে সাজিয়ে এমন এক দুর্দ্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলে—যুদ্ধে যারা কিছুতেই হার মানতে চায় না। ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল—প্রবল প্রতিপত্তিশালী পেশোয়া-শক্তির পতন না হলে ভারতবর্ষের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই শেষ পেশোয়ার আমলে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে মিতালী করে একযোগে পেশোয়াকে আক্রমণ করে ইংরেজ তার কাজ গুছিয়ে নিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পেশোয়া বিজয়ী ইংরেজের হাতে তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্যে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে এই বিঠুরে বাস করবার অধিকার পেলেন। এ ছাড়া প্রকাণ্ড একটি জায়গীরও তাঁকে দেওয়া হলো। এই সঙ্গে আরো সাব্যস্ত হলো যে, বিঠুর ও পেশোয়ার

জায়গীরের বাসীন্দারা পেশোয়ার শাসনাধীনেই থাকবেন—ইংরেজ সরকারের আদালতে মামলা-মকর্দ্দমার জন্য যেতে হবে না; বিঠুরে পেশোয়া সরকারই করবেন তাঁদের রক্ষা, শাসন ওপালন। এই সন্ধির পরেই পেশোয়া পুণার প্রাসাদের পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, যানবাহন, সঞ্চিত ধনরত্ন ও অনুরক্ত সেনা-সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে বিঠুরে চলে এলেন। অজস্র অর্থ ব্যয়ে এখানে বিশাল রাজভবন তৈরী করে এর নাম রাখলেন—ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রাসাদ। পেশোয়া যখন পুণা ছেড়ে এখানে আসেন, পুণার বহু পরিবার সেখান থেকে বাস তুলে পেশোয়ার সঙ্গে এখানে এসে বাস করতে থাকেন। সেই জন্যই বিঠুর এমন জনপূর্ণ নগরী হয়ে উঠেছে।

পন্থজীর মুখে অতীতের এই সব কাহিনী শুনে মনুবাঈ বুঝতে পারলেন, যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়েও কেন পেশোয়া এখানে এখনো রাজার মত জাঁক-জমকে বসবাস করছেন।

কথায় কথায় পন্থজী আরো বললেন: যৌবনে বরাবর যুদ্ধ বিগ্রহ করে প্রৌঢ় বয়সে এই ভাবে বিঠুরে এসে আগেকার সেই পেশোয়া খুবই বিলাসী আর আরাম প্রিয় হয়ে পড়েন। পাছে এই সুখ-সম্ভোগে কোন বিঘ্ন ঘটে—সেই ভয়ে এ-পর্যন্ত ইনি বরাবরই ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব আর সম্প্রীতি বজায় রেখেছেন—সন্ধিসর্ত্ত লঙ্ঘন করে এমন কোন কাজ করেন না, যাতে ইংরেজের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বরং পরম মিত্রের মতন

ইংরেজের আপদ-বিপদে নিজেই উপযাচক হয়ে অনেক সাহায্য করেছেন। আফগানিস্থানের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজের টাকার টানাটানি পড়লে পেশোয়া তাঁর সঞ্চিত টাকা থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ইংরেজকে ধার দেন। এর পর পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধলে ইংরেজ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেই সময় পেশোয়া নিজের খরচে এই বিঠুর থেকে এক হাজার পদাতিক আর এক হাজার অশ্বারোহী সেনা পাঞ্জাবে পাঠিয়ে ইংরেজের সাহায্য করেন। এতে ইংরেজ সরকার খুব খুশি হন বটে, কিন্তু মারাঠা জাতি মনে মনে পেশোয়ার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন। পেশোয়ার ভাই—আমাদের বাপুজী তখন কাশীতে, তিনি সেখান থেকে পাঞ্জাবে ফৌজ পাঠাতে নিষেধ করেছিলেন পেশোয়াকে—কিন্তু ইনি সে আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। এই জন্যই মা, আমরা পেশোয়ার কাছ থেকে দূরে থাকতুম। এখন ঘটনাচক্রে এঁর আশ্রয়ে আমাদের থাকতে হবে মা! তবে এ কথাও বলি, ইংরেজের এখন একাদশে বৃহস্পতি—এদের সঙ্গে শত্রুতা করে এ দেশে সুখে-শান্তিতে বাস করা অসম্ভব। পেশোয়া দেশের অবস্থা আর নিজের সামর্থের কথা ভেবেই ইংরেজের মন যুগিয়ে চলেছেন। পেশোয়া যখন প্রথমে বিঠুরে আসেন, আর সেই সঙ্গে হাজার হাজার মারাঠা পুণা ছেড়ে তাঁর অনুগমন করেন, ইংরেজ তখন ভয় পেয়েছিল; ভেবেছিল, তাঁর রাজ্যের সেরা সেরা লোক যখন বিঠুরে তাঁর কাছেই থাকছেন, পরে যদি শক্তি

সঞ্চয় করে এঁদের নিয়ে পেশোয়া আবার যুদ্ধ ঘোষণা করেন —তাহলে ত বড়ই বিপদের কথা হবে। কিন্তু তার পরেই তাঁদের সঙ্গে পেশোয়ার ব্যবহার দেখে ইংরেজের মন থেকে সে সন্দেহ মুছে যায়। এখন ওঁরা পেশোয়াকে ওঁদের পরম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী বলেই জানেন।

অতীতের কথা ও কাহিনী গল্পের মত শুনতে খুব শৈশব থেকেই মনুবাঈ অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কাশীর চৌষট্টি মন্দিরে পুরোহিত ও কথকদের মুখে পুরাণের কাহিনী শুনে তিনি যেমন আনন্দ পেতেন, বাড়ীতে বাপুজীও দেশের বড় বড় যোদ্ধাদের গল্প বলে তাঁর মনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করতেন। নৈলে, এই বয়সের কোন্ মেয়ে বা ছেলে ইতিহাসের কথা এমন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনতে ভালবাসে? কিন্তু জগতে যাঁরা অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের কথাই আলাদা।

তবে মনুর মত মেয়ে পেশোয়ার সম্বন্ধে এই সব কথা শুনেই কি মনের কৌতূহল মিটিয়েছিলেন মনে করা যায়? সেই বয়সেই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে যেন আঁচড় দিতে থাকে। রাজ্য ছেড়েও রাজ্যের বাইরে এসে পেশোয়া রাজার মতন দপদপায় আর জাঁক-জমকে রয়েছেন, এ খুব ভালো কথা; কিন্তু ইংরেজ যখন দেশের আর সব রাজ্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্যে লড়াই করতে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো, পেশোয়া সেখানে ইংরেজকে ফৌজ পাঠাতে গেলেন কেন? পেশোয়ার এই

কাজটি যেন কাঁটার মত মনুর মনে বিঁধতে লাগলো। এক দিন তিনি কথায় কথায় পেশোয়ার মুখের উপরেই কথাটা বলে ফেললেন। সেদিন পেশোয়ার সভায় কথা হচ্ছিল যে, ইংরেজরা কৌশলে পাঞ্জাব জয় করে পাঞ্জাবের সিংহ রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীকে বন্দিনী করে খুবই অন্যায় করেছেন। এই কথার পীঠেই বালিকা মনু হঠাৎ বলে উঠলেন: বাপুজী, এর জন্যে আপনিও কম দায়ী নন—এই ইংরেজকে ফৌজ দিয়ে আপনি সাহায্য করেছিলেন।

বালিকার মুখে এ-কথা শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। পেশোয়া কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনুকে কাছে টেনে কোলে বসিয়ে বললেন: আমার চোখে আঙুল দিয়ে এমন করে এর আগে আর কেউ আমার অন্যায় দেখিয়ে দেয়নি মা! সত্যিই আমি অন্যায় করেছিলাম।

(৩)

সেদিন খেলার মাঠে যেতে যেতে নানা মনুকে উৎসাহ দিয়ে বললেন: তুমিও দেখছি আমার মতনই তলিয়ে ভাব। সত্যি বোন, বাবার কতকগুলো কাজ আমাকেও খুব ব্যথা দেয়। কিন্তু আমি বলতে সাহস করিনি। আজ যে আমার কি আনন্দ হোচ্ছে তা বলবার নয়।

মনু বললেন: আমি যে কথা চেপে রাখতে পারি না ভাই!

দেখতে দেখতে বালিকা মনু অস্ত্র-চালনায় নানার প্রায় সমকক্ষ

হয়ে উঠলেন। নানার ছোট ভাই রাও সাহেব কিন্তু পেছিয়ে পড়লেন—অসি খেলার প্রতিযোগিতায় ছবেলী তাঁকে হারিয়ে দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিলেন। একদিন নানা গম্ভীর হয়ে বললেন: ছবেলী, তোমাকে বোন বলে আমি নিজেই বড় হয়েছি। তোমার কব্জির যে রকম জোর, হয়ত এর পর আমাকেও হারিয়ে দেবে তুমি।

মনু মৃদু হেসে উত্তর করলেন: বোন কি কখনো দাদার চেয়ে বড় হতে পারে? আমি যে তোমার তলোয়ারের মান রাখতে পেরেছি, তাতেই আমার আনন্দ।

শেষে নানার সঙ্গে মনুর তলোয়ার খেলা বিঠুরে যেন একটা দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে উঠল। খেলার মাঠে আর লোক ধরে না—সবাই অবাক-বিস্ময়ে দেখে দুই অদ্ভুত প্রতিযোগীর অস্ত্র-চালনা। এক দিকে প্রিয়দর্শন কমনীয় কান্তি ষোড়শবর্ষীয় কিশোর নানা, অন্য দিকে অনিন্দ্যসুন্দরী সুকুমারী দশমবর্ষীয়া বালিকা ছবেলী। এক-এক দিন পারিষদ্‌বর্গের সঙ্গে পেশোয়া স্বয়ং এঁদের অসি-খেলা দেখেন, মুগ্ধ-বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করেন: সাবাস্—ছবেলী, চমৎকার!

ছবেলীর এই বাহাদুরী চরমে উঠল—যেদিন তিনি তেজস্বী এক টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে সমস্ত বিঠুর পরিক্রমণ করে এলেন। নানা প্রথমে ভেবেছিলেন, তলোয়ার চালাতে পারলেও ঘোড়ার পিঠে চড়ে টহল দিতে কিছুতেই পারবেন না ছবেলী। কিন্তু প্রথম দিনেই তিনি নানার সে ভুল ভেঙে দিলেন। সুসজ্জিত

ঘোড়াকে দেখেই বালিকার অঙ্গে অঙ্গে যেন অদ্ভুত এক উত্তেজনা জেগে উঠল ; তিনি ছুটে গিয়ে ঘোড়ার মুখোসে হাত দিয়ে আদর করে বললেন : আমি তোমার পীঠে উঠব —আমাকে তুলবে না ?…বালিকার কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটিও ঘাড় নেড়ে তার কোমল হাতে মুখখানি ঘসতে লাগল। মনু অমনি সহাস্যে বললেন : ঘোড়া রাজি হয়েছে, আমি এর পীঠে উঠব।…বলতে বলতেই মনু রেকাবে পা রেখেই ঝাঁ করে ঘোড়ার পীঠে উঠে বসলেন এমন কায়দা করে—যেন ঘোড়ার পীঠে চড়া তাঁর একটা সাধা বিদ্যা, তিনি যেন কত সব ঘোড়ার পীঠে সওয়ার হয়েছেন। ঘোড়াটাও যেন এই অদ্ভুত বালিকাকে চিনে ফেলেছিল, বুঝতে পেরেছিল যে, সহজাত সংস্কারের মতই এটিও তাঁর একটি সাধা বিদ্যা, আর এমনি বেপরোয়া সওয়ারকে পীঠে তুলতে তারও আনন্দ। তাই, যেমনি মনু তার পীঠের উপর পাতা মখমলের জিনের উপর বসে পড়লেন, ঘোড়াও অমনি একটি ঝাঁকুনি দিয়েই তেজস্বিনী আরোহিণীকে নিয়ে ছুটল সামনের মুক্ত পথে। নানা সাহেব, রাও সাহেব নিজের নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে চেয়েছিলেন ছবেলীর দিকে ; তাঁর কাণ্ড দেখে তাঁরাও সলম্ফে নিজের নিজের ঘোড়ার পীঠে উঠে তাঁরই পিছু-পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। পিছন থেকে তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, তেজস্বী জন্তুটির লাগাম টেনে বাধ্য করেই ছবেলী তাকে চালাচ্ছে। এ খেলাতেও মনু আশ্চর্য্য রকমের সাফল্য অর্জ্জন করলেন।

এখন থেকে ঘোড়ায় চড়ে পাল্লা দিয়ে বেড়ানোই হলো মন্নুর শ্রেষ্ঠ খেলা ও কসরৎ। এই খেলার মধ্যে মন্নু ঘোড়া চেনবার, আর তাকে বশীভূত করবার কৌশলও খুঁজে বার করে ফেললেন। এমনি করে ঘোড়ায় চড়ে দৌড়বাজী করতে করতে দেশের আর একটি ভাইয়ের সঙ্গেও মন্নুর পরিচয় হয়ে গেলো; তাঁর নাম—তাস্তিয়া তোপি। ইনি এমন এক দেশভক্ত তেজস্বী মারাঠা ব্রাহ্মণের পুত্র—যিনি মারাঠা জাতির পতনের জন্য মর্মাহত হয়ে পুনরুত্থানের কামনায় তপস্যায় দেহপাত করেন—মৃত্যুকালে তিনি পুত্র তাস্তিয়াকেও দেশাত্মবোধের দীক্ষা দিয়ে আদেশ করে যান, দেশের মুক্তির জন্যে সেও যেন তার জীবন উৎসর্গ করে। এই তাস্তিয়ার সঙ্গে কিশোর বয়সেই নানা সাহেব সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন; সেই সূত্রে নানা সাহেবের ধর্ম-ভগিনী ছবেলীও নানার বন্ধু তাস্তিয়া তোপিকে ভাই বলে গ্রহণ করলেন।

ঘোড়ার পর এলো হাতীর পালা। একদা অপরাহ্নে পেশোয়া দুই পুত্র নানা ও রাওকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত হাতী 'পাহাড়'এর পীঠে বাঁধা মণিমুক্তাখচিত রূপার তৈরী হাওদায় বসে যাত্রার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় মন্নু সেখানে এসে হাজীর। পেশোয়ার সঙ্গে হাতীর পীঠে দুইখেলার সাথীকে দেখে বললেন: বা-রে! আমাকে ফেলেই যাওয়া হচ্ছে! আমি যাব না?

পেশোয়া সহাস্যে বললেন: শুনিছি, তুমি ঘোড়ার পীঠে লাফিয়ে ওঠ: যদি এই হাতীটার পীঠেও তেমনি করে উঠতে পার, তাহলে তোমারও যাওয়া হবে।

মন্নু তাকিয়ে দেখলেন, পাহাড়ের একটা চূড়ার মত কালো রঙের বিরাটকায় হাতীটা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে—অনেক উঁচুতে তার পীঠে বাঁধা হাওদা; সেখানে কোন দুঃসাহসী যোয়ান ব্যক্তির পক্ষেও লাফিয়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। কিন্তু পেশোয়া বলেছেন হাতীর পীঠে ওঠবার কথা, যেমন করে হোক তাঁকে উঠতেই হবে। এখন কি উপায়ে ওঠা যায়? হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল—হাতীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার মোটা লম্বা শুঁড়টা মাটী পর্যন্ত নেমে এসেছে। আর কাল বিলম্ব না করে কাউকে কিছু না বলেই মুনা ছুটে গিয়ে হাতীর শুঁড়টা দুহাতে আঁকড়ে ধরে তারই গায়ের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। পেশোয়া থেকে আরম্ভ করে মাহুত ও আশে পাশে যাঁরা সেখানে ছিলেন প্রত্যেকেই আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলেন। হাতী হয়ত এখনি তাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে একটি আছাড়েই চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে। কিন্তু আশ্চর্য! বালিকার সাহস দেখে হস্তীরাজও বুঝি খুশী হয়েছিল; সেই অবস্থায় সে মুনাকে শুঁড়ে জড়িয়ে উঁচু করে অতি সন্তর্পনে পীঠের দিকে তুলে দিল—পেশোয়াও তাড়াতাড়ি তাকে ধরে নিজের কোলে বসালেন। তখন সবার মুখে হাসি ফুটল, আর বাহোবা পড়ে গেল মুনার নামে।

বিঠুরের অনেকেই ভেবেছিলেন যে, পেশোয়াজী হয়ত পুত্র-বধূর মর্য্যাদা দিয়ে মন্নুকে গ্রহণ করবেন—নানা সাহেবের সঙ্গেই মন্নু হবেন পরিণীতা। পেশোয়ারও এরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু

কৌলিক বিধিই এ বিবাহের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। আমাদের বাঙলা দেশে যেমন রাঢ়ী-বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহের চলন নেই, মারাঠাদের মধ্যেও তেমনি ব্রাহ্মণ সমাজে চিৎপাবন ও কড়ার নামে দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। পেশোয়া হলেন চিৎপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, আর মোরপন্থ কড়ার শ্রেণী-ভুক্ত। এ অবস্থায় মনুর সঙ্গে নানার বিবাহ হ'তে পারে না। বুদ্ধিমতী মনু অবস্থাটি উপলব্ধি করেই সেই বয়সেই প্রিয় সাথী নানা ও রাওজীর সঙ্গে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ দৃঢ় করেছিলেন।

দেখতে দেখতে এলো ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার উৎসব। মনু পন্থজীর কাছে আবদার করলেন : ভাইফোঁটার দিন আমি নানা ভাইদের চুয়া-চন্দনের ফোঁটা দেব বাবা! আমার জিনিস-পত্র সব চাই।

পন্থজী প্রসন্ন মনেই কন্যার নির্দেশ মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব এনে দিলেন। খুব ঘটা করে মনুবাঈ ভাইফোঁটা দিলেন। ভাইয়ের বিশেষ ফোঁটা যদিও নানার অদৃষ্টেই জুটল, কিন্তু রাও সাহেব, এবং তান্তিয়াকেও তিনি আমন্ত্রণ করতে ভুলেননি—প্রত্যেককেই নূতন বস্ত্র উপহার দিয়ে ভূরি ভোজে পরিতৃপ্ত করে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসব পালন করলেন মনুবাঈ।

এই ভাবে খেলায়-ধূলায়, বিদ্যা ও অস্ত্রশিক্ষায় এবং নানারূপ ব্যায়ামের ভিতর দিয়ে আরো কয়েকটি বৎসর কেটে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

দাম্পত্য-জীবন

(১)

এর পর এলো মন্নুর ভাগ্যোদয়ের বছর—১৮৪২ অব্দ। এই সময় এক দিন হঠাৎ কাশীর সেই জ্যোতিষী বিঠুরে এসে উপস্থিত। পন্থজী তাঁকে চিনতে পেরে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। জ্যোতিষী বললেন: মনে আছে পন্থজী, আমার গণনার কথা বলেছিলুম, আপনার কন্যা হবেন রাজরাণী? তারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধররাও যশোবন্ত বাবা সাহেবের জন্য সর্ব্বগুণান্বিতা সুলক্ষণা পাত্রীর প্রয়োজন হয়েছে। আমি আপনার কন্যার কথা বলেছি। মহারাজের পক্ষ থেকে তাঁর অমাত্যরা আজই পাত্রী দেখতে আসছেন। এ কন্যা যে তাঁরা পছন্দ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। কৌলিক ব্যাপারেও বাধা নেই; কারণ, মহারাজও কড়ার শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আপনার কন্যা মন্নুবাঈ রাজরাণী হবেন পন্থজী!

পন্থজী কন্যার জন্য ভিতরে ভিতরে পাত্রের অন্বেষণ করছিলেন; হঠাৎ এরূপ সংবাদে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। কথাটা পেশোয়াও শুনলেন। তিনিও সহর্ষে বললেন: আমি জানতুম, ছবেলী যেমন অসাধারণ মেয়ে, তেমনি কোন অসাধারণ ঘরেই হবে ওর বিয়ে।

ঝাঁসীর অমাত্যগণ পাত্রী দেখে সন্তুষ্ট হয়ে জানিয়ে গেলেন, এমনি কন্যারই অনুসন্ধান তাঁরা করছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। ইনিই হবেন ঝাঁসীর মহারাণী।

এর পর শুভলগ্নে মনুর বিবাহ-উৎসব সুসম্পন্ন হলো। বিবাহের সময় ঘটল এক কৌতুকাবহ ঘটনা। পুরোহিত যখন বরবেশী মহারাজ গঙ্গাধর রাওএর অঙ্গবস্ত্রের সঙ্গে বধূ মনুবাঈএর অঞ্চলে গাঁটছড়া বাঁধতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছেন, সেই সময় মনু সহাস্যে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন : পুরুত ঠাকুর! খুব জোরে গিঁট দিন—যেন খুলে না যায়।

কন্যার কথায় বিবাহ-স্থলে হাসির রোল উঠল। স্বয়ং মহারাজও আড়চোখে কন্যার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। পেশোয়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনিও সহাস্যে বললেন : এ রকম কথা ছবেলীই বলতে পারে—পুরুত ঠাকুরকেও হার মানিয়ে দিলে।

সত্যই বিবাহ-বাসরেও সবার সামনে এমন কথা সহজ ভাবে বলতে পেরেছিলেন বলেই—আর এক দিন পরম সঙ্কট কালে ইংরেজ রেসিডেন্টের মুখের উপরে সেই কণ্ঠ থেকেই অকুণ্ঠ স্বর নির্গত হয়েছিল—'মেরী ঝাঁসী দেঙ্গী নেহী!'

বিবাহের পর বিদায়ের পালা এল। বিবাহিতা মনু মহারাজা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাবেন—চললো তার আয়োজন। মনু সবিনয়ে পরিচিতদের কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগলেন;

সাশ্রুলোচনে বললেন: আমাকে মনে রাখবেন—যেন ভুলে যাবেন না। খেলার সাথী নানা সাহেব ও রাও সাহেবকে বললেন: আমাদের খেলা কিন্তু আমি ভুলবো না, সেখানে গিয়েও খেলব।

নানা সাহেব বললেন: তুমি হয়ত রাজরাণী হয়ে আমাদের ভুলে যাবে ছবেলি!

মনু মুখখানি ভার করে উত্তর দিলেন: তবে খেলার কথা বললাম কেন? খেলতে গেলেই তোমাদের কথা মনে পড়বে; খেলার সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছ যে!

রাও সাহেব বললেন: খেলা আর আমাদের জমবে না—তুমি যে আমাদের খেলার প্রাণ ছিলে!

মনুর মনটি অমনি দুলে উঠল; বললেন: ভাইফোঁটার দিনে আমি কিন্তু ফোঁটা পাঠাব—সেদিনটিতে তোমরাও আমাকে মনে ক'র।

নানা বললেন: তুমি যে একটি স্বাধীন রাজ্যের রাণী হতে চলেছ, এতেই আমাদের আনন্দ। রাণী হয়ে তুমি দেশের কত উপকার করবে।

আয়ত দু'টি চোখ বড় করে নানার মুখের উপরে তার স্বচ্ছ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনু বললেন: রাণী হলেও আমি তোমাদের ভুলবো না, এই বিঠুরের ছবি আমি মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে চলেছি জেনো।

এর পর বাবাকে বললেন: তোমার জন্যে আমার বড্ডো মন

কেমন করবে ; তুমি আমাকে দেখতে যেয়ো বাবা—ওঁরা হয়ত ওঁদের রাণীকে ঘন ঘন আসতে দেবেন না।

পন্থজী একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন : এ কথা কেন বলছ মা ?

মন্নু বললেন : ওখান থেকে যাঁরা এসেছেন, এই কথা যে তাঁরাই বলছিলেন বাবা! রাণী হলে না কি আর আসবার নিয়ম নেই। তা ব'লে ওঁরা কি আমাকে ওঁদের বাড়ীতে কয়েদ করে রাখবেন? তাহলে কিসের রাণী হতে চলেছি আমি? আগে ত যাই, তার পর বোঝাপড়া করব ওঁদের সঙ্গে। আমি কিন্তু তোমাকে এর পর ওখানে নিয়ে যাব বাবা!

পন্থজী হাসতে হাসতে বললেন : তোমাকে দেখতে আমি যাবো বই কি মা, কিন্তু তা ব'লে জামাইয়ের বাড়ীতে বরাবর থাকতে পারি না ত ; সে চেষ্টা তুমি কর না মা—তাতে নিন্দে হবে।

শুনে মন্নু বলে ওঠেন : বা-রে, তা কেন? আমি বিয়ের পর রাণী হতে চলেছি, আর তুমি এখানে চাকরী করবে বাবা! সে কি কখনো হয়? তুমি দেখো, এর পর আমি কি করি! রাণী হই ত রাণীর মতন রাণীই হবো আমি।

সবার শেষে পেশোয়া ও তাঁর মহিষীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন মন্নু। পেশোয়া হাসতে হাসতে বললেন : আমার মনে হচ্ছে পার্বতী যেন শিবের ঘর করতে চলেছেন।

মন্নু অমনি খপ্‌ করে বলে উঠলেন : আপনার কথা আমি

বুঝিছি। শিবের অনেক গুণ ছিল বলে পার্বতী বরের বয়সের জন্যে দুঃখ করেননি। শিবের মতন আমারও বরের বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার তাতে দুঃখ নেই এই ভেবে—তিনি একটা রাজ্যের রাজা, কত লোককে প্রতিপালন করেন, লোকের ভালো করবার, উপকার করবার, তাঁর কত ক্ষমতা আছে—এতেই আমার আনন্দ। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পার্বতীর মত সুখী হই, আর উনি শিবের মত লোকের মঙ্গল করেন।

বালিকার মুখের কথা মহিষীদের সঙ্গে পেশোয়া স্তব্ধ হয়ে শোনেন। তার পর গম্ভীর মুখে বললেন: দেবতার আশীর্বাদ আর দৈবী শক্তি না থাকলে এই বয়সের মেয়ের মুখ দিয়ে এ ধরণের কথা বার হতে পারে না।

মহাসমারোহে বিশাল মিছিল করে নববধূ স্বামীর সঙ্গে ঝাঁসীর প্রাসাদে এলেন। বধূর রূপ দেখে সকলেই সুখ্যাতি করতে লাগলেন। দুর্গ-পরিবেষ্টিত ঝাঁসীর বিশাল প্রাসাদ দেখে বধূও বিস্মিতা হলেন। প্রাসাদের মধ্যেই মনোরম উদ্যান। অন্তঃপুরে রাণীর স্বতন্ত্র মহল, আদেশ বহনের জন্য কত পরিচারিকা, মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত-পটীয়সী রূপসী কিশোরীর দল, দ্বারে দ্বারে শস্ত্রপাণি প্রতিহারিণী—একটি বালিকা বধূর পরিচর্যার জন্য কি বিপুল আয়োজনের ঘটা! পেশোয়ার বিঠুর প্রাসাদের জাঁক-জমকের কথা মনুর মনে পড়ে।

মারাঠাদের রীতি অনুসারে বিবাহের পর কন্যাকে পূর্ব নাম

ত্যাগ করে স্বামীদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং রাজবধূর নূতন নাম হলো লক্ষ্মীবাঈ।

এর পর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর দাম্পত্য-জীবনের কথা বলতে হলে তার আগে 'ঝাঁসী' রাজ্যটির কথা বলতে হয়। কারণ ঝাঁসীকে ভাল করে না জানলে ঝাঁসীর এই তেজস্বিনী রাণীকে জানতে অসুবিধা হবে।

(২)

ঝাঁসী হোচ্ছে মধ্য-ভারতের বুন্দেলখণ্ড বিভাগের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। অতীত কাল থেকেই ছোট-ছোট কতকগুলি রাজ্য নিয়ে বুন্দেলখণ্ড গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক রাজ্যই এক-এক রাজবংশ পুরুষানুক্রমে শাসন করে আসছিলেন। মোগল আমলে বাদশাহ ঔরংজীবের নজর পড়ল প্রথমে এই রাজ্য-গুলির উপরে। তিনি চাইলেন তাদের স্বাধীনতা হরণ করে করদ রাজ্যে পরিণত করতে। কিন্তু বুন্দেলা রাজ্যের তরুণ রাজা ছত্রশাল হলেন প্রতিবাদী; তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরলেন স্বয়ং তাঁদের নেতারূপে। মহাবীর শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মারাঠা ব্রাহ্মণবীর বাদশাহের প্রবল প্রতিরোধ ব্যর্থ করে বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করলেন। তখন অন্যান্য রাজ্যগুলির রাজারা বুন্দেলরাজ ছত্রশালকে

মহারাজ বলে স্বীকার করে তাঁর মিত্ররূপে স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কালক্রমে হায়দ্রাবাদের নিজাম চিন কিলিচ খাঁ আসফজা প্রবল হয়ে মালবরাজ গিরিধর রাও এবং গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁর সহযোগিতায় একযোগে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করলেন। মহারাজ ছত্রশাল তখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন। তাঁর ইতিহাস বিশ্রুতা কন্যা মস্তানীর রূপ-গুণের খ্যাতি সারা ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে। ত্রিশক্তির উক্ত অভিযানের মূলেও ছিলেন এই মস্তানী। বৃদ্ধ রাজা ছত্রশাল তখন নিরুপায় হয়ে মহারাষ্ট্র-চক্রের নেতা মহাবীর পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। বিপন্ন ব্রাহ্মণ রাজার আমন্ত্রণ ব্রাহ্মণবীর বাজীরাও সাদরে গ্রহণ করে তাঁর দিগ্বিজয়ী সেনাপতি রণজী সিন্ধিয়া ও মলহররাও হোলকারের নেতৃত্বে সেনাবল পাঠালেন সম্মিলিত ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে। ফলে, নিজাম, মালব ও গুর্জরের বিপুল বাহিনী শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত হলো। তখন কৃতজ্ঞ রাজা ছত্রশাল রাজকন্যা মস্তানীকে বিজয়ী বীর বাজীরাওয়ের হাতে সমর্পণ করে বুন্দেলখণ্ডের রাজন্যবর্গের সঙ্গে একযোগে এই মর্মে এক সন্ধিসর্তে আবদ্ধ হলেন যে, অতঃপর পেশোয়ার আশ্রিত মিত্ররাজ্য-রূপে তাঁরা নির্ভয়ে স্ব স্ব রাজ্যশাসন করতে থাকবেন এবং কেউ আক্রান্ত হলে পেশোয়া তৎক্ষণাৎ তাঁকে রক্ষা করবেন। যে সব রাজ্যের সঙ্গে পেশোয়া এই ভাবে সন্ধি করলেন, তাদের মধ্যে ঝাঁসীও এক বিশিষ্ট রাজ্য। এই

রাজবংশ মহারাজ ছত্রশালের সমসাময়িক এবং আত্মীয়-গোষ্ঠী-সম্ভূত। কেন না, বুন্দেলার মতন ঝাঁসীর রাজারাও ব্রাহ্মণবংশীয়।

দিন যায়। ক্রমে পেশোয়াদের অমিত পরাক্রমেও ভাঙ্গন ধরে এলো; ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন ইংরেজ-শক্তির অনুকূলে। ফলে, ভারতীয় রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে ইংরেজের সার্বভৌম শক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এই সূত্রে বুন্দেলখণ্ডের পেশোয়া-আশ্রিত রাজ্যগুলিকেও এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হলো। ১৮১৭ সালে বুন্দেলখণ্ড পেশোয়াদের হস্তচ্যুত হয়ে ইংরেজের হস্তগত হলো। ইংরেজ তখন পেশোয়াদের মতই রক্ষকস্বরূপ হয়ে বুন্দেলখণ্ডের প্রত্যেক রাজার সঙ্গে নতুন করে সন্ধি করলেন। এই সন্ধি সম্পর্কেই ঝাঁসীর তৎকালীন রাজা রামচন্দ্ররাও এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা 'পুরুষানুক্রমে ঝাঁসী-রাজ্যের অধিপতি ও স্বত্বাধিকারী বলে ইংরেজ কর্তৃক স্বীকৃত হলেন। এই সন্ধিতে কোন রাজ্যের রাজা রাজমর্যাদাচ্যুত হন নাই, বা ইংরেজের সঙ্গে রাজা-প্রজা-সূচক কোন সম্বন্ধও স্থাপিত করেন নাই—উভয় পক্ষই পরস্পরের মিত্ররূপে অভিহিত হন। এই মিত্রতার পরিচয় পেলেন ইংরেজ ১৮২৫ সালের ভরতপুর সংগ্রামের সঙ্কটকালে। ইংরেজকে সে সময় বিপন্ন দেখে রোহিলারা ঝাঁসীর সন্নিহিত কাল্পী নামক ইংরেজদের এক নগরী অবরোধ করে। ঝাঁসী-রাজ রামচন্দ্রও সে সময় চার শত অশ্বারোহী, এক হাজার পদাতিক ও দু'টি কামান পাঠিয়ে কাল্পী

রক্ষায় ইংরেজকে সাহায্য করেন—তাঁর সাহায্যের জন্যই তখন কাল্পী রক্ষা পায়।

এর পর এলো ১৮৩২ সালের স্মরণীয় ১৯শে ডিসেম্বর। মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল। তিনি রাজ্যের পরম সঙ্কটে ঝাঁসীর মিত্র-রাজা রামচন্দ্র রাওয়ের আচরণের কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং সেই সন্তোষ শুধু মুখের কথাতেই শেষ করা সঙ্গত মনে করলেন না। ফলে, গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর স্বয়ং ঝাঁসীতে এলেন পরম মিত্ররাজার প্রতি যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অভিপ্রায় নিয়ে। ঝাঁসীর বিশাল রাজভবনে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এক দরবার করে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ঝাঁসীরাজ রামচন্দ্র রাওকে মহারাজা উপাধির সঙ্গে ছত্র চামর প্রভৃতি উপহার দিয়ে তাঁর রাজ-গৌরব আরো বাড়িয়ে দিলেন এবং নূতন মহারাজার সঙ্গে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পরম সৌহৃদ্যের কথা আর একবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। এর ফলে সারা ঝাঁসী-রাজ্যে আনন্দের বান ডেকে গেলো; সকলেই জানলো, প্রবল প্রতাপ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ঝাঁসী সরকারের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হওয়ায় ভবিষ্যতে কোনরূপ বিপত্তি ঘটবার আর আশঙ্কা রইল না। এ থেকে বুঝতে কোন গোল বা অসুবিধা ছিল না যে, মহারাজ রামচন্দ্র রাওয়ের বংশধররূপে মহারাজ গঙ্গাধর রাও ইংরেজের মিত্র-রাজরূপেই স্বাধীন ভাবে ঝাঁসীতে রাজত্ব

রক্ষায় ইংরেজকে সাহায্য করেন—তাঁর সাহায্যের জন্যই তখন কাল্পী রক্ষা পায়।

এর পর এলো ১৮৩২ সালের স্মরণীয় ১৯শে ডিসেম্বর। মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল। তিনি রাজ্যের পরম সঙ্কটে ঝাঁসীর মিত্র-রাজা রামচন্দ্র রাওয়ের আচরণের কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং সেই সন্তোষ শুধু মুখের কথাতেই শেষ করা সঙ্গত মনে করলেন না। ফলে, গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাতুর স্বয়ং ঝাঁসীতে এলেন পরম মিত্ররাজার প্রতি যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অভিপ্রায় নিয়ে। ঝাঁসীর বিশাল রাজভবনে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এক দরবার করে গবর্ণর জেনারেল বাহাতুর ঝাঁসীরাজ রামচন্দ্র রাওকে মহারাজা উপাধির সঙ্গে ছত্র চামর প্রভৃতি উপহার দিয়ে তাঁর রাজ-গৌরব আরো বাড়িয়ে দিলেন এবং নূতন মহারাজার সঙ্গে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পরম সৌহৃদ্যের কথা আর একবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। এর ফলে সারা ঝাঁসী-রাজ্যে আনন্দের বান ডেকে গেলো; সকলেই জানলো, প্রবল প্রতাপ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ঝাঁসী সরকারের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হওয়ায় ভবিষ্যতে কোনরূপ বিপত্তি ঘটবার আর আশঙ্কা রইল না। এ থেকে বুঝতে কোন গোল বা অসুবিধা ছিল না যে, মহারাজ রামচন্দ্র রাওয়ের বংশধররূপে মহারাজ গঙ্গাধর রাও ইংরেজের মিত্র-রাজরূপেই স্বাধীন ভাবে ঝাঁসীতে রাজত্ব

করছেন। কিন্তু চতুর ইংরেজ যে এর মধ্যে একটা ফাঁক রেখেছিল—রাণী লক্ষ্মীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই সেটা এক দিন ধরা পড়ে গেল।

(৩)

বর-বেশে মহারাজা গঙ্গাধর রাও বিবাহ বাসরে সুসজ্জিতা কন্যার মুখে প্রাসঙ্গিক একটি কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ বড় সাধারণ মেয়ে নয়—অসামান্যা কোন মনস্বিনী মেয়ে না হোলে বিবাহ-স্থলে বরের কাপড়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সময় বহু লোকের সামনে পরিহাসের সুরে কখনই বলতে পারতেন না—'পুরুত ঠাকুর! খুব জোরে গিঁট দিন—যেন খুলে না যায়!'

বিবাহের পর বধূরূপে ঝাঁসীর বিশাল প্রাসাদে এসে এমনি অনেক বিষয়েই কন্যা তাঁর নির্ভীক ও সপ্রতিভ ব্যবহারে প্রাসাদ-শুদ্ধ সকলকেই অবাক করে দিলেন। নববধূ রাজকন্যা নন, কোনো বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরোয়ানার মেয়েও নন, তাঁর পিতা সাধারণ এক রাজ-কর্মচারী মাত্র—কিন্তু রাজরাণী ও বধূর মর্যাদা নিয়ে রাজ-প্রাসাদে আসবার পরেই তাঁর ভাবভঙ্গি কথাবার্তা আচার-ব্যবহার দেখে স্বয়ং মহারাজও স্তব্ধ হোয়ে গেলেন। তিনি ভেবে স্থির করতে পারলেন না যে এতটুকু মেয়ে, এই বয়সে এখানে এসেই এ-সব শিখলে কোথা থেকে? সে যে এই বংশের রাণী—বিশাল অন্দরমহলের অধিনায়িকা, তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য

অত্যন্ত কঠিন—এ সব তথ্য নিজে থেকেই কেমন করে, এই বালিকা বধূ জ্ঞাত হলো ?

সাধারণতঃ যে-বয়সে বালিকারা খেলাধূলা করেই আনন্দ পায়—সাংসারিক কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় ; নব পরিণীতা কন্যা সেই বয়সেই রাণীর গাম্ভীর্যে নিজেকে আবৃত করে রাজান্তঃপুরের কর্ত্রীত্ব ভারও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এই জন্যই অন্দর-মহলের দাস-দাসী থেকে আরম্ভ করে রাজ্যেশ্বর মহারাজ পর্যন্ত বিস্ময়ে অবাক হোয়েছেন। রাজ-সংসারের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও এক বিরাট ব্যাপার! বিভিন্ন প্রকৃতির বহু পরিজন, নিকট ও দূর-সম্পর্কের নানা শ্রেণীর আশ্রিতা আত্মীয়-স্বজন, বহু পরিচারিকা ও প্রতিহারিণী, তাদের সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি শত শত প্রাণী বিশাল রাজান্তঃ-পুরে প্রতিপালিত হয় ; তাদের যথাযথ পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিদর্শিকা বা তত্ত্বাবধায়িকা থাকা সত্ত্বেও রাজ-প্রাসাদের রাণীই মাথার উপরে থাকেন অধিনায়িকার মত। প্রাসাদের অন্দর-মহলের মত বহির্মহলেও বহু পুরুষ মহারাজার আশ্রিত রূপে বসবাস করেন, সেখানে পরিদর্শকদের উপরে অধিনায়ক থাকেন মহারাজ স্বয়ং। এত সব পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও নানা শ্রেণীর লোকজনদের নিত্য নিয়মিত ভাবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারও বড় সহজ কথা নয়—রাজা রাজড়াদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা। কিন্তু বালিকা হোলেও ঝাঁসীর নতুন

রাণী লক্ষ্মী নিজের কর্তব্য মনে করে নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন— অধিনায়িকার মত সব কাজের তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। বালিকার এই সাহস ও কর্তব্যজ্ঞান রাজপুরীর সকলকেই বিস্ময়ে অভিভূত করে।

মহারাজ গঙ্গাধর আদর করে রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন : শুনলাম, তুমি না কি অন্দর-মহলের যাবতীয় কাজকর্মের তদারক নিজেই করছ ?

স্বামীর দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে একটি বার চেয়েই সে দৃষ্টি নত করে লক্ষ্মী বললেন : হ্যাঁ ! এখানে এসেই শুনেছিলাম, এ কাজ রাণীর ; তাই ভরসা করে আমিও এগিয়ে গেছি। ভালো করিনি ?

সাদরে বধূরাণীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে মহারাজ বললেন : নিশ্চয়ই ভালো করেছ। কিন্তু তোমার মত এত অল্প বয়সে কোন মেয়ে রাণী হয়ে ত আসেননি, তার পর বয়স অনেক বেশী না হলে কেউ ভরসা করে তোমার মতন এগিয়ে যেতেও পারেননি ! আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, তুমি এ-বাড়ীতে এসেই এ খবর নিয়েছিলে !

লক্ষ্মী বললেন : আমি রাজকন্যা না হোলেও রাজ-বাড়ীর ভিতরকার খবর সব জানি। বিঠুরের পেশোয়াজীর ভাই আপ্পাজীর কাছে আমি যে অনেক কথা শুনিছি। বিয়ের পর রাণী হোয়ে এলে রাণীরা যে বসে বসে আলস্যে দিন কাটান না, অন্দর-মহলে তাঁদের কত কাজ, আপ্পাজীর কাছে তখন খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে সবই জেনেছিলাম যে! তিনি বলতেন, পেশোয়ারা যেমন দরবার করে রাজ্য শাসন করতেন, পেশোয়ার রাণীরা তেমনি অন্তঃপুরে রাজত্ব করতেন—সেখানে পেশোয়াদের ক্ষমতা চলতো না, রাণীরাই সব কিছু করতেন। বিধাতা যখন আমায় রাণী করেছেন, রাজ্য শাসন করবার শক্তিও নিশ্চয়ই দিয়েছেন। আমি মনে করি, এই অন্দর-মহল আমার রাজ্য। আপনি যেমন ঝাঁসী রাজ্য শাসন করেন, আমারও উচিত এই রাজ্যটিও তেমনি শাসন করা। অবিশ্যি, আমি বালিকা; যদি ভুল করি—দোষ-ত্রুটি হয়, মাথার উপরে আপনি আছেন—স্বামী, তার ওপর রাজা; দোষ, ত্রুটি, ভুল দেখিয়ে দেবেন, আমি সাবধান হব। আর এতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তাও বলুন।

পত্নীর কথাগুলি মুগ্ধ হোয়েই মহারাজ শুনছিলেন। শেষে আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে বললেন: আমি অনেক পূণ্যের ফলেই তোমার মত কন্যারত্নকে আমার পত্নীরূপে পেয়েছি। এখানে এসে অল্প দিনেই তুমি যে রকম সুবুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছ, আর এই মাত্র যে সব কথা আমাকে বললে, তা থেকেই বুঝতে পারছি—রাণী হবার জন্যেই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। যে জ্যোতিষী তোমার সন্ধান দিয়েছিলেন, তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। আদর্শ নারীর গুণরাশি তোমার মধ্যে সবই আছে। আমি তোমার উপরে অন্দর-মহলের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিলাম; সত্যই এ তোমার রাজ্য, আর এ রাজ্যে তুমি

রাণী, তুমি সর্বময়ী। সবাই এখানে অবনত-মস্তকে তোমার শাসন স্বীকার করবে।

লক্ষ্মীও তৎক্ষণাৎ স্বামীর পদতলে অবনত-মস্তকে ভক্তি নিবেদন করে গাঢ় স্বরে বলল: আপনি আশীর্বাদ করুন—রাজান্তঃপুরের সকলকেই আমি যেন স্নেহ দিয়ে আপনার করে নিতে পারি।

স্বামীর আশীর্বাদেই হোক, বিধাতার ইচ্ছাতেই হোক, কিম্বা লক্ষ্মীর আশ্চর্য গুণের জন্যই হোক—অল্প দিনেই তাঁর অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে উঠল আশ্চর্য ভাবে। অন্তঃপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠল রাণীর উদ্দেশে। দেখতে দেখতে বিশাল অন্দর-মহলের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাণী লক্ষ্মীর এক অপূর্ব রাজ্য উঠল গড়ে। অন্তঃপুরে আশ্রিতা আত্মীয়াদের কুমারী কন্যারা দলবদ্ধ হোয়ে নানারূপ খেলা ও নৃত্য-গীতে অভ্যস্ত ছিল; লক্ষ্মী এখন তাদের মনে প্রেরণা দিয়ে মারাঠা বীরাঙ্গনাদের আদর্শে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, প্রাচীরবদ্ধ রাজান্তঃপুরের সুদীর্ঘ উদ্যান, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কৃত্রিম অরণ্য, সুবৃহৎ সরোবর—সবই রয়েছে অন্তঃপুরিকাদের চিত্তবিনোদনের জন্য, হয়ত এক কালে অন্তঃপুরের মহিলারা এই সব উদ্যান অরণ্য প্রান্তর সরোবরসমূহ ব্যবহার করে চাঞ্চল্যের সাড়া তুলতেন; কিন্তু এখন এগুলি শুধু অতীতের স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়—এদিকে পুরবাসিনীদের কোন আগ্রহই নেই। রাণী লক্ষ্মীর আদেশে উদ্যান, উপবন,

সরোবর বহু দিন পরে সংস্কৃত হলো ; বহু দিন অব্যবহৃত থাকায় উদ্যানগুলি দুর্গম জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল, আর উপবনগুলির ত্রিসীমায়ও কেউ ভয়ে ঘেঁসত না—মহাবনের মত ভীষণ হয়ে ওঠায়। কিন্তু লক্ষ্মীর চেষ্টায় আবার তাদের পূর্বশ্রী ফিরে এলো।

এই সব সংস্কার-কার্য দেখে মেয়েদের মনে কৌতূহল জাগলো—বধূরাণীর মতলব কি ? বহু কাল ধরে যে সব জমি পড়ে থেকে বন-জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল, সেগুলির দিকে সহসা রাণীর নজর পড়ল কেন ? বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কি হবে ?

এর পর রাণী এক দিন সকলকে ডেকে নিজেই বললেন : তোমাদের জন্যই অন্দর-মহলের পিছনের ঐ-সব বন-জঙ্গল আমি পরিষ্কার করিয়েছি। ঘরে বসে তোমরা যে সব হাল্কা খেলাধূলা কর, তাতে দেহ বা মন কোনটাই শক্ত হয় না। এখন থেকে আমি তোমাদের নিয়ে খেলব, আর আমাদের খেলবার জায়গা হবে ঐ সব মাঠ-ময়দান-বাগান-বন—যেগুলো পরিষ্কার করানো হয়েছে।

রাণী নিজে তাদের সঙ্গে খেলা করবেন শুনে মেয়েগুলি আনন্দে ফেটে পড়বার মত হোয়ে বলে উঠল : রাণী আমাদের সঙ্গে খেলবেন ! এমন সৌভাগ্য আমাদের হবে ?

মিষ্টি হেসে লক্ষ্মী বললেন : বিয়ের আগেও আমি খেলেছি ; আমাদের খেলা দেখে কত লোক অবাক হোয়ে চেয়ে থাকত।

বিয়ে হলেও সে খেলা আমি ভুলতে পারিনি, তোমাদের নিয়ে খেলবো স্থির করেছি। না খেললে শরীর আর মন শক্ত হবে কি করে?

এর পর লক্ষ্মী খেলার যে ব্যবস্থা করলেন, তাঁর কাছে অপূর্ব বা অদ্ভুত না হোলেও এখনকার মেয়েরা খেলবার আগে সে খেলার নাম শুনেই চমকে উঠলো—সেই সঙ্গে তাদের মনে মনেও এক বিস্ময়কর উত্তেজনার সঞ্চার হোলো।

লক্ষ্মী করলেন কি, মহারাজকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা বলে কতকগুলো টাট্টু ঘোড়া আনালেন অন্দর-মহলে। কালো কালো হৃষ্টপুষ্ট তেজী ঘোড়া—গায়ের লোমগুলি এত মসৃণ যে, পিঠে মাছি বসলেও বুঝি পিছলে পড়ে। আর, দেখতে ছোট হলেও শক্তিতে তারা কম নয়—বড় বড় লড়াইয়ে ঘোড়ার সঙ্গেও টক্কর দিয়ে ছুটতে পারে, এমনি তাদের পায়ের জোর।

যতগুলি মেয়েকে নিয়ে লক্ষ্মী তাঁর দলটি বেঁধেছিলেন, ঠিক ততগুলি ঘোড়াই যোগাড় করে আনালেন দলের মেয়েদের জন্যে; অবিশ্যি, নিজেও একটি ঘোড়া বেছে নিয়েছিলেন তিনিও খেলবেন বলে। এক-একটি ঘোড়ার এক-একটি নাম রেখে তিনি দলের প্রত্যেক মেয়েকে দিয়ে বললেন—এই নাম রইল তোমার ঘোড়ার, এই নাম ধরে তুমি ডাকবে, নিজের হাতে খাওয়াবে, তোয়াজ করবে, তার পর খেলা হোয়ে গেলে খোজা সহিস এসে ঘোড়াগুলোকে আস্তাবোলে নিয়ে যাবে, নিজের নিজের ঘোড়ার নাম সবাই মনে রাখবে।

এখানে বলা উচিত, রাজ-অন্তঃপুরে পুরুষ পরিচারকদের প্রবেশ করবার উপায় নেই। অন্দর-মহলে কাজ করবার জন্যে খুব শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ মেয়েরা নিযুক্ত থাকে। আবার যে সব কাজ মেয়েদের দ্বারা সম্ভব নয়, সেখানে খোজাদের বহাল করা হয়। লক্ষ্মী প্রথম প্রথম খোজা সহিসদেরই আনিয়ে মেয়েদের ঘোড়ায় চড়া শেখাবার ব্যবস্থা করলেও, পরে 'মাওলা' নামে অন্ত্যজ শ্রেণীর মারাঠা মেয়েদের আনিয়ে তাদের উপরে অন্দর-মহল এবং অন্দর মহলের মহিলাদের ঘোড়াগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন।

ঝাঁসীতে রাজবধূরূপে আসবার আগেই লক্ষ্মী বিঠুরে শুধু যে ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলেন তা নয়, এই বিদ্যাতে তিনি এমনি পারদর্শিনী হোয়ে ওঠেন যে, প্রতিযোগিতায় এক নানা সাহেব ভিন্ন কেউ তাঁকে হারাতে পারতেন না। যাদের ঘোড়ায় চড়ে ব্যায়াম করা অভ্যাস, একদিন ঘোড়ায় চড়তে না পেলে তাদের মন যেন নিস্‌পিস্ করতে থাকে। রাণীরও হয়েছিল সেই দশা। বিয়ের পর ঝাঁসীতে এসে আর ত তাঁর ঘোড়ায় চড়া হয়নি; অথচ, ঘোড়ায় চড়বার জন্যে তাঁর মন সর্বক্ষণ উস্‌খুস্ করতে থাকে। শেষে বুদ্ধি খেলিয়ে তিনি শুধু নিজের জন্যে নয়—রাজপ্রাসাদের সমবয়সী মেয়েদের জন্যেও নিত্য নিয়মিত ভাবে ঘোড়ায় চড়ে খেলা করবার এই উপায় উদ্ভাবন করলেন। ফলে, ঝাঁসীর ভাবী নারীবাহিনী গঠনের এক পটভূমিকার পত্তন হলো।

লক্ষ্মী তাঁর কিশোরী সঙ্গিনীদের বললেন: এ খেলা নতুন কিছু নয়; ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী মারাঠা মেয়েদের অন্তরে বীরাঙ্গনা হবার প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি যখন মারাঠা দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে সমস্ত জাতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, মারাঠা মেয়েরাও তখন চুপ করে ঘরের কোণে বসেছিল না। বর্ম পরে অস্ত্র হাতে করে ঘোড়ায় চড়ে তারাও পুরুষদের মত লড়াই করেছিল। সে যুগে প্রত্যেক মারাঠা মেয়ের সম্পদ গর্ব ও গৌরব বলতে ছিল—একটা ঘোড়া, একটা বর্ম, আর একখানা তলোয়ার। এখন আমরা সে সব ত্যাগ করে সাড়ী কাঁচুলি অলঙ্কার সার করিছি; তাই চার দিক দিয়ে জাতির জীবনে দুর্গতিও ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি কি ভেবেছি জানো—তোমাদের নিয়ে এই ঝাঁসী থেকে আবার পথ খুলে দেব। আমাদের দেখাদেখি মারাঠা মেয়েরা আবার আগেকার মত বর্ম পরবে, তলোয়ার খেলবে, আর ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে।

লক্ষ্মীর কথা, লক্ষ্মীর অপূর্ব মূর্তি, লক্ষ্মীর বিচিত্র ভঙ্গি মেয়েদের অন্তরে তখন প্রেরণা ঢেলে দিয়েছে, তরুণ মনগুলি উদ্দীপিত হোয়ে উঠেছে দারুণ এক উত্তেজনায়; রাণীর আদর্শে তারা প্রত্যেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এলো।

এখন থেকে রাজান্তঃপুরের প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল বিস্তীর্ণ স্থানটি অবলম্বন করে এই কিশোরীদের ঘোড়দৌড়ের খেলা আরম্ভ হলো। লক্ষ্মী নিজে তাদের শেখাতে লাগলেন—কেমন করে ঘোড়াকে বাধ্য করতে হয়, কি ভাবে ঘোড়ার পীঠে

চড়তে হয়, কি কৌশলে ঘোড়া চালাতে হয়। সহিসরাও ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেকে রাণীর নির্দেশ মত কাজ করতে লাগল।

অল্প দিনের মধ্যেই কিশোরী দলটি অশ্বারোহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ক্রমে তারা স্বাধীন ভাবে নিজে থেকেই নিজের ঘোড়াকে ইচ্ছামত চালাতে সমর্থ হলো। তখন তাদের কি আনন্দ! এত বড় একটা বিদ্যার আলো এত দিন তাদের চোখে পড়েনি—তারা যেন অন্ধকারে বসেছিল। কি শুভক্ষণেই রাণী এসেছিলেন, আর এই বিদ্যার কথা বলে, এই বিদ্যার আলো নিজের হাতে জ্বেলে দিয়ে তিনি এদের জড়তা কাটিয়ে পথ খুলে দিলেন!

এর পর এই খেলাতেই মেয়েগুলি এমনি মেতে উঠলো যে, প্রাচীরের মধ্যে যেন তাদের প্রমত্ত চিত্তগুলি আর আবদ্ধ থাকতে চায় না। নবলব্ধ এই বিদ্যার আলো—প্রাচীরের বাহিরের মেয়েদের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য অতিষ্ঠ হোয়ে উঠলো। তাদের আগ্রহ দেখে লক্ষ্মীর মনটিও আনন্দে যেন ঝলমল করে উঠলো; তিনি বললেন: এ-বিদ্যার ধারাই এই; এর আলো চোখে পড়লে সে আলোয় শুধু নিজের চোখই ভরে যায় না—অপরেও যাতে সে আলোর আভা দেখে আনন্দ পায়—সেই সাধই মনে জেগে উঠে। এই দেখ না—তোমরা অন্দর-মহল থেকে চুপি-চুপি ঘোড়ায় চড়া বিদ্যাটি শিখে এত আনন্দ পেয়েছ যে, বাহিরের মেয়েগুলিকেও এই

বিদ্যা শেখাবার জন্যে অধীর হোয়ে উঠেছ। কিন্তু এর জন্য ব্যস্ত হয়ো না, ক্রমে ক্রমে সবই হবে। জানো ত, আমি রাজবধূ—তোমাদের সঙ্গে অন্দর-মহলে খেলা করি বলে বাইরে গিয়ে ত আর ছুটোছুটি করতে পারি না। তা ছাড়া, এখানে আমাদের আরো কাজ আছে।

শুধু ঘোড়ায় চড়া নয়—শাস্ত্র পাঠ, পূজা-অর্চনা, সেবা-পরিচর্যা—এই প্রয়োজনীয় বিদ্যাগুলিও লক্ষ্মী সঙ্গিনীদের শিখাতে লাগলেন।

মহারাজা গঙ্গাধর তলে তলে খবর নিয়ে জানলেন, কিশোরী রাণী লক্ষ্মী মহীয়সী মহিষীর মত অন্তঃপুরের সর্বত্র নিপুণ লক্ষ্য রেখে এমন সুশৃঙ্খলে তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেছেন যে, কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি নেই, রাণীর আচরণে সকলেই সন্তুষ্ট; যে প্রাচীন নিয়মে অন্তঃপুরের কাজগুলি চলে আসছিল, রাণী লক্ষ্মী তার দোষ-ত্রুটিগুলি তুলে দিয়ে অনেক পরিবর্তন করেছেন কিন্তু তার জন্যে কেউ কোন অভিযোগ তোলেনি, বরং মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাই করছেন।

প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর আশ্চর্য অশ্বচালনা স্তব্ধ হোয়ে দেখেন। মারাঠা বীরাঙ্গনাদের মত আঁট-সাট করে কাপড় পড়ে ঘোড়ায় চড়ে রাণী অন্দর-মহলের বিস্তীর্ণ উদ্যানে টহল দিচ্ছেন—অদূরে তাঁর সঙ্গিনীরা তাদের ঘোড়ার পীঠে বসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে রাণীর অদ্ভুত অশ্বচালনা দেখছেন। কিছুক্ষণ পরেই রাণীর ইঙ্গিতে সঙ্গিনীরাও তাদের

ঘোড়া নিয়ে রাণীর অনুসরণ করল—উদ্যান-পথে চলল এই অশ্বারোহিণী দলের অপূর্ব পরিক্রমণ! কিশোরী রাণীর অশ্বারোহণে এই ভাবে বিস্তীর্ণ উদ্যান পরিক্রমণ দেখে মহারাজের স্মৃতিপথে অতীত যুগের মারাঠা বীরাঙ্গনাদের মূর্তিগুলি যেন ছবির মত ফুটে উঠতে থাকে।

(৪)

উদ্যান ভ্রমণের পর রাণী সেদিন বেশভূষা পরিবর্তন করে প্রাসাদকক্ষে ফিরে আসতেই মহারাজ গঙ্গাধর রাও সহাস্যে তাঁকে বললেন: অলিন্দ থেকে তোমাদের খেলা দেখছিলাম। দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল আগের যুগের মারাঠা বীরাঙ্গনাদের রণরঙ্গিনী মূর্তিতে রণযাত্রা! তাঁরাও এমনি করে সেজে-গুজে ঘোড়ায় চড়ে দেশের জন্যে লড়াই করতেন। এখন যেন যে সব স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলি, ইংরেজরা যখন দেশরক্ষার ভার নিয়েছেন, আমাদের বলেছেন—তোমাদের কোন ভয় নেই, আরাম করে গদাতে বসে থাক, প্রজারা কলের পুতুলের মতন সেবা করবে; হাঙ্গামা কিছু বাধলেই আমরা আছি। কাজেই, এখন আর আগেকার মতন মারাঠা মেয়েদের রণচণ্ডী হোয়ে এ ভাবে মহলা দেওয়া কি ঠিক হবে? জানো, রেসিডেন্ট এলিস সাহেব রাজ্যের সব খবর রাখেন—তিনি যদি শোনেন যে, তুমি আগেকার মত

মেয়ে-পল্টন তৈরী করে মহলা দিচ্ছ, তা'হলে কিন্তু খুশি হবেন না—তখুনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

স্বামীর কথা শুনে রাণীর সুন্দর মুখখানা নিমেষে যেন ঘৃণায় কালো হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকলেও তিনি রাজ-দরবারের প্রতিদিনের খবর সংগ্রহ করতেন। দরবারে কি কি কথা হয়, কে কি বলে, মহারাজের কি রকম মনোভাব—সবই তিনি সাগ্রহে শুনতেন। এর ফলে তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এক দিন দিল্লীর মোগল বাদশা এবং তার পর পুণার পেশোয়াদের যে বিপুল প্রতাপ ছিল, ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা স্বাধীন ভাবে থাকলেও, তাঁদের কাছে সর্বদাই মাথা নিচু করে থাকতেন, তাঁদের দূতকে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করতেন ; এখন সে প্রতাপ ও সম্মান কলকাতায় বসে ইংরেজ বড়লাট বাহাদুরই লাভ করছেন। ঝাঁসীর রাজ-দরবারে এলিস নামে যে ইংরেজ দূত রেসিডেন্টরূপে উপস্থিত থাকেন, তাঁর কি দপদপা! স্বয়ং মহারাজ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেও যেন সর্বদা শশব্যস্ত হয়ে থাকেন। অথচ তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ নৃপতি নন—স্বাধীন ও মিত্ররাজরূপে পরিগণ্য। রাণী জেনেছেন, রেসিডেন্ট সাহেব যদি কোন কাজের জন্য অন্যায় সুপারিশও করেন, মহারাজ সেখানে অম্লানবদনে সম্মতি জানিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করে দেন। এই সূত্রে এমন কতিপয় কাজ হয়েছে, যার জন্যে রাজ্যের তহবিল ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রজাদের অসুবিধাও ঘটেছে। কিন্তু

মহারাজের সেদিকে দৃষ্টি নেই ; রেসিডেন্ট এলিস সাহেবের তুষ্টিতেই তাঁর তুষ্টি এসব কথা মনের মধ্যে রাণী আলোচনা করে মনে-মনেই ব্যথা বোধ করেন—মুখ ফুটে কোন দিন বলেননি মহারাজকে। কিন্তু আজ তাঁর ঘোড়ায় চড়া নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে রাজা রেসিডেন্ট সাহেবের কথা তুলতেই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ কে যেন ঝাঁকরে ভেঙে দিল, আর রাণীর মনের ভিতরে অবরুদ্ধ কথাগুলি হুড়-হুড় করে বেরিয়ে এল। রাণী বলতে লাগলেন ঃ আমার যখন বিবাহের কথা হয়, তখনই আমি শুনেছিলাম, এক স্বাধীন রাজ্যের রাণী হতে আমি চলেছি। বিবাহের পর মহারাজের কাছে আমি এই রাজ্যের যে সব কথা শুনিছি, তা থেকেও বুঝেছিলাম, মহারাজ স্বাধীন। কিন্তু এই মাত্র আমাকে যে সব কথা আপনি বললেন, সে ত কোন স্বাধীন রাজার মুখের কথা নয়! রেসিডেন্ট এলিস সাহেব ইংরেজ রাজার দূত ; ঝাঁসীর স্বাধীন মহারাজকেও যে তাঁর মন যুগিয়ে চলতে হবে—এ কথা যে কল্পনারও অতীত। এক রাজার দূত আর এক রাজার দরবারে থাকেন—নিজের রাজার স্বার্থ-সুবিধা দেখবার জন্য। কিন্তু জানি, মহারাজের দরবারে ইংরেজ সরকারের দূত এমন সব বাড়তি কাজ করেন যাকে অনধিকার চর্চা বলা যায়। অথচ, মহারাজ অম্লানবদনে তাঁর বেয়াদপি সহ্য করেন। হয়ত এই জন্যেই আপনি এইমাত্র আমাকে বললেন যে, রাজ্যের রাণী মেয়ে-পল্টন তৈরী করছেন, এ কথা যদি রেসিডেন্ট জানতে পারেন, আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন। তা'হলেও আমি

মহারাজকে নিবেদন করছি, যদি সত্যিই তাই হয়, মহারাজ যেন রেসিডেন্ট সাহেবকে বলেন—রাণীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন যে, আপনার দেশের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে বিলেতের রাজপথে বেড়িয়ে বেড়ায় রাণী শুনেছেন। রাণীর দেশের মেয়েরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন, এ কথা নিশ্চয়ই রেসিডেন্ট সাহেব শুনেছেন। এ দেশের মেয়েরা ইদানীং সে পাট তুলে দিয়েছেন বলেই রাজ্যের পর রাজ্য স্বাধীনতা হারিয়েছে। ঝাঁসীর স্বাধীনতা যাতে বরাবর বজায় থাকে, সেই জন্যেই ঝাঁসীর রাণী পুরানো পাট বজায় রেখেছেন। তিনি দেশবাসীকে জানাতে চান—ঝাঁসীর মেয়েরা প্রয়োজন হোলে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ঘোড়ায় চড়ে রণস্থলে ধাওয়া করবে—রাণী থাকবেন তাদের আগে।

কথাগুলি শুনতে শুনতে মহারাজ গঙ্গাধর অবাক বিস্ময়ে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও নির্গত হলো না। যে-সব কথা তাঁর দরবারের বিচক্ষণ অমাত্যগণও মহারাজের সম্মুখে বলতে সাহস পান না, বরং প্রভুর তুষ্টিবিধানের জন্য প্রতিবাদ করতেও কুণ্ঠিত, রাণী কি না অসঙ্কোচে অপ্রীতিকর জেনেও তাঁর মুখের উপরেই এ ভাবে বিষবর্ষণ করে গেলেন?

মহারাজকে নিরুত্তর দেখে রাণী এবার কোমল কণ্ঠে বললেন:

আমার কথাগুলি হয়ত অপ্রিয়, কিন্তু অন্যায় নয়। যে সব কথার পিছনে সত্য নেই, আমি তা বলি না।

মহারাজ মৃদুস্বরে বললেন আমি জানতাম, তুমি অন্দরমহল, পড়াশোনা আর খেলাধুলা নিয়েই থাক ; দরবারের সব ব্যাপার নিয়েও তুমি যে চিন্তা কর, আমার তা জানা ছিল না।

রাণী বললেন : আমি ত শুধু গৃহিণী নই—আমি যে আপনার রাজ্যের রাণী। সহধর্মিণী বলেই আপনি আমাকে মন্ত্র পড়ে গ্রহণ করেছেন। তাই রাজ্যের কথাও আমাকে ভাবতে হয়।

মহারাজ এখন গলার স্বর গাঢ় করে বললেন : রেসিডেণ্ট সাহেবের কথা তুলে তোমাকে ও-কথা বলা হয়ত আমার উচিত হয়নি, কিন্তু তুমি যা বললে—রেসিডেণ্টের মন যোগাতে রাজ্যে এমন কাজও আমি করেছি, যার জন্যে তহবিলের ক্ষতি এবং প্রজাদের অনিষ্ট হয়েছে—এমন একটি অন্যায় কাজের কথা তুমি বলতে পার ?

রাণী কিছু মাত্র চিন্তা না করেই বলে উঠলেন : হাঁ মহারাজ, সেই একটি কথা থেকেই আমার সব কথা প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি নির্ভয়েই বলছি, শুনুন—লালা মীরচাঁদ আর শেঠ মদনলাল, এই দুই ব্যক্তিকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। এরা দু'জনেই ইংরেজের আমদানী। রেসিডেণ্ট সাহেব আপনাকে জানালেন—মীরচাঁদ ভারি হুঁসিয়ার লোক, ঝাঁসী রাজ্যে কতকগুলো আফগান জায়গীরদার আছেন, মীরচাঁদ তাদের

সবাইকে বাধ্য করবার কলকাঠি জানে। ওরা প্রায়ই ঝামেলা বাধায়। তা ছাড়া, হিন্দু জায়গীরদাররাও মীরচাঁদকে মানবে। তার কারণ, মীরচাঁদের তাঁবেয় অনেক জঙ্গী লোক আছে, আর ইংরেজ সরকারেও ওঁর খুব খাতির। অতএব মীরচাঁদকে বাহাল করা হোক। মহারাজ এ কথা শুনেই আপ্যায়িত হয়ে গেলেন, তখনি ইংরেজের ঐ হাতের পুতুলটিকে মোটা টাকা তংখা দিয়ে বাহাল করলেন। অথচ, কোন প্রয়োজনই ওঁর ছিল না। বছর সালিয়ানা ছয় লাখ টাকা লালা মীরচাঁদকে ঝাঁসীর তহবিল থেকে দিতে হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে হাজির করলেন আপনার রেসিডেণ্ট শেঠ মদনলালজীকে। এ লোকটা যেমন টাকার কুমীর, তেমনি ইংরেজের চাটুকার এক দালাল। নানা রকম ব্যাপারে রাজ্যের খরচ বরাবরই বাড়াবার পরামর্শ দেন ঐ রেসিডেণ্ট মহারাজকে ; টাকার অভাবের কথা সেরেস্তা থেকে উঠলেই তখনি রেসিডেণ্ট সাহেব ঐ শেঠ মদনলালজীকে দেখিয়ে দেন। চড়া সুদে কর্জ নিয়ে মহারাজ সেই খরচ মিটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু রাজ্যের ঋণ যে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে, সে কথা মহারাজ মনে করেন না কোন দিন।

রাণীর আগের কথাতেই মহারাজ বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন, এখন লালা মীরাচাঁদ ও শেঠ মদনলালের কথা শুনে বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে একেবারে অভিভুত হয়ে পড়লেন। রাণীর এই স্পষ্ট কথা এবং বুদ্ধিদীপ্ত মনের বিচিত্র আভা তাঁরও মনের উপর এক অদ্ভুত আলোকপাত করল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মহারাজ

বললেন ঃ তোমার কথা শুনে আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি রাণী ! যে ঘটনার কথা লোকমুখে শুনে তুমি তা থেকে তলিয়ে তলিয়ে এত কথা ভেবেছ, সে ঘটনার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে এমন করে কোন দিনই ভাবিনি। তবে, তুমি যে অনুমান করেছ, তা যে মিথ্যে নয়, অধুনা নানা সূত্রে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। এখন মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে তখন যদি পরামর্শ করতাম, তা'হলে হয়ত এ ঘটনা ঘটতে পেত না। কিন্তু এখন সত্যই নিরুপায় হয়ে পড়েছি। লালা মীরচাঁদ যে ভাবে রাজ্যের বুকে চেপে বসেছে, তাতে ওকে সরাবার জন্যে হাত বাড়ানো মানেই, সে হাত ইংরেজ রেসিডেণ্ট সাহেবের উপরে চালানো। তার পর, শেঠ মদনলালজীর কাছে আমাদের দেনাও কম নয়। ওকে বিদেয় করতে হলে সমস্ত দেনা-পত্র ওর চুকিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তহবিলে এখন টাকার অভাব।

রাণী বললেন ঃ টাকার যখন অভাব, তখন বাড়তি খরচ কমানোই আগে উচিত। অন্দরমহলে থেকেই আমি দেখতে পাই, বার-মহলে মহারাজের এত বাড়তি খরচ, যাকে অন্যায় বা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ও-সব দিকে কারুর লক্ষ্যই নেই। কিন্তু মহারাজ যদি অন্দরমহলের হিসাব দেখেন ত সত্যই অবাক হয়ে যাবেন। আমার আগে যে খরচ হোত, আর আমি এসে সমস্ত অন্দরমহল হাতে নেবার পর দেখবেন খরচ কত কমে গেছে। অবিশ্যি, আমার আমলে কোন কোন কাজে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু যে খরচ কমানো

হয়েছে—তার তুলনায় এ খরচ কিছু নয়। আমি যে সব বাড়তি খরচ করে চলেছি—সেগুলো বাজে নয়। তাতে অনেক লোক খেতে-পরতে পাচ্ছে, আর রাজপুরীর শ্রীবৃদ্ধিও হচ্ছে।

মহারাজ বললেন: আমি আগেই সে-সব জেনেছি। আর সে কথা আমি বার-মহলের কর্তাদেরও বলেছি। বেশ, এখন থেকে আমি সব বিষয়েই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে চলব রাণী, তোমার মঞ্জুরী ছাড়া এর পর কোন কাজ করব না।

মনে মনে তরুণী রাণী এই কামনাই করছিলেন, তিনি যেমন নামে রাণী, তেমনি কাজেও যেন সত্যিকার রাণী—মহারাজের যোগ্যা সহধর্মিণী হতে পারেন। তাই কথাগুলি শুনেই মাথা নিচু করে মহারাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করলেন। এই দিন থেকেই রাণী লক্ষীবাঈ হলেন মহারাজ গঙ্গাধরের প্রকৃত সচিব। এখন থেকে তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্যও অনেক বেড়ে গেল।

ঝাঁসীর রাণী হয়ে লক্ষ্মী তাঁর শৈশব-সঙ্গীদের কথা ভুলে যাননি; যদিও বিবাহের পর বিঠুরে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি—মধ্যে মধ্যে তাঁর পিতাই ঝাঁসীতে গিয়ে দেখাশোনা করতেন, দু'চার দিন থাকতেনও কন্যার কাছে। রাজবাড়ীতে তাঁর আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হতো না; মহারাজ স্বয়ং তাঁর সেবা-যত্নের উপর লক্ষ্য রাখতেন। আর এই সময় রাণী লক্ষ্মী পিতার কাছে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিঠুরের সব কথা জিজ্ঞাসা করতেন। পেশোয়া কেমন আছেন, তাঁর ছেলেদের

পড়াশোনা, খেলাধূলা, কসরত সব কেমন চলেছে, তাস্তিয়া বিঠুরে আসেন কিনা—এমনি কত কথা। তাম্বেজী যেমন জানতেন, তেমনি বলে যেতেন। পিতার কথা থেকে লক্ষ্মী শুধু এইটুকুই বুঝতেন যে, বিঠুর থেকে তিনি চলে এলেও তাঁকে কেউ ভুলে যায়নি, পেশোয়া থেকে সকলেই মনে করে রেখেছেন ; তাঁর কথা প্রায়ই সেখানে ওঠে। শুনতে শুনতে লক্ষ্মীর মুখ-চোখ আনন্দে দীপ্ত হতে থাকে ; তাঁর ইচ্ছা করে—বাবার সঙ্গে বিঠুরে গিয়ে সবার সঙ্গে দেখা করে আসেন, তাঁর সেই শৈশবের লীলাভূমির চার দিক আর একবার শৈশব-সাথীদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করে মনের বাসনাকে দমন করে মনে মনেই বলে ওঠেন—এ আমি কি ভাবছি! এতে যে আমার স্বামীর মনে ব্যথা লাগবে, লোকে যে নিন্দা করবে ; আমি যে এখন রাণী—নিজের ইচ্ছে মত সব কাজ কি করতে পারি ?

রাণী হোয়েও লক্ষ্মী পর্বোৎসবের সময় তাঁর বিঠুরের খেলার সাথীদের উদ্দেশে নানা প্রকার উপহার পাঠিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানাতেন। মহারাষ্ট্র দেশে খুব সমারোহ করে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব সম্পন্ন হয়। মারাঠাদের মধ্যে এ উৎসব যম-দ্বিতীয়া নামে পরিচিত। রাণী লক্ষ্মী ঝাঁসী থেকে নানাভাই, রাও সাহেব ও তাস্তিয়ার জন্য এই উৎসবে বস্ত্র, উত্তরীয় এবং কোন না কোন অস্ত্র উপহার পাঠাতেন—সেই সঙ্গে প্রচুর মিষ্টান্নও থাকত। অস্ত্রের মধ্যে কোন বছর তরবারি, কোন বছর বর্শা-

ফলক, ছুরিকা বা কিরিচ থাকত। বিঠুরে খেলাধূলা ও আলাপ-আলোচনার সময় সঙ্গী ভাই তিনটির সহিত রাণীর মারাঠা জাতির মুক্তি সম্বন্ধে যে-সব কথা-বার্তা হোত, এই সব অস্ত্র ছিল তাদেরই প্রতীকের মত।

বিবাহের কয়েক বছর পরে একবার পিতার মুখে লক্ষ্মী শুনলেন যে, নানা সাহেব পেশোয়ার খাস মুন্সী হয়েছেন; চিঠিপত্রের মুসাবিদা করতে তাঁর বেশ দক্ষতা আছে দেখে, পুরানো মুন্সী বার্দ্ধক্যের জন্য অবসর নিলে পেশোয়া নানা সাহেবকেই সে কাজে বাহাল করেছেন।

কথাটা শুনেই রাণী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলিষ্ঠ ও তেজস্বী ছেলেটি—যিনি সর্বদাই দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন, অতীতের স্বাধীন পেশোয়াদের শৌর্য ও বীরত্বের আদর্শ যাঁকে অনুপ্রাণিত করে তুলত, তিনি কিনা সে-সব ভুলে কেরাণীর বৃত্তি বেছে নিলেন? দুঃখে-ঘৃণায় রাণীর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে ওঠে, সেই সঙ্গে মনে পড়তে থাকে একটি একটি করে নানা সাহেবের কথাগুলি:

নানা বলতেন: জানো মুন্না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি আমাদের পূর্বপুরুষ বীর পেশোয়াদের স্বপ্নে দেখি। তাঁদের সেনাচালনা, শৌর্য, বীর্য, প্রতাপ আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি, আর মনে হয়—আমিও যেন ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে লড়াই করছি।

রাণী লক্ষ্মী নানার কথাগুলি আজও মনে করে রেখেছেন।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের কথা উঠলে নানা কেঁদে ফেলতেন ; আর্তস্বরে বলতেন—কি ভুলই করেছিলেন বালাজী রাও পেশোয়া নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে ! তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন, তা'হলে কি মারাঠা-নায়কদের মধ্যে আত্মকলহ হোত ? সেই কলহের জন্যই ত মারাঠাদের সর্বনাশ হয়ে গেল ! পানিপথের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন পেশোয়া মাধব রাও, মহাবীর মাধাজী সিন্ধিয়া ; আর সারা মারাঠা জাতির কালস্বরূপ হোয়ে এলেন আমাদের পিতাজী দ্বিতীয় বাজীরাও—শেষ পেশোয়া। কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে ; তখন আমার সহায় হবে রাও সাহেব, তান্তিয়া আর তুমি—মুনা।……তখনও লক্ষ্মী মুনা নামে পরিচিতা। কিন্তু কিশোর নানার সেই কথাগুলি তাঁর মনে কি বড় সামান্য উদ্দীপনার সঞ্চার করত ? সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নানা আজ কিনা তাঁর পিতার খাস কেরাণী !

লক্ষ্মী এর পর নানাকে এক পত্রে সুধালেন : ভাই সাহেব, বাবার মুখে শুনলাম, তুমি নাকি পেশোয়াজীর খাস মুন্সীর চাকরী নিয়েছ—খুব উৎসাহে কলম পিষছ ? তোমার সেই তলোয়ার, সাঁজোয়া, আর সব হাতিয়ার কি ভেঙে ফেলেছ, না—জেলখানায় সেগুলো কয়েদ করে রেখেছ ? এখন কি অতীতের বীর পেশোয়ারা তোমাকে স্বপ্নে দেখা দেন না ? এখন বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেরেস্তার স্বপ্ন দেখ ? সঠিক খবর জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব রইলাম।

নানা সাহেব রাণীর পত্রের উত্তরে জানালেন : তুমি যা

শুনেছ তাম্বেজীর কাছে—সবই সত্য। পিতাজীর খাস মুন্সী অসুস্থ হলে, আমাকে একখানা চিঠির মুসাবিদা করতে হয়। সেই মুসাবিদা পড়ে পিতাজী আহ্লাদে আমার পীঠ চাপড়ে বলে ওঠেন—'সাবাস নানা, খাসা মুসাবিদা করেছ, খাস মুন্সীর পাকা মাথা আর পুরানো কলম থেকেও এমন লেখা কোন দিন বেরিয়ে আসেনি। মুন্সীজী বুড়ো হয়েছেন—অবসর চাইছেন। তোমাকেই তাঁর কাজে বাহাল করা গেল। বেশ মনোযোগ দিয়ে মুসাবিদার কাজ কর, আর এ-কাজে লেগে থাকলে ইংরেজদের সঙ্গে মেলবার মিশবার ফুরসৎও পাবে। আমার ইচ্ছা, এখন থেকে তুমি ওদের মন যুগিয়ে চল।' পিতাজীর কথাগুলি শুনতে শুনতে আমার স্বপ্নের কথাগুলোও ভেবেছি বৈ কি! তবে পিতৃ-আজ্ঞা ত লঙ্ঘন করতে পারি না। কাজেই তাঁর কাজে লেগে পড়েছি খুব উৎসাহে। কলম চালাচ্ছি মনের আনন্দে। হ্যাঁ, এই পেশার মধ্যেও অতীতের কোন কোন পেশোয়াকে স্বপ্নে দেখি বৈ কি! প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন সে যুগের এক প্রকাণ্ড কলমবাজ—নাম করা কেরাণী, কলম চালাতে চালাতেই তাঁকে পরে তলোয়ার হাতে করে সেনা বাহিনী চালাতে হয়েছিল। তাঁর কানে থাকত কলম, আর কোমরে ঝুলত তলোয়ার। তারই জোরে মোগল বাদশাদের শক্তিকে বানচাল করে দিয়ে মারাঠা-শক্তিকে অজেয় করে তুলেছিলেন। তাই কলমকে তুমি যতই ঘৃণা কর না কেন, আমি কিন্তু ও বস্তুটিকে ভালোবাসি। রাও সাহেবের অবিশ্যি কলমের প্রতি

আদৌ অনুরাগ নেই। কিন্তু তুমি শুনে অবাক হবে—আমাদের বন্ধু, তোমার আর এক ভাই—তাস্তিয়া টোপীও কলমের সাধনা সুরু করেছে। আমাদের সেরেস্তাতেই আমারই অধীনে নকল-নবিসের কাজে বাহাল হয়েছে। তার কাজেও সেরেস্তা শুদ্ধ সবাই অবাক—কলমবাজীতে আমার পরেই তার স্থান। তবে ও-বেচারা নকল করতেই খুব মজবুত—মাথা খাটিয়ে মুসাবিদার ধার বড় একটা ধারে না; এখন আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হোচ্ছে যাতে তাস্তিয়াও মাথা খেলতে পারে। তবে আমাদের কথা এই বহিন, ভাই দু'টিকে কলম চালাতে দেখে যেন ঘৃণা ক'র না; মনে রেখো—কলম তলোয়া-রের চেয়ে কমতি নয় কিছুতেই, কলমই এ যুগে চালাচ্ছে তলোয়ার, দাগছে কামান।

কিন্তু নানা সাহেবের ভণিতাপূর্ণ এই পত্র পাঠ করে রাণী লক্ষ্মী প্রসন্ন হোতে পারেননি। তাঁর বরাবরই ধারণা, যারা সেরেস্তায় বসে কলম পেষে, যাদের নামের আগে আখ্যা বসে কেরাণী, তারা সাধারণ স্তরের নিরীহ প্রাণী—তাদের দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। কাজেই মনে মনে রাণী নানার প্রতি রীতি-মত ক্ষুব্ধ হলেন, এমন কি, এর পর ভাইফোঁটার সময় বিঠুরে উপহার সামগ্রীর সঙ্গে নানা ও তাস্তিয়াকে একটি করে কলম পাঠিয়ে তাঁর মনের ঝাল মেটালেন।

নানা সাহেব তখন তরুণ যুবক। সুন্দর চেহারা, অমায়িক ব্যবহার, অপূর্ব শিষ্টাচার ও নানারূপ বদান্যতায় তিনি তখন

বিঠূরের অধিবাসীবর্গ থেকে কানপুরের ইংরেজ মহলেরও পরম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। পেশোয়া সদা-সর্বদা নানার কানে মন্ত্র দেন—ফুরসৎ পেলেই কানপুরে যাবে, ইংরেজদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবে। দেখছ ত, আজ আমরা অগাধ টাকা, সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি ও শান্তির উপরে বসে আছি শুধু ইংরেজদের সঙ্গে সম্প্রীতি আছে বলেই। এ সম্প্রীতি যেন কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় না বৎস!

নানাও নীরবে সহাস্যে তাঁর কথায় সায় দেন—কোন আপত্তি তোলেন না মুখে। বরং ইংরেজদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে আনন্দিতই হন। এর জন্যে একজন পাদরীকে রাখা হয়—নানাকে তিনি ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ওদের আদব-কায়দা শেখাবেন এই উদ্দেশ্যে। এমনি সময় রাণী লক্ষ্মীর নূতন উপহার পেলেন নানা এক ভাইফোঁটার আনন্দময় উৎসব উপলক্ষে। রাণীর দেওয়া কলম দেখে নানা মনে মনে হাসলেন। তিনি বহু মানে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কলমটি তুলে নিলেন। এর পর রাণীকে লিখলেন: এবার ভাইফোঁটার উপহারে অস্ত্রের বদলে পেয়েছি কলম। কুলদেবতার কাছে প্রার্থনা করছি—যেন এর মান রক্ষা করতে পারি।

এ উত্তর পেয়ে রাণী সেদিন ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু এক দিন তাঁর ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল—সেদিন তিনি বুঝেছিলেন যে রাণীর দেওয়া কলমের মান রাখবার জন্যে কি কঠোর সাধনা

করতে হয়েছে নানা ভাইকে। এ কথা পরে যথাস্থানে বলা হবে।

এদিকে রাণী রাজকীয় যাবতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় সেরেস্তার মধ্যে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করেই মহারাজ নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু স্বামীর কাছে ভরসা ও ক্ষমতা পেয়ে রাণী এক দিন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওকে আহ্বান করে বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন: দেখুন, আমি লক্ষ্য করছি—রাজ্যের সমস্ত ভার একা আপনাকেই বহন করতে হচ্ছে; মহারাজ সর্বক্ষণই পারিষদদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ, নয় ত শিকার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আমার চোখে এগুলো বড়ই বিশ্রী লাগে। বৃদ্ধ বয়সে আপনার পক্ষে এরূপ পরিশ্রম খুবই অশোভন মনে হয়—এ যেন অত্যাচার। রাজার উচিত নয়—শুধু আমোদ-প্রমোদেই লিপ্ত থাকা। এখন থেকে নিয়মিত ভাবে তিনি স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করবেন, তাতে আপনার পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হবে।

দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। রাণীর মুখে এই সব কথা শুনে তিনি মুখে তাঁর বিবেচনার জন্য ধন্যবাদ দিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হলেন। এই তরুণী নারী রাণীর আসন অলঙ্কৃত করেই যে অন্দরমহলে রীতিমত একটি আলোড়ন তুলেছিলেন, আর তার স্রোত বহির্মহল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, এ তথ্য তাঁর অজ্ঞাত

ছিল না। মধ্যে মধ্যে শাসন ব্যাপারেও যে নানারূপ কৈফিয়ৎ ওঠে, তাঁকেও জবাব দিতে হয়—তারও মূলে যে এই মেয়েটির দু'টি চোখের সজাগ দৃষ্টি—তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন। এমনি সময় প্রত্যক্ষ ভাবে রাণীর এই নির্দেশ ক্ষমতালোভী দেওয়ানের অন্তরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করল। অথচ, রাণী এমন কৌশল করে প্রস্তাবটি তুললেন যে, প্রতিবাদ করবারও কিছু নেই।

এই ঘটনার পর যাবতীয় রাজকার্য মহারাজের অনুজ্ঞা অনুসারেই নির্বাহ হতে থাকল—এর পিছনে রইল রাজ্ঞী লক্ষ্মীর অসাধারণ বিচার ও বিবেচনা শক্তি। রাণীর বুদ্ধিকৌশলে সেরেস্তার অনেক দুর্নীতি ও অনাচার ধরা পড়ে গেল; বিষকুম্ভ পয়োমুখরূপী বহু পদস্থ কর্মচারীর অসাধুতার মুখোস খুলে পড়ল। সমস্ত রাজ্য জুড়ে উঠল একটা আলোড়ন—তার ঢেউ ইংরেজ রেসিডেন্সীতে আঘাত করে রেসিডেণ্ট এলিস সাহেবকে পর্যন্ত অবাক করে দিল।

বাহির-মহলে মহারাজের খাস অনুচর ও পারিষদবর্গের সংখ্যার কোন হিসাব ছিল না, অথচ প্রত্যহ দুই বেলা খাবার সময় আর বেতন নেবার সময় এত লোক রাজানুগ্রহের নিদর্শন নিয়ে হাজির হয় যে, তাদের সংখ্যা বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। রাজাকে জিজ্ঞাসা করে রাণী জানতে পারলেন যে, তিনি তাদের মধ্যে অনেককেই চেনেন না—তাদের ন জানেন না।

রাণী একটু গম্ভীর হোয়ে রাজাকে বললেন: এ কিন্তু ভারি

আশ্চর্যের কথা, বেশীর ভাগ সময় যারা আপনার সংস্পর্শে থাকে, মজলিসে বসে আসর জমায়, শিকারে যায়, খাওয়া-দাওয়া করে, আপনি তাদের প্রত্যেকের নামও জানেন না, ভালো করে চেনেন না পর্যন্ত—অথচ মাস মাস তারা মাইনে নিয়ে যায়, দু'বেলা রাজবাড়ীর ভোজ খায় !

এর পর রাণী ব্যবস্থা করলেন যে, রাজা নিজের চোখে দেখে তাঁর পারিষদ ও অনুচরবর্গের একটা তালিকা করুন—যারা সত্যই কাজের লোক, কোন না কোন গুণ আছে, তাদের ভরণপোষণ করা রাজার উচিত। কিন্তু যারা অকর্মা, অলস, খোসামুদে বা চাটুকার—তাদের আস্কারা দিয়ে রাজ-মজলিসে রাখলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে এবং সত্যকার কর্মী ও গুণী লোকদের প্রতি অবিচার করার জন্য রাজ্যের প্রজারা রাজার নিন্দা করবে। এই ধরণের নিন্দার কথাই রাণী শুনেছিলেন। প্রজামহলে একটা কথা রটেছে যে, রাজসভায় যাদের একটু পসার-প্রতিপত্তি আছে, তোষামোদকারীরা তাদের ধরে খুব সহজেই রাজসভায় ঢুকে পড়ে আর রাজ-সংস্পর্শে সুখে দিনপাত করে। রাজার এদিকে নজর নেই। রাজার কানে এমন কথা উঠলে তিনি হয়ত গ্রাহ্যই করতেন না, কিম্বা রটনাকারীদের প্রতিই বিরক্ত হয়ে তাদের শাস্তি দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কিন্তু রাণী সে পাত্রীই নন, খুব সাধারণ লোকের মুখেও গুরুতর কোন কথা শুনলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না—নানা ভাবে সে সম্বন্ধে তদন্ত করে সন্ধান নিয়ে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করে থাকেন।

সত্য হোলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে বিহিত করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন, মিথ্যা হলেও তেমনি রটনাকারীকে শাস্তি দিতে ছাড়েন না; এইটিই তাঁর প্রকৃতির একটা আশ্চর্য রকমের বৈশিষ্ট্য। রাজ-পার্ষদদের সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি শুনেছিলেন, সেগুলি সত্য জেনে সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিকার করে রাজাকে পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিলেন।

শুনলে আশ্চর্য হোতে হয়, রাণী অনুসন্ধান করে জানলেন যে, প্রায় আড়াই হাজার লোক রাজপ্রাসাদের বহির্মহলে রাজ-পারিষদ, সভাসদ, অনুচর ও অনুগৃহীতরূপে কালাতিপাত করছে। রাজার চাটুবাদ এবং পরচর্চ্চা ভিন্ন তাদের মধ্যে অধিকাংশের আর কোনও কাজ নেই বা কাজ করবার মত সামর্থ্য নেই। রাণীর অনুমোদনে তাঁদের মধ্য থেকে বেছে বেছে এক হাজার লোককে রাখা হলো, বাকি সকলকে রাজপ্রাসাদ ও রাজ-প্রাসাদের মোহ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু তাদের কাউকে জমি দিয়ে, কাউকে মূলধন দিয়ে, কাউকে বা শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে দেওয়া হলো। আর রাজার প্রিয়পাত্ররূপে যে হাজার লোক রাজপ্রাসাদে রইলেন, যাঁরা রাজার একান্ত অন্তরঙ্গ সহচরস্বরূপ, তাদের ছাড়া আর সকলের উপর কোন না কোন কাজের ভার দেওয়া হলো।

এই সময় মহারাজা তাঁর প্রিয়পাত্রদের লক্ষ্য করে বলেন: রাণীজী কি বলেন আমার মুখে শুনলেই তোমরা বুঝবে

পারবে, কেন এ ব্যবস্থা রাণী করেছেন। তিনি বলেন—রাত চারটের সময় আমি বিছানা ছেড়ে উঠে রাত দশটা পর্যন্ত নানা কাজে খেটে মরি—এর মধ্যে ঘুমাবার বা বিশ্রাম করবার এক নাগাড়ে দু'দণ্ড সময়ও আমি পাই না। কাজেই রাজ-প্রাসাদে আলস্যকে আমি প্রশ্রয় দেব না, তাতে লছমীজী কুপিতা হবেন!···পত্নীর কথাগুলি নিজেই ভণিতা করে বলে মহারাজ গঙ্গাধর হো-হো করে হেসে ওঠেন!

কথায় বলে—রাজবাড়ী বা রাজ-রাজড়াদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা—অন্যের পক্ষে পর্বতবিশেষ। কথাটা মিথ্যা নয়। তখনকার রাজাদের সঙ্গে সত্য সত্যই হাজার হাজার লোক মোতায়েন থেকে রাজার মনোরঞ্জন করতেন। পাঠান আমলে তোঘলকবংশীয় বাদশাহ মহম্মদ তোঘলকের পারিষদ সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশী। বাদশাহ যখন খানা খেতে বসতেন, পাঁচ হাজার পারিষদও তাঁকে পরিবেষ্টন করে সমান ভাবে রাজভোগে আপ্যায়িত হোতেন! বাদশাহের হুকুম ছিল—তাঁর খানার সঙ্গে তাঁর ইয়ার-বক্সিদের খানার এক চুল এদিক-ওদিক হবে না। কাজেই মহারাজ গঙ্গাধরের আড়াই হাজার পারিষদ পোষণ বাদশাহ মহম্মদের তুলনায় বাড়াবাড়ি হোলেও, ব্যাপারটা রটানো নয়। এ-যুগেও খেতাবওয়ালা রাজা-মহারাজাদের পারিষদ পোষণের ঘটার কথা অনেকেই শুনেছেন—চোখেও দেখেছেন।

মহারাজ গঙ্গাধর ছিলেন যেমন অমিতব্যয়ী, তেমনি বিলাসী

ও আলস্য-পরায়ণ। সাধারণ নারীদের মত তাঁর সহধর্মিণী রাজরাণী লক্ষ্মীকে নানা ভাবে পরিশ্রম করতে দেখে তিনি ব্যথাই পেতেন। প্রথম প্রথম তিনি রাণীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বিধাতা যাঁদের রাজা বা রাণী করে সংসারে পাঠিয়েছেন, তাঁরা ভাগ্যবান, কেন তাঁরা শরীরকে কষ্ট দেবেন—শুধুই সুখভোগ না করবেন? শত শত দাসদাসী ত তাঁদের পরিচর্যা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। সুতরাং রাজা-রাণীদের দৈহিক পরিশ্রম করার কোন সার্থকতাই নেই।

রাণী কিন্তু স্বামীর কথার উত্তরে যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতেন—পৃথিবীতে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, মানুষ যাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন—তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রম-সহিষ্ণু ছিলেন। শুধু মহাপুরুষরা নন—তাঁদের মহীয়সী পত্নীরাও। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবৎস, নল, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজাদের কথা মনে করুন—তাঁদের জীবনে যখন দুর্দিন ঘনিয়ে আসে, দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই দারুণ কষ্ট সহ্য করতে পেরেছিলেন। তাঁদের পত্নীদের কথাও ভাবুন, সম্পদের সময় যাঁদের সুখের সীমা ছিল না, অসময়ে কি কষ্টভোগই না করেছেন তাঁরা! তা'হলেই বুঝতে হবে শৈশব থেকেই তাঁরা ছিলেন পরিশ্রমী। এ যুগের কথাও বলি; যে জাতি যখনই অতিমাত্রায় বিলাসী হয়েছে, তখনই হয়েছে তার পতন। মুসলমানরা যখন এ দেশে প্রথম আসে আক্রমণকারীরূপে, তখন আমাদের দেশের রাজারা বিলাসী, সেনাপতিরা বিলাসী, সৈনিকরাও

আরামশীল। কিন্তু মুসলমান-নায়করা এমনি পরীশ্রমী যে, নদী পার হোচ্ছেন সাঁতার কেটে—নৌকারও পরোয়া রাখেন না; খানা খেতে বসবার তাঁদের অবসর নেই—লড়াই করতে করতেই ও-পাট সেরে নিচ্ছেন। আর এদেশের যোদ্ধাদের তখন 'বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি!' লড়াই করবে, না খাবার ব্যবস্থা আগে দেখবে, সেই তদ্বিরেই অস্থির! আবার দেখুন—মুসলমানদের নসিবের চাকাও কালে ঘুরে যায়! রাজা হয়ে বাদশাহী পেয়ে তাদের বিলাস একেবারে চরমে ওঠে—তারই অনুকরণ এখনো চলেছে। বাদশার কথা পরে, তাঁদের সেনাপতিরাও তাঞ্জামে চড়ে লড়াই করতে যান—সঙ্গে বাঈজী! বাপুজীর কাছে আমি গল্প শুনিছি মহারাজ, ভারি মজার গল্প সে। পেশোয়া বাজীরাওয়ের তখন ভারি নামডাক; তিনি যেন জয়মন্ত্রে দীক্ষিত হোয়েই তলোয়ার ধরেছিলেন। খুব বড় রকমের একটা যুদ্ধ চলেছে দিল্লীর বাদশার সঙ্গে এই পেশোয়ার। শেষ পর্যন্ত বাদশাহী পলটন ঘেরা পড়ে ধ্বংস হবার মুখে সন্ধিপ্রার্থী হলেন পেশোয়ার কাছে। পেশোয়া জানালেন, তা'হলে কথাবার্তা চালাবার জন্যে সেনাপতি সাহেব নিজে আসুন পেশোয়ার শিবিরে। তখন বাদশাহের সেনাপতি এক জন মনসবদারকে নিয়ে পেশোয়ার সেনা-শিবিরে এলেন। কিন্তু তাঁদের আসবার ঘটা সাজ-পোষাকের বাহার দেখে পেশোয়ার দলের লোক সব অবাক হোয়ে চেয়ে থাকে। তাঞ্জামে চেপে দুই বীরপুরুষ এসেছেন সন্ধি ভিক্ষা করতে—কিন্তু আড়ম্বর দেখে মনে হলো যে, সাদি

করতেই লোকে এমনি জাঁক-জমক করেই আসে। যেমন জমকালো তাঞ্জাম, তেমনি মণিমুক্তা-খচিত পোষাক তুই সেনা-নায়কের। সেনাদলের ভিতর দিয়ে তাঞ্জাম চলেছে। সেনাশ্রেণীর পরে একটা ফাঁকা জায়গা, আশে-পাশে তু'-চারটে তাঁবু দেখা যাচ্ছে, লোক-জন কেউ নেই।

সেনাপতি সাহেব তাঞ্জাম থেকে পথপ্রদর্শক মারাঠা সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পেশোয়া সাহেব কোথায়? তাঁর তাঁবু কোন্ দিকে ?

সৈনিক জানাল ঃ তাঁর কাছেই ত নিয়ে চলেছি জনাবকে। তিনি এইখানেই আছেন।

সেনাপতি সাহেব ও তাঁর সহকারী চেয়ে চেয়ে দেখেন— খুব সাধারণ তাঁবু ছাড়া সেদিকে দেখবার মত কিছু নেই। তাঁরা ভেবেছেন, বাদশাহ-নামদারের মত কিম্বা তার চেয়েও জমকালো তাঁবুর মধ্যে নিশ্চয়ই দিগ্বীজয়ী পেশোয়া দরবার করে তাঁদের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু তার ত কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না! হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ল—খানিক দূরে একটা গাছের তলায় একটা তেজী ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে; ঘোড়াটা দেখতে খাসা হোলেও তার সাজ-সজ্জায় কিন্তু কোন জলুস নেই। আর সেই ঘোড়াটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘাকৃতি এক মারাঠা সৈনিক থলি থেকে মুঠি-মুঠি চানা বার করে নিজের মুখে ফেলছে, আবার এক-এক মুঠি ঘোড়ার মুখেও ধরছে। তার কোমরে বাঁধা

চামড়ার খাপে লম্বা তলোয়ারখানা ঝুলছে—মাথায় কোন আবরণ নেই।

আশ্চর্য যে, এত বড় দু'টি মানী লোককে তাঞ্জামে দেখেও লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই—নির্বিকার ভাবেই চানা চর্বন করছেন সাথী ঘোড়াটির সঙ্গে! পথপ্রদর্শক সৈনিকটি তাঁর সামনে এসেই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল, আর তাকে দেখতে পেলেন না তাঞ্জাম-আরোহী দুই জঙ্গী পুরুষ। অগত্যা সেই চানাখোর পুরুষটিকেই সুধালেন: ওহে বাপু, তোমাদের পেশোয়া সাহেবের তাঁবু কোন্ দিকে?

হাতের চানাগুলি নির্বিকার ভাবে মুখের মধ্যে ফেলে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তাঞ্জামওয়ালাদের প্যানে। তাঁরা পুনরায় বললেন: আমাদের সঙ্গের লোকটিকে দেখতে পাচ্ছি না—পেশোয়া সাহেবের কাছে তুমি যদি নিয়ে যাও···

লোকটি এই সময় আস্তে আস্তে পাশের গাছটির ডালের উপর থেকে তাঁর দীর্ঘ শিরোস্ত্রাণটি তুলে নিজের মাথায় পরতে পরতে বললেন: আর যেতে হবে না—আপনাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করছিলাম। আর এই ফাঁকে দিনের খাওয়াটাও সেরে নিলাম।

তাঞ্জামে বসে চোখগুলো কপালের দিকে তুলে দিল্লীর বাদশাহের মহামান্য সিপাহশালার ও তাঁর সহকারী মনসবদার সাহেব লোকটীকে এতক্ষণ দেখছিলেন। মাথায় শিরোস্ত্রাণ এঁটে শাঁখের শব্দের মত গম্ভীর আওয়াজ তুলে কথাগুলি যেই তিনি

বললেন,তার স্বর আর চোখের দু'টো তারার অপূর্ব দীপ্তি তাঁদের চোখগুলোকে এমন অভিভূত করল যে, এর পর আর বুঝতে বাকি রইল না—কোথায় তাঁরা এসেছেন। তখনি তাড়াতাড়ি তাঞ্জাম থেকে নেমে মাটিতে মাথা নুইয়ে কুর্ণিশ করতে করতে বললেন: আমরা হুজুরকে চিনতে পারিনি, গোস্তাকী আমাদের মাপ করা হোক! মৃদু হেসে পেশোয়া বাজীরাও বললেন: না, না, আপনারা কুণ্ঠিত হোচ্ছেন কেন, গোস্তাকী ত আপনারা করেননি! মহামান্য বাদশাহের সিপাহশালার বলেই ত তাঞ্জামে চড়ে আপনারা লড়াই করতে আসেন, আর আমরা হচ্ছি হাবিলদার বর্গাদার—পাওদলে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে হাতিয়ার চালানোই আমাদের কাজ! যার যেমন অভ্যাস, এতে আর কসুর কি বলুন?

এর পরই সেখানে কয়েকখানি বেতের মোড়া এসে পড়ল। পেশোয়া অভ্যাগতদের সাদরে সেই বেত্রাসনে বসিয়ে বললেন: এই গাছতলাতেই আমদের বৈঠক বসুক, আমার বন্ধুরাও আসছেন।

এই পর্যন্ত বলে স্বামীর দিকে চেয়ে রাণী লক্ষ্মী সহাস্যে সুধালেন: বলুন ত মহারাজ, কেমন লাগল গল্পটি?

মহারাজ জানালেন: তোফা! এই পেশোয়াজীর সম্বন্ধে এমনি অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য উপাখ্যান আছে। ইনিই ত বুন্দেলখণ্ডকে রক্ষা করে এ রাজ্যেরও অভিভাবক হয়েছিলেন।

সত্যই, মহাত্মা শিবাজীর পর এত বড় মানুষ মারাঠাদের মধ্যে আর জন্মাননি।

রাণী হাসতে হাসতে বললেন ঃ ত'হলে বুঝুন মহারাজ, ঐ বিখ্যাত মানুষটি রাজা-রাজড়াদের রাজা হয়েও মিথ্যে ভড়ংএ ভোঁলেননি—পরিশ্রম করতেও কুণ্ঠিত হননি।

মহারাজ গঙ্গাধর বুঝলেন যে, রাণী তাঁর নিজের কথাটি ভোলেননি, তাঁর কথাই যে অকাট্য, মহারাজকে দিয়েই সেটা প্রতিপন্ন করলেন।

রাণী লক্ষ্মী এই ভাবে স্বামীর অনেক ভুল-চুক নানা রকম গল্প বলে এবং কখনো বা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সেগুলি সংশোধনের উপায় করে দেন। ফলে পত্নীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে মহারাজ গঙ্গাধর সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হন। ক্রমে ক্রমে রাণীর প্রতি তাঁর আস্থা ও নির্ভরতা এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে, অন্দর-মহলের অনেক বিধিনিষেধ তিনি তুলে দিয়ে অন্তঃপুরিকাদের স্বাধীনতার পথও খুলে দেন।

মহারাজ গঙ্গাধরের একটি প্রধান সখ ছিল—শিকার। পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে প্রায়ই তিনি শিকার করতে বেরুতেন এবং মহারাজের এই শিকারে যাওয়ার ব্যাপারটি কোন বিরোধীশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার মতই আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে রাজধানীতে চাঞ্চল্যের শিহরণ তুলত, আর অজস্র টাকারও শ্রাদ্ধ হোত এই বিলাস-উল্লাসে। শিকারে বেরিয়ে সত্ত-সত্তই যে মহারাজ সদলবলে ফিরতেন তা নয়—দিনের পর দিন, সপ্তাহের

পর সপ্তাহ ধরে চলত এই একটানা শিকার-পর্ব। রাণী লক্ষ্মী একটি একটি করে রাজার অপব্যয়মূলক সখগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন, এখন এই শিকার-পর্বটির দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। অনেক দিন ধরেই তিনি লক্ষ্য করছিলেন, রাজার এই সখটি নিছক ব্যক্তিগত এবং সেই সঙ্গে তাঁর অনুগত স্তাবকদের স্বার্থ-প্রণোদিত বিরাম ছাড়া আর কিছু নয়; এ ব্যাপারে প্রজাদের কোন ইষ্ট নেই, বরং মাঝে মাঝে রাজ-দরবার ছেড়ে রাজধানীর বাইরে সপার্শ্বদ মহারাজার এ ভাবে অবস্থিতির জন্য রাজকার্যেরই অসুবিধা হয়—অনেক প্রয়োজনীয় কাজ মহারাজের প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে এবং শিকারের লোভে অনেক বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীও কার্যভার সহকারীদের উপরে চাপিয়ে এই শিকার-পর্বে যোগ দিয়ে থাকেন।

রাণী লক্ষ্মী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ সব লক্ষ্য করতেন। সব জেনেও তাঁকে নীরব থাকতে হোত; কারণ, সহজাত বুদ্ধিতেই তিনি মহারাজের প্রকৃতি ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন—শিকার-পর্বকে তিনি রাজধর্ম ভেবেই মহোৎসাহে এ কার্যে ব্রতী থাকেন; রাণীর আপত্তি এখানে অনর্থ উপস্থিত করবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাণী যখন রাজার অনেক অপব্যয় বন্ধ করে রাজার চোখ খুলে দিলেন, রাণীর পরামর্শে রাজ-সেরেস্তারও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল, রাজকার্যের মধ্যে রীতিমত একটা শৃঙ্খলা এসে গেল, রাণীর সর্বতোমুখী প্রতিভায় মহারাজ অভিভূত হলেন, সেই সময় এক দিন সময় বুঝে রাণী লক্ষ্মী শিকারোৎসব সম্পর্কে

এই বিপুল অপব্যয়টি বন্ধ করতে তাঁর বুদ্ধির অস্ত্রটি উদ্যত করলেন।

মহারাজ গঙ্গাধর রাও শিকারে বেরুবেন—কয় দিন ধরেই তার আয়োজন চলেছে। রাজপুরীর সর্বত্রই 'সাজ সাজ' রবে সাড়া পড়ে গেছে। সেরেস্তার পদস্থ কর্মচারীরা রাজার কাছে একে একে আর্জী পাঠিয়েছেন—আগামী শিকারে তাঁরাও যাতে মহারাজের অনুগমনের অনুমতি লাভ করে ধন্য হন। রাজকর্মচারীদের মধ্যে কা'দের ভাগ্য এবার প্রসন্ন হবে, এখনো তা অজ্ঞাত, যেহেতু মহারাজ তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করেননি।

এমন সময় রাণী লক্ষ্মী এলেন মহারাজ গঙ্গাধরের খাস-কামরায়। রাণী জেনেছিলেন যে, রাজকর্মচারীদের ভিতর থেকে শিকার-সঙ্গী নির্বাচন করতে মহারাজ এবার বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কারণ, রাণীর ব্যবস্থায় এমন ভাবে কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছে যে, সেরেস্তা থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এক পাল পদস্থ কর্মচারীর একসঙ্গে কোথাও যাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়—তা'হলে সেরেস্তা অচল হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় দেওয়ান লক্ষ্মণরাও কিম্বা রাণী লক্ষ্মীর সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন।

রাণীর প্রতি রাজার এতখানি আস্থার এক রহস্যময় কারণও আছে। মহারাজার পার্ষদ বলে পরিচিত আড়াই হাজার লোকের মধ্যে তিনি যখন পঞ্চাশ জনকে মাত্র তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গরূপে চিহ্নিত করেন, বাকি সকলে পারিষদ হোলেও —তাদের অনেকের নামও তিনি জ্ঞাত নন বলে জানিয়েছিলেন,

তখনই রাণী লক্ষ্মী অবাক হয়ে মন্তব্য করেন—"এ কিন্তু খুবই আশ্চর্যের কথা মহারাজ, এতগুলি লোক আপনার পার্ষদ, আপনাকে ঘিরে বসে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে-ফেরে, অথচ আপনি তাদের নামও জানেন না! আমি কিন্তু এক বার যাকে দেখি, আর আমাদের কারও সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে বুঝি, তার নাম কখনো ভুলি না।"

মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর মুখে কথাটি শুনে ভেবেছিলেন, এটা তিনি বাড়িয়ে বলেছেন। এত লোকের নাম কেউ কখনো মনে রাখতে পারে না।

দেওয়ান লক্ষ্মণরাও পর্যন্ত রাণীর কথায় চমকে উঠেছিলেন। তিনি রাণীর অজ্ঞাতে রাজাকে বলেন—'মেয়েদের সব কথায় কান দিতে নেই, ওঁরা সব বিষয়েই মাত্রা বাড়িয়ে বলেন। আমার নিজের সেরেস্তায় যে সব কর্মচারী কাজ করে, আমিই তাঁদের সকলের নাম জানি না। বেশ ত, উনি যখন ঠিক করেছেন—হাজার লোককে বেছে বেছে রাখবেন—তারা আপনার কাজও করবে, আর সেরেস্তায়ও বাহাল থাকবে; এখন তাদের নামগুলো রাণী যদি মনে করে রাখতে পারেন, তা'হলে বুঝব—আপনাকে এ ভাবে কটাক্ষ করবার অধিকার তাঁর আছে।'

মহারাজ গঙ্গাধর দেওয়ানের কথায় উৎফুল্ল হয়ে বলেন—ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। কিছু দিন যাক, এর পর কথাটা তোলা যাবে

মাস কয়েক পরেই মহারাজার খাস-কামরায় তাঁর সামনে সেদিন দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এবং রাণী লক্ষ্মী উভয়েই উপস্থিত ; গঙ্গাধর রাও ভাবলেন, এই ঠিক সময় এসেছে রাণার সঙ্গে স্মৃতিশক্তি নিয়ে একটা বোঝাপড়া করবার।

ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পর্কেই সেদিন আলোচনা চলেছে। রাজ্য-সংক্রান্ত কাজকর্মের আলোচনার সময় এখন মহারাজার খাস-কামরায় রাণী লক্ষ্মীকেও আহ্বান করা হয়। অবশ্য, দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এ ব্যবস্থায় প্রথমে সম্মত হননি। রাজনীতির ব্যাপারে নারীবুদ্ধির সহায়তা নেওয়া—বিচক্ষণ মহারাজ এবং তাঁর মত নীতিবিদ্ দেওয়ানের পক্ষে গৌরবের কথা নয়—এই যুক্তিতে প্রতিবাদ করেছিলেন। তবে মহারাজের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে সম্মতি দিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যখনই রাজনীতি সম্পর্কে গুরুতর কোন আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে, সেই আলোচনা সূত্রে রাজ্যের তরুণী রাণী লক্ষ্মীর বলিষ্ঠ মতবাদ ঝুনো রাজনীতিক লক্ষ্মণরাও কোন দিনই খণ্ডন করতে সমর্থ হননি।

সেদিন আলোচনার প্রথমেই মহারাজ বললেন : দেওয়ানজী তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছিলেন রাণী। যে দেড় হাজার লোককে প্রাসাদ থেকে সরিয়ে বাহিরের কাজে লাগানো হয়েছে, তাদের কোন নালিশ নেই—ভালো ভাবেই দিন গুজরান করছে তারা।

লক্ষ্মী বললেন : তাদের নালিশ করবার পথ ত আমি খুলে

রাখিনি মহারাজ। তারা এখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথই চিনেছে। এখানে পড়ে থাকলেই বরং তাদের দিনে দিনে পতন হোত।

মহারাজ পুনরায় বললেন: তার পর যে হাজার লোক আমাদের কাজ করছে, তুমিই যাদের সুপারিশ করেছিলে—তাতে আমাদের সুবিধাই হয়েছে, এই ক'মাসে ব্যয়-সঙ্কোচও কম হয়নি। অবিশ্যি, বেচারাদের ঘাড়ে কাজের চাপটা বেশীই পড়েছে।

লক্ষ্মী সহসা কিছু গম্ভীর হয়ে বললেন: মনের জোর থাকলে কাজের চাপের জন্যে কাজের মানুষ কখনো অসন্তুষ্ট হতে পারে না, বরং সেই চাপটা নামাবার দিকেই তার মন পড়ে থাকে, আর তাতে আনন্দই পায়। এই যে আমাদের দেওয়ানজী বৃদ্ধ হয়েছেন, তবুও কাজকে ভয় পান না, কাজও তাই ওঁর কাছেই এগিয়ে আসে।

দেওয়ানজী বললেন: এ কথা সত্য, রাণী হিসাব করেই কথা বলেন। তবে কাজের মর্ম বোঝে তারাই—যারা কাজের সঙ্গেই বরাবর সংশ্লিষ্ট। সেরেস্তার কাজ ত আর রাণীর পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়, কাজেই ওঁর হিসেবে যদি ভুল হয়, তাতে দোষ দেওয়া যায় না।

রাণী বললেন: কিন্তু আমার হিসাবের ভুল ত বড় একটা হয় না দেওয়ান সাহেব!

দেওয়ান বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন: সেরেস্তার লোকেই ভুলটি দেখিয়েছেন কি না! রাণী যাঁদের

বাহাল করেছিলেন সেরেস্তায়, তাঁদের মধ্য থেকে এক জন এই নালিশ করেছে !

রাণী ঃ ভারি আশ্চর্য ত ! আমরা যাঁদের এখান থেকে সরিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তাঁরা কেউ নালিশ করলেন না—অথচ, সেরেস্তায় বাঁধা মাইনের কাজ পেয়ে স্বচ্ছন্দে সচ্ছল ভাবে যাঁরা জীবন-যাত্রার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেই নালিশ এসেছে ? কে নালিশ করেছেন শুনি ?

দেওয়ানজী একবার মহারাজার মুখের দিকে তাকালেন, তার মধ্যে যেন একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহেছে। মহারাজা তখন বললেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকটার নাম বলুন দেওয়ানজী—রাণী ত সবার নাম জানেন, বললেই উনি চিনতে পারবেন।

অভিযোগকারীর নামটি ভুলে গেছেন, এমনি একটা ভঙ্গি করে দেওয়ান লক্ষ্মণরাও আমতা আমতা করে বললেন ঃ সে লোকটি আবার মহারাজের খুবই প্রিয়পাত্র, তার ইচ্ছা, খানিকটা সময় মহারাজের মজলিসে বসে ওঁকে আনন্দ দেয় ; কিন্তু বেচারীর ঘাড়ে সেরেস্তার কাজের চাপ এত বেশী যে, ঘাড়টি তোলবারও ফুরসৎ পায় না—শিকার-মহল দপ্তরের কাজ কি না....

মহারাজ গঙ্গাধর বললেন ঃ আহা—তার নামটা বলুন ?

তেমনি আমতা আমতা করে দেওয়ানজী বললেন ঃ নামটাই মনে পড়ছে না...হাজারো লোক সেরেস্তায় কাজ করে, কাঁহাতক

প্রত্যেকের নাম মনে রাখি। আমার সেরেস্তায় সে লোকের দরখাস্ত আছে—নামটা মনে পড়েও পড়ছে না যে।

রাণী বললেন: আপনার সেরেস্তায় শিকার-মহলে পাঁচ জন লোক ত কাজ করে। তাদের কারুরই নাম মনে পড়ছে না?

দেওয়ান জবাব দিলেন: এক জনের নাম মনে আছে—সখারাম ভাস্কর।

রাণী বলেন: বাকি চার জনের নাম হচ্ছে—তুকাজী, ত্রম্বকরাও, সদাশিব আর নৃপৎরাম।

দেওয়ান এই সময় সহর্ষে বলে উঠলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এই সদাশিবের কথাই বলছিলাম।

গঙ্গাধর রাও অবাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ রাণীর দিকে চেয়ে থেকে তার পর সুধালেন: আশ্চর্য, তুমি ওদের নাম সব কণ্ঠস্থ করে রেখেছ নাকি?

রাণী সহাস্যে বললেন: মহাভারতে গান্ধারীর একশ' ছেলে ছিল শুনেছি; তিনি কি তাদের নাম ভুলে যেতেন বলতে চান মহারাজ? যাঁরা আমাদের সংস্পর্শে থেকে কাজ করেন—সবাই ছেলের মত, তাদের নাম মনে থাকবে না? আপনি দয়া করে যেদিন থেকে সেরেস্তার সঙ্গে আমার সংযোগ করে দেন, সেই দিন থেকে সেরেস্তার সবাইকে আমি জেনেছি, চিনেছি, প্রত্যেকের নাম মনে করে রেখেছি।*

* রাণীর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও প্রশংসা

মহারাজ গঙ্গাধর এ কথার পর আর একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ দেওয়ানের দিকে তাকালেন। দেওয়ান লক্ষ্মণরাও সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন।

রাণী এর পর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সদাশিবের নালিশটা সম্বন্ধেই এখন তা'হলে বিচার হোক ; তাকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করুন।

হো-হো করে হেসে উঠলেন মহারাজ গঙ্গাধর ; হাসির পর মৃদু স্বরে বললেন ঃ আসলে ওটা বাজে কথা ; রাণীর স্মৃতিশক্তিটার পরীক্ষা করা গেল। রাণীরই জিৎ হলো। যাক্ ও কথা, এখন কাজের কথা হোক। বল ত, সেরেস্তা থেকে দিন কয়েকের জন্যে কোন্ কোন্ লোককে আমার শিকার-সঙ্গী করা যায় ? তুমি ত প্রত্যেকেরই নাম আর এলেম জানো, কাজেই তুমি ঠিক বলতে পারবে।

রাণী নিবিড় ভাবে মহারাজের প্রসন্ন মুখখানির উপর তাঁর টানা টানা দু'টি আয়ত চোখের অপূর্ব দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন :

করে লিখেছেন যে, রাণীর আমলেও ঝাঁসী-সেরেস্তার কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত শত। রাণী ব্যক্তিগতভাবে এদের প্রত্যেককে চিনতেন এবং নামের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন। পূজা-অর্চনার পর প্রত্যহ দরবারের পূর্বে প্রাসাদের এক বিশেষ স্থানে কর্মচারীরা রাণীকে দর্শন করতে আসতেন। কেউ অনুপস্থিত থাকলে রাণী তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। অসুস্থ শুনলে তৎক্ষণাৎ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন।

মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে আমি যে কথা বলব, সে কি মনঃপূত হবে?

ঈষৎ হেসে মহারাজা বললেন: বিলক্ষণ! তোমার কোন কথাই ত বাজে বা খাপছাড়া নয়; যা বলো, তার পিছনে থাকে জোরালো যুক্তি—তবে মনে লাগবে না কেন?

রাণী এবার গম্ভীর ভাবে বললেন: তা'হলে এবারকার শিকারে সেরেস্তার কোন লোককেই সঙ্গে নেবেন না।

মহারাজ গঙ্গাধর চমকে উঠে বললেন: সে কি! তুমি জানো যে, সেরেস্তায় আমার অনেকগুলি অন্তরঙ্গ লোক কাজ করে; তারা বরাবরই প্রত্যেক মজলিসে হাজির থাকে। আমি যখন যেখানে যাই—ছায়ার মত আমার অনুগমন করতে তারা অভ্যস্ত। এখন তুমি তাদের নিরাশ করতে চাও? তারা কি মনে করবে বল ত?

রাণী বললেন: আপনি যদি সেরেস্তা থেকে বেছে-বেছে আপনার অন্তরঙ্গদের নিয়ে আমোদ করতে যান, আপনার সেরেস্তা কি করে চলবে? তারপর—কতকগুলি লোকের উপর এ রকম পক্ষপাতিতার জন্যে সেরেস্তার আর সকলে কি মনে করবে, সেটাও আপনার ভাবা উচিত। এই জন্যেই বলেছি, এবার শিকারে সেরেস্তা থেকে কেউ আপনার সঙ্গে যাবে না।

একটু বিরক্ত হয়েই মহারাজ সুধালেন: তা'হলে কি তুমি বলতে চাও, কতকগুলো সিপাহী, শিকারী আর খিতমতদার

নিয়েই এবার আমি শিকারে বেরুবে? অবসর সময়ে এরাই আমার মজলিস জাঁকিয়ে বসবে—এ কি সম্ভব?

রাণী জবাব দিলেন: না, না, তা কি আমি বলতে পারি মহারাজ? একে জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলে থাকা, সেখানে অন্তত গল্প-গুজবের ব্যবস্থা না থাকলে টেঁকবেন কি করে? তাই আমি ব্যবস্থা করেছি, এবার আমিই আপনার সঙ্গে যাব, আর আমার সঙ্গিনীরাও আমার সঙ্গে থাকবে।

রাণী যে কথায় কথায় হঠাৎ, এই প্রস্তাব করে বসবেন মহারাজ তা কল্পনাও করেননি। শুনেই দুই চোখ বিস্ফারিত করে বলে উঠলেন: বল কি? তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, আর তোমার সঙ্গিনীরাও—

রাণী তাড়াতাড়ি বললেন: তারা প্রত্যেকেই নানা রকম কলাবিদ্যা জানে, শিকারের সময় তাদের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা দেখলে আপনার শিকারী কিম্বা সিপাহীরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যাবে। এরা গেলে সিপাহী-শান্ত্রীও আপনাকে নিতে হবে না—এরাই সে কাজ করবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে মহারাজ গঙ্গাধর বললেন: তোমার মতলবটি এখন বুঝিছি—তুমি দেখছি সাধারণ মেয়ে নও।

রাণীও সহাস্যে উত্তর দিলেন: আমি যে সাধারণ মেয়ে নই, এ কথা বাপুজীই বলে গেছেন। কিন্তু আমার মতলব সম্বন্ধে মহারাজ কি বুঝেছেন জানতে পারি?

মহারাজ গঙ্গাধর বললেন : সেরেস্তায় যারা আমার প্রিয়-পাত্র, তুমি তাদের সেরেস্তায় আটকে রাখতে চাও—যাতে তারা আমার সংস্পর্শে আসতে না পারে।

মুখখানি হঠাৎ কঠিন করে রাণী বললেন : মহারাজ যা বললেন, ঠিক তাই নয়। তবে সেরেস্তার কাজ ফেলে তারা মহারাজের প্রিয়পাত্র হয়ে আমোদ করতে যায়—এ আমার ইচ্ছা নয়। সেরেস্তার কাজ বজায় রেখে তারা মহারাজের সঙ্গে মজলিস করলেও আমার কোন আপত্তি নেই। এক সন্তানের প্রতি বাপ-মা'র পক্ষপাতিতা দেখলে আর সব সন্তানের মন যেমন ভেঙে যায়, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। এখানে প্রভুর পক্ষপাতিতা অনর্থ ঘটায়। এ ছাড়াও আমার আর এক মতলব আছে মহারাজ!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহারাজ রাণীর পানে তাকাতেই তিনি বললেন : আমাদের রাজ্যের পরেই কাল্পীর বিরাট জঙ্গল। ওর নামই শুনিছি, কখনো দেখা হয়নি। এবারকার শিকার খেলা হোক্ কাল্পীর জঙ্গলে।

মহারাজ বিস্ময়ের সুরে বললেন : সে যে অনেক দূর ; তাছাড়া কাল্পী ঝাঁসীর এলাকার বাইরে।

রাণী বললেন : কিন্তু কাল্পীর বেওয়ারিশ জঙ্গলকে ঝাঁসীর এলাকার মধ্যে আনতেই হবে। আপনার পূর্বপুরুষ কাল্পীতেই নানা পণ্ডিতকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজকে রক্ষা করেছিলেন। সেদিক দিয়ে ঐ জঙ্গলের উপর ঝাঁসীর দাবী আছে। শিকারকে

উপলক্ষ করে আমরা ঐ জঙ্গলকেই ঝাঁসীর সীমান্ত অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি।

মহারাজ বুঝলেন যে, ভবিষ্যৎ ভেবেই দূরদর্শিনী রাণী এই প্রস্তাব তুলেছেন—শিকারের মধ্যেও রাজ্যের স্বার্থ তিনি এই ভাবে উদ্ধার করতে চান। যে জঙ্গল বহু কাল ধরে অনধিকৃত হয়ে আছে, রাণী তাকে রাজ্যাঙ্গে মিশিয়ে ঝাঁসী রাজ্যকে সুরক্ষিত করতে চান। আশ্চর্য, এ চিন্তা কোন দিন তাঁর মনে ওঠেনি, তাঁর সচিবগণ এবং বিচক্ষণ দেওয়ান সাহেবও কাল্পীর সম্বন্ধে এ কথা চিন্তাও করেননি।

রাণীর অনেক দিনের প্রচ্ছন্ন আগ্রহ এই সূত্রে চরিতার্থ হলো। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে রাজান্তঃপুরের যে সব তরুণীকে মারাঠা বীরাঙ্গনার যোগ্য শিক্ষা দিয়েছেন, এই শিকার উপলক্ষে কাল্পীর জঙ্গলে তার পরীক্ষার অবকাশ ঘটল।

৭

সকলেই শুনল যে, মহারাজ মত-পরিবর্ত্তন করেছেন। কাল্পীর জঙ্গল দেখবার জন্য রাণী আগ্রহ প্রকাশ করায়, মহারাজ এবার দূরবর্তী কাল্পী ভ্রমণে চলেছেন, সঙ্গে থাকবেন মহারাণী এবং তাঁর সহচরীরা। রাজ-পারিষদবর্গ এবার পরিত্যক্ত হয়েছেন।

স্বামীর সঙ্গে রাজ্যসীমা পরিদর্শন এবং কাল্পীর মহা বনটির সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করাই রাণীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। রাণীর

সহচরীরা মারাঠা বীরাঙ্গনাদের মত সজ্জিত হয়ে রাণীর সঙ্গে চললেন। তাঁদের প্রত্যেককে পশুহনন ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত নানা রকম অস্ত্র দিলেন রাণী—ধনুর্বাণ, বন্দুক, বর্শা, তরবারি, কোমরে ভোজালী। বাড়তি সিপাহীদের পরিবর্তে মহারাজার দেহরক্ষীদের সঙ্গে বেতনভোগী শিকারীরাই এবার আগে-পিছনে চলল।

এ পর্যন্ত কাছাকাছি অরণ্যগুলিতেই মহারাজ শিকার করেছেন; তাঁর শিকারের জন্য অনেকগুলি জঙ্গল অনেক দিন ধরেই বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত হয়ে আছে। বহু লোক সেই সব জঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণ করে—এই ব্যাপারেও প্রচুর অর্থের অপব্যয় হতে থাকে। কিন্তু এবার রাণীর প্ররোচনায় মহারাজ চলেছেন রাজধানী থেকে বহু দূরে অরক্ষিত ও অনধিকৃত এক দুর্গম মহাজঙ্গলে শিকার করতে—সঙ্গে মহারাণী এবং তাঁর প্রিয় সহচরীবৃন্দ। মহারাজের কতিপয় বিশ্বস্ত খিতমতদার ভিন্ন অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের কেউই এই শিকার-যাত্রায় যোগদানের সুযোগ পাননি।

দীর্ঘ পথ পর্যটনে পরিশ্রান্ত হলেও মহারাজ প্রচুর আনন্দ পেলেন। তথাপি তাঁকে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র মিছিলটিকে নিরস্ত করে বিশ্রাম নিতে হলো, কিন্তু রাণীর দেহে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। তাঁর সহচরীদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়ত অল্প-স্বল্প শ্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু রাণী অক্লান্ত ভাবেই এগিয়ে চলেছেন—তাঁর ইচ্ছা, একেবারে কাল্পীর জঙ্গলে গিয়েই বিশ্রাম

করবেন। কিন্তু মহারাজকে বিশ্রামার্থী দেখেই তাঁকে মত পরিবর্ত্তন করতে হলো।

এই মিছিলে এ পর্যন্ত রাজা ও রাণী সুসজ্জিত রাজহস্তীর হাওদায় ছিলেন। তবে রাণীর ইচ্ছা ছিল, সহচরীদের সঙ্গে বরাবর ঘোড়ার পীঠে চড়েই কাল্পীর জঙ্গলে যাবেন। কিন্তু মহারাজ গঙ্গাধর আপত্তি করে বললেন : সেটা ভালো দেখাবে না। তুমি আমার সঙ্গে বরং হাতীতেই চলো, তোমার সহচরীরা শিবিকায় যাবে।

স্বামীর আপত্তির কারণ বুঝতে পেরে রাণী আর আপত্তি করেননি ; তবে তিনিই এই মর্মে একটা পাল্টা প্রস্তাব তুলেছিলেন : রাজধানীর পথটুকু না হয় এই ভাবেই যাওয়া যাবে ; কিন্তু তার পর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছালেই আমরা ঘোড়ায় চড়ে কাল্পী যাবো—আমাদের ঘোড়াগুলো মিছিলের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। ফেরবার সময়ও এই ভাবে রাজধানীতে আসা হবে।

মহারাজ এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তার ফলে রাণীকে মহারাজের সঙ্গে হাতীর পীঠে হাওদায় আরোহণ করতে হয়। তাঁর সঙ্গিনীরা শিবিকায় ওঠেন। সঙ্গে চলে তাঁদের সুসজ্জিত তেজীয়ান ঘোড়াগুলি।

হাওদায় উপবিষ্ট মহারাজ রাণীকে সুধালেন : হাতীর পীঠে থেকে নেমে এর পর ঘোড়ার পীঠে উঠতে তোমার কষ্ট হবে না ?

মৃদু হেসে রাণী বললেন : কষ্ট! বরং হাতীর পীঠে এ ভাবে

যেতেই আমার কষ্ট হচ্ছে। অলস আর বিলাসী লোকের পক্ষেই হাতীর পীঠে চড়া সাজে।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন : এ কথা বলবার অর্থ ?

রাণী বললেন : হাতীকে চালায় মাহুত, হাতীর মাথায় বসে বসে তার মাথাও ঢিমে হয়ে যায়—হাতীকে এরা ছোটাতে ভয় পায়। কিন্তু ঘোড়াকে চালায় যে তার পীঠে বসে—ঘোড়া চায় সেই সওয়ার তাকে যত খুসি জোরে চালিয়ে এগিয়ে যাক। একবার বিঠুরে এই হাতী চালানো নিয়ে ভারি এক মজার কাণ্ড হয়েছিল মহারাজ !

মহারাজ বললেন : কি রকম কাণ্ড—শুনি ?

রাণী বলতে লাগলেন : সেখানে ঘোড়ায় চড়ে অনেক সওয়ারকে পিছিয়ে দিয়ে তাক লাগাতাম, সে কথা শুনেছেন। আজ হাতীর কথা মনে পড়ে গেল হাতীর পীঠে উঠে ; বলি সেই গল্প শুনুন। পেশোয়াজীর ত অনেকগুলো হাতী, তার মধ্যে 'পাহাড়' নামে হাতীটা ছিল সবার সেরা—পাহাড় ত পাহাড় ! এক দিন আমরা সেই হাতীতে উঠে দিলাম পাড়ি। যে পথে ঘোড়ায় চড়ে বিজলীর মত এগিয়ে যাই, অ-মা ! হাতী দেখি, ব্যাঙের মত থপাস্-থপাস্ করে চলেছে। সঙ্গে ছিলেন নানা ভাই ; বললাম—'এই তোমার সেরা হাতী, আদর করে এর নাম রাখা হয়েছে পাহাড় ?' মাহুতকে বললাম—'আমার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস, হাতীর হাওদা ভালো লাগছে না, পা দু'টো নিস্‌পিস্ করছে। হয়, আরো জোরে চালাও, নয় ত এখানেই

নামিয়ে দাও।' তখন ত ছেলে মানুষ, কত আর বয়স—মাহুত গ্রাহ্য করে না, হাসতে থাকে ফিক-ফিক করে। তখন করলাম কি—মাহুতের হাত থেকে অঙ্কুশটা কেড়ে নিয়ে হাতীর মাথায় জোরে জোরে হাঁকরাতে লাগলাম। মাহুত তখন ভয় পেয়ে হাঁ-হাঁ করে বলতে থাকে—'কর কি খোকী, কর কি—এখুনি—এখুনি পাহাড় বিগড়ে যাবে।' বিগড়াল না ছাই করল—তেমনি ব্যাঙের মতই চলতে লাগল। সেই থেকে হাতীর ওপরে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। হাতীর চেয়ে ঘোড়াই আমার পছন্দ।

মহারাজ হাসতে হাসতে বললেনঃ আচ্ছা, বিশ্রামের পর তুমি ঘোড়ার পীঠেই উঠো—তোমার আর্জি আমার মনে আছে।

বিশ্রামের পর মহারাজ উঠলেন হাতীর পীঠে। রাণী তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে ঘোড়ায় চেপে নূতন যাত্রা সুরু করলেন। চোখের পলকে মহারাজার হাতী ও মিছিলকে পিছনে ফেলে তাঁর ঘোড়া এগিয়ে চলল কাল্পীর পথে। শূন্য শিবিকাগুলি মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলল—যেখানে এতক্ষণ ঘোড়াগুলি ছিল।

মিছিল অবশেষে কাল্পীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। বিরাট বিশাল অরণ্য—গাছে গাছে পাতায় পাতায় মিশে এগিয়ে চলেছে। প্রাসাদ থেকে মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর অশ্বচালনায় নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, কাল্পীয় জঙ্গলে এসে বুঝলেন, অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত ভাবে রাণী অশ্বারোহণে কিরূপ অভ্যস্তা। শিকার-কালেও তাঁর লক্ষ্যভেদের দক্ষতা দেখে মহারাজ চমৎকৃত

হলেন। শুধু তাই নয়, শিকারের সময় এক অসতর্ক মুহূর্তে ভীষণাকৃতি একটি বাঘকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়বার সময় মহারাজের হাতের বন্দুকটি হঠাৎ বিকল হয়ে গেল; সকলেই শিকারে ব্যস্ত, মহারাজের দেহরক্ষীও তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, নিকটে কেউ নেই এবং তাঁর অবস্থাটিও কেউ হয়ত উপলব্ধি করেনি; কিন্তু মহারাজের এই নিরুপায় অবস্থায়—বাঘটা যখন তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, মহারাজও মৃত্যু স্থির জেনে ভগবানকে স্মরণ করছেন—ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে অব্যর্থ গুলী এসে বাঘটির দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে বিদ্ধ হলো; সে আঘাত এত সাংঘাতিক যে, অন্তিম কালের একটা গর্জনের সঙ্গে কিছুটা লম্ফ দিয়েই বাঘটা পড়ে গেল। পরক্ষণে সামনের দিকে তাকাতেই মহারাজ দেখলেন—ঘন বনের ভিতর দিয়ে রাণী ছুটে আসছেন। সেখান থেকেই তিনি মহারাজের বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলেন।

আর এক দিন এই জঙ্গলেই রাণীর অসিচালনার প্রচণ্ড শক্তি মহারাজা গঙ্গাধরকে প্রথম চমৎকৃত করে। সেদিন শিকারকালে জঙ্গলের একটা নির্জন অংশে রাণী এক দল চিতার মধ্যে গিয়ে পড়লেন। রাণী তাঁর শিক্ষিত ঘোড়ার পীঠে নির্ভয়ে চলেছিলেন এই পথে, এমন সময় এই ঘটনা। ক'দিনের হানাহানিতে জানোয়ারগুলো উত্যক্ত ও বিরক্ত হয়েছিল। অশ্বারোহিণী রাণীকে দেখেই তারা একসঙ্গে তাঁকে করল আক্রমণ। দলের লোক-জন এবং রাণীর সঙ্গিনীরা তখন অনেকটা তফাতে—জঙ্গলের আর

এক দিকে। রাণী কিন্তু এই সাংঘাতিক অবস্থায় কিছু মাত্র ভীত হলেন না—তিনি তাঁর ঘোড়াটিকে কৌশলে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তরবারি চালনা করতে লাগলেন। একটা চিতা মরিয়া হয়ে রাণীর ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রাণী তাঁর তরবারি এমন জোরে চিতার মাথার উপরে হানলেন যে, সেই ভীষণ জানোয়ারটির একটি চোখ, খানিকটা নাক আর মাথার আধখানা ছিন্ন হয়ে তার পিছনের চিতাটার মুখের উপরে পড়ল। দলপতির এই দুর্দ্দশা দেখে দলের আর চিতাগুলো যেন দমে গেল ; এমনি সময় নানা ভাবে চীৎকার তুলে বন্দুকের আওয়াজে বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে দলের লোকেরা এসে পড়ল—দূর থেকেই তারা রাণীর বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেছিল। লোকগুলি আসবার আগেই চিতাগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে পালিয়ে গেল।

একটু পরে মহারাজ গঙ্গাধরও এলেন। রাণীর তরবারির আঘাতে নিহত চিতাটাকে দেখেই তিনি স্তম্ভিত আর কি। তার-পর রাণীর দিকে চেয়ে বললেন ঃ অনেক শিকার এ জীবনে আমি দেখিছি, কিন্তু তলোয়ার হাঁকরে দুরন্ত চিতার আধখানা মাথা এ ভাবে উড়িয়ে দিতে কাউকে দেখিনি। তোমার হাতে এত জোর! সত্যিই এ আশ্চর্য!

রাণী বললেন ঃ ছেলেবেলা থেকেই যে আমি হাতের কসরৎ করে আসছি মহারাজ! এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চেষ্টা করলে, কসরৎ করলে, নিয়মিত ভাবে হাতিয়ার চালালে হাতে

এ রকম জোর হয়। চিতা ত সামান্ত, যে প্রকাণ্ড বাঘটাকে সেদিন আমি গুলী করে মেরেছিলাম, এই হাতে এই তলোয়ার হাঁকরে তার গলাও আমি কাটতে পারতাম।

প্রায় সপ্তাহ কাল কাল্লীর জঙ্গলে কাটিয়ে মহারাজ গঙ্গাধর রাজধানীতে ফিরে এলেন রাণীর সম্বন্ধে নূতন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর অন্তর এই ভেবে আনন্দে অভিভূত হলো যে, তিনি এমন এক নারীকে সহধর্মিণীরূপে পেয়েছেন, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান বিবেচনা ও শক্তিতে যিনি অতুলনীয়া। বিলাসে যিনি নিস্পৃহ, অথচ কর্তব্য পালনে এবং অন্যায়ের প্রতিবিধানে যাঁর দৃঢ়তার অন্ত নেই। তিনি এত দিনে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অবর্তমানেও এই মনস্বিনী নারী সুশৃঙ্খলেই ঝাঁসীর শাসন-কার্য নির্বাহ করতে সমর্থ হবেন।

রাণী লক্ষ্মীর বয়স এ সময় আঠারো বছর মাত্র। এই বয়সেই তিনি রাজ্যের অপব্যয় ও নানারূপ দুর্নীতি দমন করে, বহু অনাচার নিবারণ এবং জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানগুলির প্রবর্তনের দিক দিয়ে রাজ্যের প্রজাদের পক্ষ থেকে 'মাতুশ্রীজননী—করুণা-ময়ী রাণীমা' আখ্যা পেলেন।

রাণীকে নিয়ে মহারাজের কাল্লী গমন এবং কাল্লীর অরক্ষিত জঙ্গলের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের ব্যাপারে দেওয়ান লক্ষণরাও পরিতুষ্ট হননি, যেহেতু এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত মহারাজা জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি অনেক দিন থেকেই বুঝতে পেরেছেন যে, মহারাজ এখন রাণীর পরামর্শে চালিত হচ্ছেন এবং কাল্লীর

ব্যবস্থাও রাণীর পরিকল্পিত। তাই এ সম্পর্কে মহারাজের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়ান সাহেব সহসা বললেন: শাস্ত্রে একটা দামী কথা আছে মহারাজ, সেটা স্মরণ করে কাজ করা কর্তব্য।

মহারাজ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কি বলেছেন শাস্ত্রকাররা দেওয়ানজী?

দেওয়ানজী একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন:

আত্মবুদ্ধিঃ শুভঙ্করী গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ
পরবুদ্ধি বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

মহারাজ গঙ্গাধর বললেন: আপনার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করবার তাৎপর্য বুঝলাম। কিন্তু এ শ্লোক নিশ্চয়ই কোন শাস্ত্রকার রচনা করেননি, স্বার্থপর কোন ব্যক্তি আত্মকার্য উদ্ধারের জন্যই সম্ভবত রচনা করেছিলেন।

অপ্রসন্ন ভাবে দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন: মহারাজ কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

মহারাজ বললেন: নিশ্চয়ই। প্রমাণ আমি স্বয়ং। প্রথমেই বলি—আত্মবুদ্ধিতে আমি এমন অনেক কাজ করেছি, যেগুলি শুভকর না হয়ে রাজ্যের পক্ষে অনিষ্টকরই হয়েছে। আপনিও জ্ঞাত আছেন। তার পর—গুরুবুদ্ধির কথা ছেড়ে দিন, যেহেতু আমার গুরু নেই। এর পর আসে পরবুদ্ধির কথা। কিন্তু এ যদি বিনাশের কারণ হয়, তা'হলে অনেক আগেই আমি বিনষ্ট হতাম। কেন না, পর নিয়েই আমার

কাজ, তাঁরা কেউ গুরুও নন, পরমাত্মীয়ও নন। যেমন রাজ্যের দেওয়ান আপনি, আরও অনেকে আছেন—যাঁদের বুদ্ধিতে আমি চালিত হই। আপনিও স্বীকার করবেন—আমার বিনাশের জন্যই কেউ বুদ্ধি আমাকে দেন না। শেষে স্ত্রী-বুদ্ধিকেও আমি প্রলয়ঙ্করী বলব না। স্ত্রীবুদ্ধিতেই আমি কাল্পীর জঙ্গলে বাঘের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছি। তার পর রাণীর বুদ্ধিতে রাজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, আপনারও ত অজ্ঞাত নয়।

মহারাজের কথাগুলি শুনতে শুনতেই দেওয়ান সাহেবের মুখখানা কালো হয়ে গেল, তিনি এর পর আর কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না।

কাল্পী ভ্রমণের পর মহারাজ গঙ্গাধরের অন্তরে দত্তক-গ্রহণের বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। একদা তিনি দরবারে বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ, দেওয়ান এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে প্রস্তাবটি উত্থাপিত করলেন। মহারাজের পরিণত বয়স এবং পুত্রলাভের সম্ভাবনা নেই বুঝে তাঁরা সকলেই প্রস্তাবটির সমর্থন করলেন। দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও বললেন: মহারাজের বংশের ন্যায় উচ্চ বংশ এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন পুত্রকে দত্তকরূপে নির্বাচিত করা উচিত।

দরবারের পর অন্দর-মহলে এসে মহারাজ রাণীর কাছে প্রস্তাবটি তুলে বললেন: আমার ইচ্ছা, একটি সুন্দর সুলক্ষণ-যুক্ত শিশুকে দত্তক নিই, আর তুমি তাকে লালন-পালন কর, উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

রাণী বুঝলেন, পুত্রের অভাবে বংশরক্ষার জন্য ঝাঁসীর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মহারাজ এই প্রস্তাব করেছেন। তিনিও স্বামীর কথায় তাঁর সম্মতি জানালেন, কিন্তু দৃঢ় ভাবে অনুরোধ করলেন: রাজ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণের অভাব নেই। সদাচারী ধার্মিক কোন ব্রাহ্মণ—তিনি দরিদ্র হলেও ক্ষতি নেই, সেই ঘর থেকেই উপযুক্ত শিশুর সন্ধান করা হোক মহারাজ! উঁচু বংশ বা বড়-ঘরের চেয়ে সদাচার ও ধর্মনিষ্ঠায় যে বংশের খ্যাতি, তাকেই সর্বোচ্চ বলে মানা চাই। আমার এই যুক্তি মহারাজ!

মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর যুক্তি নিয়েই রাজধানীর কোন বিশিষ্ট ধার্মিক ব্রাহ্মণ-প্রজার মধ্য থেকেই এক প্রিয়দর্শন শিশুকে এই উপলক্ষে গ্রহণ করলেন। মহারাজ ঘোষণা করলেন যে, গৃহীত শিশুকেই তিনি শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি অনুষ্ঠান দ্বারা দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। ১৮৫৩ অব্দের ১৯শে নভেম্বর তারিখে দত্তক-গ্রহণের দিন নির্দ্ধারিত হলো। মহারাজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ এবং সন্নিহিত রাজন্য সমাজ এই উৎসবে আমন্ত্রিত হলেন। বৈদিক অনুষ্ঠানের পর আমন্ত্রিত আত্মীয়-পরিজন, রাজন্য সমাজ, রাজ্যের বিশিষ্ট ভূস্বামী, সরদার, বণিক, প্রধান প্রধান নাগরিক, প্রত্যেক মহলের প্রজা-প্রতিনিধি, বৃটিশ রেসিডেন্ট মেজর এলিস এবং বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর মার্টিনের সমক্ষে এই দত্তকগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠান অন্তে দত্তকপুত্র দামোদর গঙ্গাধর রাও নামে অভিহিত হলেন।

তৃতীয় পর্ব

বৈধব্য জীবন ও রাজ্যচ্যুতি

(১)

অপুত্রক মহারাজ গঙ্গাধর রাও এই ভাবে রাজ্যের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলেন। রাণী লক্ষ্মীদেবীও দত্তক পুত্রকে আপনার গর্ভজাত সন্তান জ্ঞানে সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন।

এই পুত্রও বংশ-গৌরবে হীন ছিলেন না—রাজবংশের সঙ্গে এঁর পিতৃবংশের রক্তের সম্বন্ধ ছিল। পিতার সংসারে এই বালক আনন্দ রাও নামে পরিচিত ছিলেন। পিতার নাম বসুদেব রাও নোবলকার। মহারাজের দত্তকরূপে বালক পূর্বনাম ত্যাগ করে দামোদর গঙ্গাধর রাও নামে অভিহিত হলেন।

রাণী মহারাজ গঙ্গাধরকে বললেন: দামোদরকে আমি কেমন করে গড়ে তুলি তা দেখে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন মহারাজ!

গঙ্গাধর সহাস্যে উত্তর করলেন: তুমি ত অনেক কিছু দেখিয়ে আমাকে অবাক করে দিয়েছ। তোমার হাতে পড়ে দামোদর যে ছেলে বয়সেই পাকা ঘোড়সওয়ার হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই; সেই সঙ্গে আর সব এলেমও দেখতে পাব নিশ্চয়ই।

কিন্তু এর পর দামোদরের বা রাণী লক্ষ্মীর কোন কৃতিত্ব দেখা আর মহারাজ গঙ্গাধরের অদৃষ্টে ঘটে উঠল না, বিধাতাও সে সুযোগ তাঁকে দিলেন না। দত্তক পুত্র গ্রহণের পর কয়েক মাসের মধ্যেই কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি সহসা দেহত্যাগ করলেন।

স্বামীর পরলোক গমনে রাণী লক্ষ্মী দারুণ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমন কি, সেই দুর্ঘটনায় তিনি স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় 'সহমরণে'র সঙ্কল্প করে রাজপুরীতে রীতিমত এক আতঙ্কের সৃষ্টি করলেন। পুরবাসিনীদের অজানা নয় যে, রাণী যে সঙ্কল্প করেন, তা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সৌভাগ্যক্রমে রাণীর পিতা এ সময় ঝাঁসীতে উপস্থিত হয়ে কন্যাকে বুঝিয়া বললেন: তাহলে কুমার দামোদর কার মুখ চেয়ে এ-বাড়ীতে থাকবে—কে তাকে ঠিক মত প্রতিপালন করবে? এই শোক তোমাকে সহ্য করতে হবে, ওর মুখ চেয়ে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে; মনে রেখ মা—ঝাঁসীর প্রজারা মহারাজের বিয়োগে অভিভূত হলেও তোমার উপরে তারা অনেক ভরসা রাখে।

পিতার কথায় রাণী সহমরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন, কিন্তু পিতাকেও অঙ্গীকার করতে হল যে, এখন থেকে তিনি ঝাঁসীতে থেকে ঝাঁসীর উন্নতির জন্য কন্যাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

অন্তঃপুরের কক্ষে কক্ষে স্বামীর অসংখ্য স্মৃতি, অতীতের

নানা ঘটনার কথা ও কাহিনী! স্বামী-দেবতার প্রশান্ত মুখখানি যখনই তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তিনি তখন অভিভূত হয়ে পড়েন, কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারেন না। সর্বদাই বিষণ্ণ হয়ে থাকেন, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না। স্বামীবিয়োগের পর কিছু দিন রাণীকে সকল বিষয়েই এই ভাবে নির্লিপ্ত ও উদাসীন দেখা গেল। দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও এবং পিতার উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করে তিনি বৈধব্য-জীবন পূজা-অর্চনায় অতিবাহিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শোক লাঘবের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমতী রাণী উপলব্ধি করলেন যে, মৃত্যুকালে স্বর্গীয় মহারাজ তাঁরই হাতে রাজ্য ও দত্তক পুত্র দামোদরের রক্ষার ভার অর্পণ করে গেছেন। এখন তিনি যদি রাজ্যের বিষয়ে অমনোযোগিনী হন, দামোদরের প্রতি অভিভাবিকার কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে তাঁকে পক্ষান্তরে স্বামীদেবতার কাছে অপরাধিনী হতে হবে।

এর পর রাণী ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন—'প্রভু, আমার মনে বল দাও, আগেকার মত উৎসাহ দাও—যার প্রভাবে আমি আমার কর্তব্য পালন করতে পারি।'

রাণী আবার আগেকার মত নিয়মানুবর্তিনী হলেন। রাত্রির চতুর্থ প্রহরেই শয্যা ত্যাগ করে স্নানাদি সমাধার পর শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র পরে পূজা-অর্চনায় বসেন। বেলা আটটা পর্যন্ত একই ভাবে পূজা চলে। পতিবিয়োগের পর মাথায় কেশ রাখতে হলে

শাস্ত্রানুযায়ী কৃচ্ছ্রসাধনার প্রয়োজন। তাই রাণীকে নিত্য সেই সাধনা করতে হয় তুলসী-কুঞ্জে বসে কয়েক ঘণ্টা ধরে। তার পর মাটীর শিবমূর্তি স্বহস্তে তৈরী করে বিধিমতে করেন তাঁর অর্চনা। এই সময় ব্রাহ্মণগণ শিবস্তোত্র পাঠ করতে থাকেন। পূজা-অর্চনাদি বেলা আটটা পর্যন্ত চলে প্রত্যহ একই ভাবে, একই নিয়মে। এর পর তিনি বেশ পরিবর্তন করে আঁটসাঁট করে কাপড় পরে বাগানে উপস্থিত হন। তাঁর নির্দেশ মত পাঁচটা সজ্জিত ঘোড়া নিয়ে ঘোড়ার রক্ষকরা তৈরী থাকে। রাণী একটি ঘোড়ার পীঠে উঠে বাকি চারিটি ঘোড়ার লাগাম ধরে একসঙ্গে দৌড় করান। ঘোড়াগুলো হিমসিম না খাওয়া পর্যন্ত এই ভাবে দৌড় চলে।

এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাণী বলেন—এতে মন হাল্কা হয়, দেহ যেন তাজা হয়ে ওঠে, মনটাও কাজের দিকে দৌড়াতে থাকে; তাই এমনি করে ঘোড়া দৌড় করিয়ে নিজেকে আবার রাজ্যের পিছনে দৌড় করবার এই নূতন কসরত ধরেছি।

ক্রমে ক্রমে রাণীর সঙ্গিনীরাও তাদের ঘোড়া নিয়ে রাণীর সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে যোগ দেন। কিছু দিন পরে রাণী কুমার দামোদরকেও ঘোড়ায় চড়া শিখবার জন্য একটি টাট্টু ঘোড়া আনিয়ে দিলেন। এই ভাবে কসরত করবার পর রাণী সত্য সত্যই যেন দেহে নূতন বল পান, আবার উৎসাহের সঞ্চার হয় তাঁর মনে। এই সময় তিনি পিতাকে বললেন: বাবা, আমি এখন থেকে দরবারে যাবো। পাশের ঘরে আমার

বসবার ব্যবস্থা করবার কথা দেওয়ানজীকে বলবেন। দরবারের কাজ আমি নিজেই চালাব ; সেই মত ব্যবস্থা আপনি করবেন।

পিতা মোরপন্থজী এ কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। কন্যার উপদেশ মত দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কন্যার বসবার স্থানও ঠিক করে দিলেন। কি ভাবে রাণী দরবার পরিচালনা করতেন, তার একটা বর্ণনা এখানে দেওয়া যাচ্ছে।

ঘোড়দৌড়ের পর রাণী বাগান থেকে ফিরে এসে প্রাসাদের মধ্যে একটি সুসজ্জিত সুবৃহৎ ঘরে বসেন। এ সময় তিনি রাজ্ঞীর মতন বেশ-ভূষাতেই সজ্জিতা হন—সে বেশ বীরাঙ্গনার উপযুক্ত। হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা, অনামিকায় হীরার আংটি—এই গহনাগুলি উজ্জ্বল বস্ত্রের সঙ্গে রাণীর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করে। দরবার সংলগ্ন ঘরে তাঁর বসবার সিংহাসন থাকে, সিংহাসনের সামনে একটি আধারের উপর রত্নখচিত কোষমধ্যে রাষ্ট্রের তরবারি। রাণীর সঙ্গিনীরা এখানে উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে রাণীকে পরিবেষ্টন করে থাকে। তাদের হাতে নিষ্কোষিত তরবারি, ভল্ল, ঢাল প্রভৃতি অস্ত্র। রাণীর নির্দেশ মত রাজপ্রাসাদ ও সেরেস্তার প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি দিন এই কক্ষে এসে রাণীকে অভিবাদন জানাতে হয়। এটি হচ্ছে রাজ-কর্মচারী ও রাণীর আশ্রিত ব্যক্তিদের নিয়ে দরবার। রাণী এই দরবারে প্রকাশ্য ভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের কথা শুনেন। কারুর কোন অসুবিধা বা অভিযোগ থাকলে সে সব কথাও এই দরবারে তাঁরা অবাধে রাণীকে

জানাবেন—রাণীই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে, রাণী তাঁর কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে পরিচিত। রাণীর এই খাস দরবারে কোন দিন কোন কর্মচারী হাজির না হলেই রাণী তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেন। পরদিন সেই ব্যক্তিকে দেখলেই শুধাবেন: কাল আপনাকে দেখিনি ত, কেন আসেননি?

সেই ব্যক্তির সাহস হয় না রাণীর সামনে মিথ্যা বলবার। অনুপস্থিত না হবার কারণ তিনি অসঙ্কোচেই জানান রাণীকে। রাণী যদি শোনেন, তাঁর বাড়ীতে অসুখ, কিম্বা কোন দিন যদি তাঁর কোন কর্মচারী বা আশ্রিত ব্যক্তির ব্যাধির কথা জানতে পারেন, তখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তবে তিনি আশ্বস্তা হন।

এই দরবারের পর রাণী আবার বস্ত্র পরিবর্তন করেন—একেবারে বিধবা হিন্দু নারীর বিশুদ্ধ বেশ। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ব্যাপারগুলিতে দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে যায়। এই সময় রাণী ভোজন করেন। ভোজনের পর তুলট কাগজে এক হাজার এক শত রামনাম লিখে সেগুলি প্রাসাদমধ্যে তড়াগ-জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে জলের মাছ দল বেঁধে সেগুলি সানন্দে ভক্ষণ করে। এর পর সামান্য একটু বিশ্রাম করেই দরবারে যাবার জন্য রাণীকে আবার সজ্জিত হতে হয়। অপরাহ্ণ তিনটার সময় বাহির-মহলে দরবার-কক্ষে যথারীতি এই প্রাত্যহিক দরবারের অধিবেশন হয়। এ সময় রাণীর বেশভূষা ঠিক পুরুষের মত। পরণে রেশমী কাপড়ের পায়জামা, বেগুনী

রঙের অঙ্গরক্ষা গায়ে, মাথায় উষ্ণীষ, কোমরে জরির দোপাটা—তারই পাশ দিয়ে রত্নখচিত এক জোড়া তলোয়ার ঝোলানো; মাথার দীর্ঘ কেশ গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে ফণিনীর পুচ্ছের মত পৃষ্ঠে প্রলম্ব। বিশাল দরবার-গৃহের পাশে তাঁরই নির্দেশ মত উপবেশন-কক্ষ। এই ঘরের দ্বারে সোনালী 'মেহেরাপ' (আস্তরণ)—তাহার উপর জরির কারুকার্য-খচিত চিকের পরদা খাটানো। কক্ষমধ্যে কিংখাপের গদির উপর মখমলের তাকিয়ায় পীঠ রেখে রাণী বসেন। দ্বারের দুই পাশে ভল্ল ও রূপার আসাসোটা নিয়ে প্রতিহারিণীদ্বয় পাহারা দেয়। বৃহৎ দরবার-গৃহে দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও এবং প্রধান মুন্সি দরকারী কাগজ-পত্র নিয়ে উপস্থিত থাকেন। দরবারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলি তাঁরা পার্শ্বকক্ষে গিয়ে রাণীকে বলেন এবং পরামর্শ নেন। কিন্তু সাধারণত, রাণী তাঁর কক্ষে বসেই অভিযোগাদি শুনে অনেক সময় মুখে-মুখেই আদেশ দেন, কিম্বা সময় সময় নিজেই হুকুম লিখে দেওয়ানের হাতে অর্পণ করেন। ফৌজদারী দেওয়ানী দ্বিবিধ বিচারই এমন বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে এবং সন্থ সন্থ রাণী সম্পন্ন করে দেন যে, সে এক বিস্ময়জনক ব্যাপার! বিচারের জন্য প্রার্থীদিগকে যা'তে দিনের পর দিন দরবারে হাজিরা দিতে না হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিচার-কার্য সম্পন্ন হয়—সেদিকে রাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ। এজন্য প্রজারা তাঁর নামে রাজ্যময় নূতন করে প্রশস্তির ধ্বনি তুলে জয় ঘোষণা করে।

বিশেষ দরবারে রাণীর ব্যবস্থা অনুসারে কুমার দামোদরকে

রাজ-পরিচ্ছদে সাজিয়ে এনে দরবারীদের সঙ্গে পরিচিত করে দরবারে বিশিষ্ট আসনে তাঁকে বসানো হয়, কখন বা নিজের গদীতে পাশে বসিয়ে রাণী তাকে উপদেশ দেন।

প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার দরবার ভঙ্গের পর রাণী দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে মহালক্ষ্মী-মন্দিরে দেবী দর্শনে যান খুব জাঁকজমক করে। প্রাসাদ থেকে কতকটা দূরে রাজধানীর মাঝখানে এই দেবীমন্দির। মন্দিরের সামনেই সুবৃহৎ সরোবর, তার নীল জলে নানা বর্ণের পদ্মফুল ফুটে থাকে—সেই পদ্মফুলে রাণী দেবীর পূজা করে আনন্দ পান। রাণী কোন দিন হাতী চড়ে, কখনো বা ঘোড়ার পীঠে, আবার সময়ে সময়ে পাল্কীতে আরোহণ করে মন্দিরে যান। জরিখচিত কিংখাপ কাপড়ের আস্তরণে রাণীর পাল্কী ঘেরা থাকে; চারজন সুসজ্জিতা পরিচারিকা সে সময় পাল্কীর খুর ধরে অনুগমন করে। যখন ঘোড়ার পীঠে যাত্রা করেন, রাণীর সঙ্গিনীরা রণরঙ্গিণী বেশে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলেন। রাণীর সঙ্গিনী ও অনুচরীদের সাজসজ্জার বাহারও চমৎকার। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে সবুজ, লাল বা ছাই রঙের সাড়ি, গায়ে জরির চেলি, সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, পায়ে চর্ম-পাদুকা, কোমরে কোষবদ্ধ তলোয়ার, হাতে ভল্ল। মিছিলের পুরোভাগে ডঙ্কা বাজতে থাকে, নিশান ওড়ে। রাণীর সঙ্গিনীদের পিছনে থাকে এক শত ঘোড়-সওয়ার—প্রত্যেকেই সামরিক পরিচ্ছদধারী, দুই শত পদাতিক সৈন্যও মিছিলের সঙ্গে ডঙ্কা বাদ্যের তালে তালে চলে। এ সব

ছাড়া, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং রাণীর আশ্রিত-গণকেও মিছিলে যোগ দিতে হয়। প্রাসাদ থেকে মিছিলের যাত্রা ও প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্যন্ত কেল্লার বুরুজ থেকে নহবৎ বাজতে থাকে। রাণীর এই জমকালো মিছিল দেখবার জন্য রাস্তার দু'পাশে বিপুল জনতার সমাগম হয়—শান্তিরক্ষকগণ সন্তর্পণে তাদের নিয়ন্ত্রিত করে। রাণী বলেন যে, সামরিক বাদ্য-ধ্বনির তালে তালে এই ভাবে শোভাযাত্রার ফলে কেল্লার সৈনিকদের মনে উদ্দীপনা জাগবে, দেহের আড়ষ্টতা কাটবে। মহালক্ষ্মী ঝাঁসী-রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী। খুব ঘটা করে দেবীর নিত্য পূজা চলে—রাজকোষ থেকে সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে। বহু ব্যক্তি এই মন্দিরে নিয়োযিত, নিত্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তাদের অবস্থিতির জন্যে ধর্মশালা এবং ভোজনের জন্যে দেবীর প্রসাদ বিতরিত হয়ে থাকে।

অশ্বারোহণে রাণী যে অত্যন্ত পারদর্শিনী, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। অশ্বপরীক্ষাতেও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। সে সময় ভারতবর্ষে তিন জন অশ্ববিদের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রথম নানাসাহেব; দ্বিতীয় রাণী লক্ষ্মী; তৃতীয় বাবাসাহেব আপ্‌টে গালহেরিকর। কিন্তু অশ্বপরীক্ষার ব্যাপারে রাণী লক্ষ্মীর নাম সর্বাগ্রে। এসম্বন্ধে অনেক গল্পও শোনা যায়।

একদা এক অশ্ববণিক দু'টি তেজস্বী প্রিয়দর্শন অশ্ব সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ীতে এলেন বিক্রয় করবার উদ্দেশ্যে। দু'টি অশ্ব দেখেই কর্মচারীরা পছন্দ করলেন; রাণীকে জানালেন যে,

দু'টিই সমান জাতের ও সমান গুণের অশ্ব। রাণী মৃদু হেসে বললেন: ঘোড়া কি চোখে দেখে বিচার করা যায়? বেশ, আমি নিজেই এদের পরীক্ষা করে দেখব। অতঃপর রাণী একে একে সেই দু'টি অশ্বের পীঠে উঠে চক্রপথে তাদের দৌড় করাতে লাগলেন। এই দৌড়বাজিতেই রাণী বুঝলেন, কোন্ ঘোড়া কি ধাতের, আর—কার কত দাম হওয়া উচিত। তিনি অশ্ববণিককে বললেন: প্রথমটির দাম হাজার টাকা, আর দ্বিতীয়টির জন্যে পঞ্চাশ টাকার বেশী দেওয়া যায় না।

রাণীর এই সিদ্ধান্ত শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। দু'টি ঘোড়াই দেখতে একই রকমের; যেমন তেজী, তেমনি দেখতে সুশ্রী; অথচ দামের এত তফাৎ? অশ্ববণিকও বলল যে, দ্বিতীয়টির দাম মহারাণী সাহেবা এত কম বললেন কেন, সে তা বুঝতে পারছে না।

রাণী বললেন: আমি ভুল বলিনি—প্রথম ঘোড়াটিই ভাল, আর দ্বিতীয়টি একেবারে অচল। তার কারণ—ওর ছাতি ফাটা; সেই জন্যে কাজের বাইরে।

এর পর আর একটি ঘোড়া নিয়ে অপর এক জন বণিক আসেন ঝাঁসীতে। অপূর্ব সে ঘোড়া—রাজহাঁসের পালকের মত তার গায়ের লোমগুলি ধবধবে সাদা—গ্রীবাটিও সর্বক্ষণ উঁচু করে থাকে। তাই এ ঘোড়া দেখেই অনেকে পছন্দ করেন, কিন্তু ঘোড়ার পীঠে চড়ে একটা চক্রও কেউ দিতে পারেননি এ পর্যন্ত, ঘোড়া প্রত্যেক সওয়ারীকে ফেলে দিয়েছে। বণিক অকপটে

সব কথা বললেন রাণীকে। রাণী অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়াকে পরীক্ষা করলেন তার সর্বাঙ্গ ঠুকে ঠুকে। তার পর বললেন: এ ঘোড়ায় আমি চড়ব—আমাকে এ ফেলবে না।

বণিক অবাক হয়ে চেয়ে রইল—রাণী যখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘোড়ার পীঠে উঠে বসে তাকে দৌড় করালেন। তবে এ দিন রাণী ঘোড়ার পীঠে উঠেই ডান পা'টি রেকাব থেকে তুলে রাখলেন। ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটল রাণীকে পীঠে নিয়ে—সবার বুকগুলো ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল ভয়ে। কিন্তু চক্র দিয়েই রাণী নিরাপদে ফিরে এসে ঘোড়ার পীঠ থেকে নেমে পড়লেন। বণিক বললেন: সত্যিই এ তাজ্জব কাণ্ড মহারাণীজী! হিন্দুস্থানের বহুৎ বহুৎ রাজা আমীর রইস লোক কোসেস করেছেন এ ঘোড়ার পীঠে উঠতে—কিন্তু কেউ পারেননি, অনেকে জখম পর্যন্ত হয়েছেন।

রাণী বললেন: তার কারণ, এই ঘোড়ার ডান দিকে জিনপোষের নিচে চামড়ার মধ্যে একটা কোন শক্ত জিনিষ ঢুকে আছে। ঘোড়ার পীঠে চড়ে ডান পায়ের ভার রেকাবে পড়লেই সেই জায়গায় দারুণ ব্যথা লাগে ঘোড়ার—সে তা বরদাস্ত করতে পারে না, বেপরোয়া হয়ে সওয়ারীকে ফেলে দেয়।

রাণীর কথা শুনে বণিক ত অবাক! রাণী দেড় হাজার টাকায় সেই ঘোড়া তখনি খরিদ করলেন। তার পর তাঁর বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসককে আনিয়ে ঘোড়ার পেটের দিকে সেই স্থানটি দেখিয়ে বললেন: এখানটা ভালো করে দেখুন ত!

অশ্বচিকিৎসক পরীক্ষা করে বললেন : রাণীজীর অনুমান সত্য ; এখানে মস্ত একটা পেরেক ফুটে আছে। তখন অনেক চেষ্টা করে ঘোড়াকে কায়দায় এনে সেই পেরেক উদ্ধার করা হলো তার দেহ থেকে। এই ঘোড়াটিই এর পর রাণীর অতি প্রিয়তম বাহনে পরিণত হয়।

রাণীর দানশীলতা সম্বন্ধেও এমনি অনেক গল্প আছে। মহালক্ষ্মী-মন্দির থেকে ফেরবার সময় রাণী এক দিন দেখলেন, বহু ভিখারী এক স্থানে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। রাণী কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, তারা দারুণ শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে শীতবস্ত্রের অভাবে। রাণী তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন—ভিখারীদিগকে এক স্থানে জমায়েত করে প্রত্যেককে এক একটি তুলা-ভরা জামা, টুপী ও কম্বল দেওয়া হোক।

আর এক দিন এক ব্রাহ্মণ রাণীর সামনে কোন প্রকারে এসে প্রার্থনা জানালেন : আমি কন্যাদায়গ্রস্ত মা, টাকার অভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারছি না।

রাণী জিজ্ঞাসা করলেন : টাকা দিলেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র কি পাবেন? কেউ রাজী আছেন আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে?

ব্রাহ্মণ বললেন : হ্যাঁ—রাণীমা, সেরূপ পাত্র আছে ; কিন্তু নগদ চারশ' টাকা পণ দিতে হবে। এত টাকা আমি কোথায় পাব?

রাণী তখনই ব্রাহ্মণকে পাঁচ শত টাকা দিবার হুকুম জানিয়ে

বললেন : কিন্তু বিয়ের সময় আমাদের কুঙ্কুমপত্রিকা পাঠাতে ভুলবেন না যেন !

এই ভাবে রাণী সুষ্ঠুভাবে শান্তির সঙ্গে রাজ্যশাসন ও কর্তব্য-পালন করতে লাগলেন। তাঁর ব্যবস্থায় রাজ্যের ঋণ পরিশোধ হয়ে অর্থ উদ্‌বৃত্ত হতে লাগল। ইংরেজদের চেষ্টায় মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের আমলে যে দু'জন সুবিধাবাদী কুশীদজীবি দরবারে জেঁকে বসেছিল, রাণী তাদের প্রাপ্যাদি পরিশোধ করে সরিয়ে দিলেন। স্বার্থহানি হওয়াতে এরা দু'জনে জোট বেঁধে রাজ্যে একটা বিদ্রোহ বাধাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু রাণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। এর পর তারা ইংরেজদের সঙ্গে মিশে অন্য ভাবে রাণীকে বিপন্ন করবার জন্য তৈরী হতে লাগল।

আগেই বলা হয়েছে, মহারাজ গঙ্গাধর যখন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, সে সময় ইংরেজ রেসিডেণ্ট মেজর এলিস ও ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর মার্টিন সেই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর মহিষীকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে দেখে ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ঝাঁসী রাজ্যটি ইংরেজ অধিকারের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায়, ঝাঁসীর শাসন-প্রণালী, সুবিচার-পদ্ধতি ইংরাজ রাজ্যের প্রজাগণকেও প্রলুব্ধ করে তুলেছে ; তারা রাণীর রাজত্বে প্রজাদের নানা রকম সুখ-সুবিধা দেখে ইংরেজ রাজ্যের বিধিব্যবস্থার খুঁত ধরে সমালোচনা

আরম্ভ করছে। ইংরেজ রাজপুরুষরা এ ব্যাপারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই সূত্রে বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেন্ট ম্যালকম সাহেবকে কেন্দ্র করে এই মর্মে একটা পরিকল্পনার সৃষ্টি হল যে, ঝাঁসী বৃটিশ অধিকারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঝাঁসী অধিকৃত হলে সমুদয় বুন্দেলখণ্ডের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হবে। সুতরাং রাণীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বৃত্তি দানের বিনিময়ে ঐ রাজ্য খাস করে নেওয়া উচিত। এই পরিকল্পনার কথা কলকাতায় ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর নিকট পেশ করা হল।

একটা প্রচলিত কথা আছে। পেটুক মেধোকে জিজ্ঞাসা করা হয়—ভাত খাবি? সে অমনি আহ্লাদে গদগদ হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, হাত ধোবো কোথায়? বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেন্টের উক্ত প্রস্তাবটি ভারতের রাজ্যগ্রাসী বড়লাট ডালহৌসীর পক্ষে ঐ মেধোর মতই হয়ে দাঁড়াল। এই ভদ্রলোক কি ক্ষণে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, প্রলয়ঙ্কর মহাকালের খাতাতেই বোধ হয় সেটা লেখা আছে। ইনি কলকাতার প্রাসাদে স্থির হয়ে বসেই ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে শিউরে উঠলেন। তাইত, এখনো গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজ তার হাতের মধ্যে আনতে পারেনি—দিকে দিকে এমন এক-একটা রাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যের পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করছে—যেন তারা প্রচণ্ড সামরিক শক্তির অধিকারী ইংরেজের

সমকক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তর্জন করে উঠলেন—ননসেন্স!
সারা ইণ্ডিয়া এক হয়ে যাবে—একমাত্র প্রভু হবে ইংরেজ।

এই সর্বগ্রাসী নীতি নিয়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত পলিটিক্যাল ইংরেজ এজেন্টদিগকে গোপনীয় পত্রে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে লিখলেন—আপনি অবিলম্বে আপনার এলাকায় যে-সব স্বাধীন বা মিত্র-রাজ্য আছে, তাদের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে তাদের কিরূপ সম্বন্ধ এ সবের বিবরণ লিখে পাঠাবেন। আপনার প্রেরিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই আমাদের পরবর্তী কার্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হবে।

ঝাঁসী সম্পর্কে রিপোর্ট পূর্বেই প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু ঝাঁসীর বৃদ্ধ মহারাজের জীবদ্দশায়—বিশেষতঃ ঝাঁসীর সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি-সর্ত্তের কথা জ্ঞাত হয়ে লর্ড ডালহৌসী তৎকালে কোনরূপ আদেশ মন্তব্য প্রেরণ করেননি। বিশেষ করে—ঝাঁসীর চেয়ে কতকগুলি সমৃদ্ধ রাজ্যের উপর তাঁর ব্যাঘ্র-দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছিল।

বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেন্ট ঝাঁসী সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট যে সময় কলকাতায় লর্ড ডালহৌসীর নিকট প্রেরণ করেন, তিনি তখন নবলব্ধ অযোধ্যা অঞ্চল পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। প্রায় ছয় মাস পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেই তিনি ঐ রিপোর্ট পাঠ করে বোধ হয় এই ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে এই রাজ্যটি বৃটিশ

এলাকাভুক্ত হতে দীর্ঘ ছ'টা মাস অযথা পিছিয়ে গেছে! পূর্বের রিপোর্টে যেটুকু সংশয় ছিল, মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু এবং দত্তক গ্রহণ ব্যাপারটা তার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। এখন এ রাজ্য আয়ত্ত করবার পরম সুযোগই উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসীর সম্বন্ধে এই মর্মে এক আদেশ পত্র প্রেরণ করলেন: যেহেতু ঝাঁসী স্বাধীন রাজ্য নহে, ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ মাণ্ডলিক রাজ্য মাত্র, সেই হেতু সার্বভৌম অধিপতি বৃটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত মহারাজার দত্তক গ্রহণের কোন অধিকার নেই। এবং যেহেতু মহারাজ গঙ্গাধর রাওএর যে-সকল পূর্ব-পুরুষের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বাধ্য-বাধকতা সম্বন্ধ ছিল, তাঁদের বংশের কোন সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী বর্তমান নেই; অতএব এই দত্তক-বিধান মঞ্জুর করে ঝাঁসীর গদী স্থায়ী রাখতে বৃটিশ সরকার বাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত ঝাঁসী রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে সমস্ত বুন্দেল-খণ্ডের রাজ্য-ব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্বাহ হবে এবং বৃটিশ-সুশাসনে সমস্ত প্রজাবর্গেরও কল্যাণ সাধিত হবে। এই অবস্থায় রাণীর জীবদ্দশা পর্যন্ত তাঁর ব্যয়-নির্বাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করে ঝাঁসীর রাজ্য খাস করে নেওয়া হোক্।

খুব গোপনেই এই ভাবে চিঠিপত্র আদেশ-মন্তব্যাদি চালাচালি হতে থাকে। বড়লাটের সিদ্ধান্তের পর বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ম্যালকম সাহেব ঝাঁসীর রাণী সম্পর্কে কতক-

গুলি প্রস্তাব করে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রীয় সেক্রেটারী বরাবর এক মন্তব্য-লিপি পাঠালেন। সেই প্রস্তাবগুলির মর্ম এইরূপ :

(১) রাণীর জীবদ্দশা পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক্।

(২) বাসের জন্য রাণীকে ঝাঁসীর রাজবাটী অর্পণ করে জানিয়ে দেওয়া হোক্ যে, উক্ত রাজবাটী রাণীর নিজস্ব সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

(৩) মহারাজ গঙ্গাধর রাও মৃত্যুকালে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে যান যে, রাজ্যের মূল্যবান জহরতাদি এবং রাজকোষের সঞ্চিত নগদ টাকার অধিকারিণী হবেন রাণীসাহেবা। সুতরাং মহারাজের সেই ইচ্ছানুসারে কার্য করা হোক্।

(৪) রাজপ্রাসাদেই মহারাজ গঙ্গাধর এবং রাণীসাহেবার যে সকল আত্মীয়-পরিজন ও আশ্রিতগণ বসবাস করে আসছেন, তাঁদের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করে একটা তালিকা প্রস্তুত করা হোক্।

বড়লাট ডালহৌসী ম্যালকম সাহেবের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাব গ্রাহ্য করে তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন যে, রাজকোষের টাকা ও রাজ্যের জহরতাদি সমস্তই দত্তক পুত্রের প্রাপ্য। যে পর্যন্ত উক্ত দত্তক সাবালক না হচ্ছেন—সে সমস্তই উপযুক্ত বিশ্বস্ত ট্রাষ্টীর কাছে গচ্ছিত থাকবে। যদিও দত্তক পুত্র রাজ্যাধিকারী হবেন না, কিন্তু মহারাজ গঙ্গাধরের নিজস্ব সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করাও চলবে না।

এই আদেশ-পত্র পাবার পর ম্যালকম সাহেব মেজর
এলিসের হাতে বড়লাটের আদেশলিপি অর্পণ করে ঝাঁসীর
দরবারে পাঠালেন।

(২)

সেদিনও যথারীতি রাণী লক্ষ্মীর দরবার বসেছে। দেওয়ান
থেকে আরম্ভ করে সকলেই উপস্থিত। রাজ্যের সওদাগর,
জমিদার, ভূম্যধিকারী, জাইগীরদার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিদেরও
রাজ-কর্মের অনুরোধে দরবারে সমাগম হয়ে থাকে। এদিনও
অনেকে উপস্থিত। এমন সময় এক দল গোরা পল্টন নিয়ে
মেজর এলিস ঝাঁসীর দুর্গদ্বারে উপনীত হলেন। এই সাহেব-
কে প্রায়ই দরবারে আসতে দেখেছে প্রহরীরা; অন্য সময়
তাঁর সঙ্গে দু'-এক জন সিপাহী শান্ত্রীও থাকে। কিন্তু এদিনে
এমন ঘটা করে সাহেবকে আসতে দেখে দ্বাররক্ষীরাও অবাক
চেয়ে রইল।

এই এলিস সাহেবই দত্তক গ্রহণের সময় আমন্ত্রিত হয়ে
উপস্থিত ছিলেন, আর আজ তিনিই ভারতের ভাগ্যবিধাতা
লর্ড ডালহৌসীর আদেশে সেই দত্তক অসিদ্ধ বলে ঝাঁসীর রাজ-
পাট দখল করতে উপস্থিত! এলিস অবশ্য এই নিদারুণ
কাজটির ভার গ্রহণে প্রথমে সম্মত হননি—তিনি অন্য কাউকে
এ কাজে পাঠাবার জন্য অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে
আপত্তি শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি।

মেজর এলিস, পলটনের বেশীর ভাগ লোককে বাইরে রেখে

তাঁর সহকারী ও জন দুই দেহরক্ষী নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। রেসিডেন্ট হিসেবে সাহেবরা দরবারে এলে তাঁদের জন্যে স্বতন্ত্র আসন থাকে, সেখানে তাঁদের খাতির করে বসানো হয়। এদিনও এলিস সাহেবকে বসবার জন্য যথাযথ ভাবে অভ্যর্থনা করা হলো।

কিন্তু এলিস সাহেব গম্ভীর মুখে গাঢ় স্বরে জানালেন: মাপ করবেন আমাকে; বন্ধু ভাবে আজ এ দরবারে বসবার মত মনোবল আমার নেই। বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেন্ট ম্যালকম সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন আমার উপরে।

এই পর্যন্ত বলেই এলিস সাহেব ভারত সরকারের আদেশ পত্রখানি ফাইল থেকে বা'র করে আর্তস্বরে বললেন: গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী সাহেবের এই জরুরী ঘোষণা আমাকে দেওয়া হয়েছে মাননীয়া রাণীসাহেবাকে জ্ঞাপন করাবার জন্যে।

সাহেবের মুখে ঘোষণার কথা-প্রসঙ্গে লর্ড ডালহৌসীর নাম শুনে সমস্ত দরবার যেন স্তব্ধ হলো সেই মুহূর্তে। দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও তৎক্ষণাৎ চিক্‌-পরদার অন্তরালে উপবিষ্টা রাণীকে সাহেবের কথা জানালেন। রাণী বললেন: সাহেবকে বলুন লাট সাহেবের ঘোষণা তিনি পড়ুন—দরবারের সকলেই শুনুন ঐ ঘোষণা।

কিন্তু ঘোষণা হচ্ছে বড়লাটের সেই আদেশ-মন্তব্য ও কয়টি দফায় ইংরেজ সরকারের সিদ্ধান্ত—ঝাঁসী রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে। এলিস সাহেব ঘোষণা পাঠ করতে লাগলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে দরবারের প্রত্যেকে অবাক-বিস্ময়ে মর্মরমূর্তির মত স্থির! কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সাহেবের মুখ থেকে ঘোষণার পরম তথ্য—'ঝাঁসী খাস করা হলো' কথাটি নির্গত হবা মাত্র ধৈর্য হারিয়ে রাণী জ্বালাময়ী স্বরে গর্জন করে উঠলেন: 'মেরা ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!'

রাণীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের স্বর হয়ত পরিচিতদের নিকট অশ্রুত নয়, কিন্তু স্বরের এমন তেজোদৃপ্ত ঝঙ্কার—সুবিশাল দরবারকম্পন-কারী এমন তর্জন—এর আগে আর কারুর কানে প্রবেশ করেনি। সাহেব পর্যন্ত স্তব্ধ, চমকিত, চমৎকৃত!

কিছু পরে তিনি আত্মসম্বরণ করে রাণীকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে বললেন: আপনি শান্ত হোন রাণীসাহেবা, ক্রোধ করবেন না; আপনাকে পূর্ণ পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হবে—আপনার যথাযোগ্য মান-মর্য্যাদা দেওয়া হবে।

রাণীও পাল্টা জবাব দিলেন: থাক, আমাকে এ ভাবে আর আশ্বাস দিয়ে আমার মনের জ্বালা বাড়াবেন না সাহেব! আমি আজ পর্যন্ত এক স্বাধীন রাজ্যের রাণী; আপনারা আমার রাজ্য খাস করে নিয়ে আমাকে নজরবন্দিনী করে বৃত্তি দেবেন, আমার প্রতি ভূয়ো সম্মান দেখিয়ে মান-মর্যাদা দেবেন—এ কথা শুনেই আমি গলে যাব ভেবেছেন? এ সব কথা বলতেও আপনার লজ্জা হচ্ছে না?

এলিস সাহেব বুঝলেন, সত্যিই—রাণী যে কথা বললেন, তার উত্তর দেবার কিছু নেই। আজ যিনি রাণী—স্বাধী ভাবে ক্ষমতা চালাচ্ছেন, তাঁকে রাজ্যহারা করে বৃত্তি দেবার মান-মর্যাদা বজায় রাখবার কথা বলা মানেই রীতিমত আঘ করা। তিনি তখন কথার মোড় অন্য দিকে ফিরিয়ে বললেন রাণীজী ত আর সব রাজ্যের হাল কি হয়েছে শুনেছেন! নাগপুর, সেতারা, সম্বলপুর, কেরৌলী, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য-গুলিও একটি একটি করে বৃটিশ-এলাকাভুক্ত হয়েছে। তাদের অবস্থার কথা ভেবে আপনি আশ্বস্ত হতে পারবেন, আশা করি।

মেজর এলিসের কথার উত্তরে তীক্ষ্ণ স্বরে রাণী বললেন: আপনার যুক্তি চমৎকার সাহেব! লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী দস্যুর লুণ্ঠনের কথা তুলে—যাদের ধন-সম্পত্তি ডাকাতে লুঠ করে নি গেছে, তাদের অবস্থার কথা বলে সন্তলুণ্ঠিত সর্বহারাকে আপনি প্রবোধ দিতে চাইছেন! কিন্তু এ কথা ভুলে যাবেন না—প্রব অত্যাচারীকেও প্রবলতর অত্যাচারীর সম্মুখীন হতে হয়। আপ-নাদের এখন একাদশে বৃহস্পতি, হিন্দুস্থানের যোদ্ধাদের তাঁবেদা করেছেন; হিন্দুস্থানের রাজাদের রাজপাট কেড়ে নিচ্ছে হিন্দুস্থানী সিপাহীদের এগিয়ে দিয়ে; বুঁদ করে রেখেছেন তাদে মোহের নেশায়। কিন্তু এ নেশা একদিন ভেঙে যাবে জানবেন যে সব রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন—তাদের ফিরিস্তি শুনিয়ে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, কিন্তু ঐ সব রাজ্যের যাঁরা ছিলেন দণ্ডধর রাজা-

তাঁদের রাজ্যহারা বিধবাদের দীর্ঘশ্বাস ইংরেজের অদৃষ্টের আকাশে কি কাল মেঘের সৃষ্টি করেছে,এখন তা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু এক দিন যখন ঐ মেঘের ভিতর দিয়ে প্রলয়ের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে, ধ্বংসের মাদল বেজে উঠবে, বিধাতার বজ্র ফুটে বেরুবে, তখন বুঝতে পারবেন—পৃথিবীর শক্তিমানের উপরে আর এক জন শক্তিমান আছেন, যাঁর শক্তির তুলনা নেই, যাঁর বিচারে ভুল হয় না। আপনারা আমার রাজ্য অপহরণের যে যুক্তি দেখিছেন, তা ভুয়ো—মিথ্যা। আপনি জানাবেন আপনার প্রভু ডালহৌসি সাহেবকে—ইংরেজ সরকার আমাদিগকে ঝাঁসী দান করেননি; কোন দিনই আমরা ইংরেজের অধীনে ছিলাম না, এখনো অধীন নই। মহামান্য পেশোয়াদের রাজত্ব কালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক পরাক্রমের কাজ করায় নিজেদের বাহাদুরীর বলেই এই রাজ্য অর্জন করেছিলেন। এর উপর ইংরেজ সরকারের কোন অধিকার নেই। তাই তাঁর ঐ অন্যায় অবৈধ স্পর্দ্ধিত ঘোষণার জবাব আমাকে এই বলে দিতে হচ্ছে—'মেরা ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!'

(৩)

'মেরা ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!' এই বহ্নিগর্ভ বাণীতে প্রতিবাদ জানালেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের সেই জবরদস্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে। এর পর ক্ষোভে অভিমানে উদ্বেলিত চিত্তে রাণী প্রাসাদের কক্ষে ফিরে এলেন। দূরদর্শিনী রাণী দিব্য-দৃষ্টিতে তাকালেন ভারতের দিকে দিকে—চোখের সামনে ভেসে

উঠল একটি একটি করে অতীতের পরাক্রান্ত রাজবংশগুলির শোচনীয় অধঃপতন, দুর্ভাগ্য উত্তরাধিকারীদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী স্পর্দ্ধিত ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন অত্যাচার এবং অত্যাচারিতদের একান্ত অসহায় অবস্থা। অন্যায় অনুচিত অবৈধ জেনেও ইংরেজের এই অত্যাচার প্রত্যেকেই নীরবে সহ্য করছে। আর, তাছাড়া উপায়ই বা কোথায়? আত্মকলহে ভারতের রাজ্যগুলি আত্মশক্তি হারিয়ে অতীত গৌরবের অবদান আঁকড়ে পড়ে আছে —আত্মরক্ষার সামর্থও তাদের নেই।

মনে পড়লো—নাগপুরের ভোঁসলা রাজবংশের কথা। সেই মহাবীর প্রথম রঘুজী ভোঁসলা—দুর্দ্ধর্ষ অশ্ববাহিনী নিয়ে একদা যিনি সারা ভারতে হানা দিয়েছিলেন; দিল্লীর বাদশাহ পর্যন্ত 'থরহরিকম্প' হতেন যাঁর দুর্বার দাপটে। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রঘুজীও বড় 'কেউ-কেটা' ছিলেন না; এঁরই সেনানী ভাস্কর পণ্ডিত মারাঠা শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'চৌথ' দাবী করে সুবে বাঙলার নবাব আলিবর্দীকে ব্যতিব্যস্ত করায় নিরুপায় হয়ে নবাব কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতায় ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করে ভীমরুলের চাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপের মত এক দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন এবং অবশেষে উড়িষ্যা প্রদেশের সঙ্গে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা 'চৌথ স্বরূপ' দেবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে রঘুজী ভোঁসলার রোষানল থেকে রক্ষা পান ও মারাঠা-বিপ্লব থেকে তাঁর স্নেহের দৌহিত্র সিরাজকে নিষ্কণ্টক করে যান। মহীশূরের মহাবীর হায়দার আলির মত নাগপুরের বীরকেশরী

রঘুজীও ইংরেজদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাদের রাজ্যবিস্তারে প্রবল অন্তরায়-স্বরূপ ছিলেন—সেই দুর্দ্ধর্ষ রঘুজীর বংশধর কালক্রমে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করলেন। কিন্তু চাকা তখন ঘুরে গেছে ; ইংরেজের তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা, পক্ষান্তরে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির সাক্ষীস্বরূপ হয়ে সেদিনের পরাক্রান্ত রঘুজীর সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, নাগপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির অধিকারীরূপে গলিত-নখর-দ্রংষ্ট্রা ব্যাঘ্রের মত রঘুজী ভোঁসলার বংশধর কোনরূপে রাজগী বজায় রেখেছিলেন। তৃতীয় রঘুজীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের শ্যেন দৃষ্টি তীব্রতর হয়ে উঠল। মাঞ্চেষ্টারে কাঁপড়ের কলগুলো তখন ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণের জন্যে অবিশ্রান্তগতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং ভারতবর্ষের তাঁত ও তাঁতীদের বস্ত্রবয়ন শক্তি প্রতিরোধ করা হয়েছে নানা ভাবে! বিলাতের যন্ত্র-দানবদের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার জন্যে চাই প্রচুর পরিমাণে কার্পাস তুলা—সেই তুলার জন্মস্থান হচ্ছে নাগপুর ও তার চতুঃপার্শ্ববর্তী অঞ্চল ; সুতরাং নাগপুর খাসে আনা ইংরেজের একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্যেন দৃষ্টিতে এই স্বাধীন রাজ্যটির জীর্ণ সিংহাসনের পানে তাকিয়ে উপযুক্ত ক্ষণটির প্রতীক্ষা করছিল ইংরেজ।

তৃতীয় রঘুজীর বিধবা রাণী বঙ্কবাঈ এই বংশেরই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বালককে দত্তক পুত্র গ্রহণ করলেন। প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানের পর সেই বালক জানোজী ভোঁসলা নামে অভিহিত হয়ে নাগপুরের গদীতে বসলেন। নাগপুরের সেই

বৈধ অনুষ্ঠানেও বৃটিশ রেসিডেণ্ট ম্যালিসন সাহেব উপস্থিত থাকেন বন্ধুভাবে। কিন্তু এর পরেই লর্ড ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট রাণীর দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ এই অজুহাতে এক ঘোষণা দ্বারা নাগপুর রাজ্য খাস করে নিলেন। কিন্তু এখানেই রাণী ও রাজবংশের পরিজনদের দুর্গতির সমাপ্তি হলো না। ইংরেজ দেখলেন, ভোঁসলা রাজবংশের পরিজনসংখ্যা এত বেশী, তাঁদের বৃত্তির জন্যে একটা মোটা রকমের তহবিল তৈরী না করলে শেষে অসুবিধায় পড়তে হবে। রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। যে রাজ্য তাঁরা খাস করে নিলেন, তার রাজস্ব থেকে পরিজনদের বৃত্তিদানের ব্যাপারটা ভবিষ্যতের গর্ভে রেখে, তাঁরা তাড়াতাড়ি মৃত রাজার রাজকীয় ঐশ্বর্য এবং সঞ্চিত মূল্যবান জহরত প্রভৃতি বিক্রয় করে ঐ তহবিল গড়বার জন্যে যে সব নিষ্ঠুর কাণ্ড করলেন, তার প্রত্যেকটি যে-কোন সভ্য জাতির পক্ষে অনন্তকালব্যাপী কলঙ্কময় দুষ্কৃতির মত বেদনাদায়ক স্মৃতি! ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে ভারতের হৃদয়হীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী সদম্ভে ফতোয়া দিলেন—রাণী ও রাজ-পরিজনদের যখন রাজ্যই রইল না, সে অবস্থায় আগেকার মত রাজকীয় আড়ম্বরও নিরর্থক। সুতরাং রাণীদের ব্যক্তিগত বসন-ভূষণ ও আসবাব-পত্রের অতিরিক্ত সব কিছুই নিলামে বিক্রয় করে সেই অর্থ তাঁদের জন্যই বৃত্তিদানের তহবিলে দেওয়া হবে। এই ফতোয়ার ফলও হলো মর্মান্তিক। ইংরেজ রেসিডেণ্ট সদলবলে নাগপুর প্রাসাদে হানা দিলেন ঠিক একদল হানাদার দস্যুর মত।

বিশাল প্রাসাদের বাহির ও ভিতর মহল থেকে দামী দামী যাবতীয় দুর্লভ আসবাব-পত্র তুলে এনে নাগপুরের বাজারে প্রকাশ্য ভাবে নিলাম ডেকে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হলো। মণি-মুক্তা-খচিত আস্তরণ দেওয়া রাজকীয় শিবিকা, শকট, হাতী-শালার যাবতীয় হাতী, ঘোড়াশালার ঘোড়া—সব-কিছু উজাড় করে নিয়ে চললো সরকারী কর্ম্মচারীরা। সব চেয়ে মর্মান্তিক হলো—রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে ঘৃণ্য লুণ্ঠনকারীর মতনই যখন ইংরেজের তাঁবেদারগণ রাণীদের সমগ্র সঞ্চিত রত্নালঙ্কারের সঙ্গে স্ত্রী-ধন পর্যন্ত—তাঁদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল! রাজপুরীর মধ্যে যখন এই কাণ্ড চলতে থাকে, সেই সময় বৃদ্ধা রাজমাতা টলতে টলতে অন্দর মহলের অলিন্দের উপরে এসে দু'হাতে রেলিং ধরে ক্রোধে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে বলতে থাকেন: "ওরে, তোরা কি মরে গেছিস্···ভোঁসলা-বংশের এই লাঞ্ছনা দেখার চেয়ে ঘরে-ঘরে আগুন লাগিয়ে দে—সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক্।"

এর পর রাণীদের সেই সব দুর্মূল্য মণি-মুক্তা-জহরত প্রভৃতির ক্রেতা নাগপুরে মেলেনি বলে, সেগুলি কলকাতায় পাঠানো হয় বড়লাটের হুকুমে। ফলে, রাজ-পরিবারের ব্যবহৃত সেই সব মণিরত্ন কলকাতায় হ্যামিল্টন কোম্পানীর বিপণীর শোভা বর্দ্ধন করে।

মনে পড়লো সেতারার কথা। ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর—সেতারার শেষ নৃপতি প্রতাপজীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠা মহিষী

সগুণাবাঈ দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাও অগ্রাহ্য করে বাহুবলে ইংরাজ সরকার তাঁদের সেই মিত্ররাজ্যটিকে, অধীন রাজ্য ভেবে স্বরাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। রাণী সগুণাবাঈ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স দের দরবারে অভিযোগও করেছিলেন; কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিকারই করেন নাই।

সাতারার পরে সম্বলপুর, কেরৌলী ও আর্কটের অদৃষ্টেও একই দুর্ভোগ দেখা দিল। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রাজ্য—যেখানেই অপুত্রক অবস্থায় রাজা পরলোক গমন করেছেন, সেই রাজ্য একই নজীরে ইংরেজ সরকার খাস করে নিলেন। এমন কি চব্বিশ হাজার বর্গ-মাইল পরিমিত সুবিস্তীর্ণ অযোধ্যা রাজ্য কু-শাসনের অজুহাত দেখিয়ে নবাব ওয়াজিদ আলি শা'কে রাজ্য-চ্যুত করে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নজরবন্দী করে রাখা হলো। তার পর সেখানেও নাগপুরের মতই নবাব-প্রাসাদের গৃহসজ্জা, মূল্যবান বসন-ভূষণ, যান-বাহন, হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ-সম্পদ প্রভৃতি আমিনাবাদের বাজারে নিলামে বিক্রয় করা হলো কোম্পানীর কর্মচারীদের তত্বাবধানে। এখানেও নবাব ও নবাবের বহু বেগম ও পোষ্যদের বৃত্তির অনুকূলে এক ধনভাণ্ডার খোলা হয় এবং ধনসংগ্রহের অভিপ্রায়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাব-হারেমের অসূর্যম্পশ্যা মহিলাদের হারেমের বাইরে এনে তাঁদের নিজস্ব ধনসম্পত্তিও লুণ্ঠন করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি।

এই ভাবে এক-একটি স্বাধীন বা মিত্ররাজ্য আত্মসাৎ করে রাণী ও রাজপরিজনদের উপরে যে সব অসম্মানজনক আচরণ অনুষ্ঠিত হয় কোম্পানীর পক্ষ থেকে, তার মূলে শুধু যে রাজান্তঃপুরিকাদের মনে বেদনার জ্বালা ধরে তা নয়—নিখিল ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীই এর জন্যে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন ইংরেজ কোম্পানীর উদ্দেশ্যে।

উল্লিখিত রাজ্যগুলির ভাগ্য-বিপর্যয় কোন কোন ক্ষেত্রে ঝাঁসীর দুর্যোগের অনেক আগেই, আবার বা কোন কোনটির ঝাঁসীর বিপদের প্রাক্কালে বা কিছু পরেই ঘটেছিল। কিন্তু তাহলেও সেতারা, নাগপুর, সম্বলপুর, প্রভৃতির বিপর্যয় মহারাজ গঙ্গাধরের জীবিতকালেই অনুষ্ঠিত হয় এবং সে সময় রাণী লক্ষ্মীবাঈ নাগপুরের বৃদ্ধা রাজমাতার মর্ম-বাণী শুনে স্বামীকে বলেছিলেন—ইংরেজ যাদুকরের মত ভারতের মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই রঘুজী ভোঁসলার পরিজনদের এ অপমান নীরবে তারা দেখেছিল—রাজমাতার কান্না শুনেও মানুষগুলোর গায়ের রক্ত তেতে ওঠেনি! কিন্তু রাণী বোধ হয় সেদিন স্বপ্নেও ভাবেননি, ঝাঁসীর পরিণামও এক দিন এমনি হবে, আর সেদিন তাঁর কণ্ঠের জ্বালাময়ী স্বর ঝাঁসীর সন্তানদের দেহের রক্ত উত্তপ্ত করে তুললেও ইংরেজের যাদুদণ্ডের অলৌকিক প্রভাব তাদের প্রত্যেককে স্তব্ধ, স্তম্ভিত ও নির্বাক্ করে রাখবে!

রাণী বুঝলেন, মুখে যতই প্রতিবাদ করুন—ইংরেজের অন্যায়াচারের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান, তাতে কোন ফল হবে না; এর একমাত্র উপায় হচ্ছে—মুখের কথা রক্ষা করবার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। কিন্তু ক্ষুদ্র ঝাঁসীর মুষ্টিমেয় সেনাদল নিয়ে প্রবলপ্রতাপ ইংরেজের অজেয় রণবাহিনীর প্রতিরোধ করতে যাওয়া—দিগন্তবিসারী অগ্নি-তরঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই উন্মত্ততার পরিচায়ক। কিন্তু তথাপি, ইংরেজের এত বড় অন্যায় ও মিথ্যাচার সহ্য করে বেঁচে থাকাও ত তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের কথা নয়! এই অবস্থায় সহসা তাঁর মনে পড়ল—মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর উপদেষ্টা গুরু মহাত্মা রামদাস স্বামীর একটি পরম উপদেশ। তিনি বলেছিলেন—এক-মনে এক-প্রাণে এক-সত্ত্বা হোয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করলেই কাম্য লাভ হয়—সর্ব ফল পাওয়া যায়।......স্বামীজীর বাণী রাণীর মনে শান্তি দিল; তিনি বুঝলেন—পৃথিবীর সকল শক্তির উপরে যাঁর শক্তি, যে শক্তি সীমাহীন, অনন্ত, অপরিমিত, সেই পরম শক্তিমানের উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করা উচিত। তাই তিনিও সেই মহাশক্তির উপর নির্ভর করে মনের জ্বালা নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁর মনোবীণায় নূতন সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—'আরাধনা-বলে সর্বফল মিলে।' হৃত রাজ্যের শোক ভুলে তিনি তাঁর কুলদেবী পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মীর আরাধনায় মগ্ন হলেন।

১৮৫৪ অব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে লর্ড ডালহৌসীর নির্দ্ধারণ অনুসারে ঝাঁসী ইংরেজ শাসনাধীন রাজ্য বলে বিঘোষিত হলো। রাণী তাঁর সেনাদল এবং রাজ্যের কর্মচারীদিগকে ছয় মাসের বেতন পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করে সাশ্রুলোচনে সকলকে বিদায় দিলেন। বিবাহের পর বধূরূপে রাণী ঝাঁসী দুর্গসংলগ্ন রাজ-প্রাসাদে এসে স্বামীর সঙ্গে বরাবর বাস করেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর-বংশের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই প্রাসাদেই তিনি এ পর্যন্ত সগৌরবে অতিবাহিত করছিলেন। ইংরেজ সরকারের নির্দেশে এখন সেই দুর্গ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করে দুর্ভাগ্য দত্তক পুত্র দামোদরের হাত ধরে নগর-মধ্যবর্তী রাজ-প্রাসাদে বাস করতে তাঁকে বাধ্য হতে হলো। পিতা মোরপন্থ, দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এবং কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর রাণীর সঙ্গে নগর-প্রাসাদে চললেন। উপরন্তু ঝাঁসীর দুর্গপ্রাসাদে যে সব আশ্রিত এবং রাণীর সহচরীবৃন্দ এত কাল বাস করতেন—যাঁদের অন্য কোন অবলম্বনই ছিল না, রাজ্যহারা হয়েও রাণী তাঁদের কাউকে ত্যাগ করতে পারলেন না, তাঁরাও ভাগ্যহারা রাণীকেই তাদের সৌভাগ্যরূপিনী জেনে সাশ্রুলোচনে তাঁর অনুগমন করল। একদা যিনি জাঁকজমকে মিছিল করে প্রত্যহ নগর ভ্রমণ করতেন, এখন তাঁকে অনাড়ম্বরে আশ্রিত পরিজনবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে দুর্গপ্রাসাদ ত্যাগ করে নগরের পরিত্যক্ত উত্থান-বাটিকায় গমন করতে দেখে ঝাঁসীর অধিবাসীরা আর্তস্বরে রোদন করতে লাগল।

ইংরেজ সরকার রাণীর প্রতি এই মর্মে এক আদেশ জারী করেছিলেন যে, রাণী তাঁর সৈন্যদল ভেঙে দেবেন, এবং রাজকোষে গচ্ছিত ধন-রত্ন ও কেল্লার অস্ত্র-শস্ত্রাদির উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। রাণী বুঝেছিলেন, যে কোন কারণেই হোক, ইংরেজ সরকার তাঁর আত্মমর্যাদায় এখনো আঘাত করেন নাই—সম্ভবতঃ তাঁরা রাণীর গতিবিধি সন্তর্পণে লক্ষ্য করছিলেন। রাণীর আচরণে কোনরূপ ছিদ্রের সন্ধান পেলেই তাঁরা বাহ্যিক এই ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলে অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যচ্যুতা রাণীদের প্রতি যে অশিষ্ট ব্যবহার করেছেন. এখানেও তার অনুসরণে কুণ্ঠিত হবেন না। বুদ্ধিমতী রাণী অবস্থাটি উপলব্ধি করে, মনের ক্রোধ ও ক্ষোভ মনের মধ্যেই চেপে রেখে বর্ণে বর্ণে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনেই চললেন।

নগরমধ্যবর্তী প্রাসাদে প্রবেশ করেই রাণী তাঁর সঙ্গিনীদের সাহায্যে সংগোপনে এমন একটি কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন, যাতে তাঁর দূরদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের বিস্তীর্ণ উদ্যানে ঝাঁসী রাজ্যের চারিটি বিখ্যাত কামান অনেক দিন থেকেই স্থাপিত ছিল। প্রাসাদে প্রবেশ করেই রাণীর প্রথম কাজ হলো, সেই কামানগুলি যাতে ইংরেজের হাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। যেমন রাণীর সঙ্কল্প, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কাজ। বাগানের মধ্যে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে কামানগুলিকে লুকিয়ে ফেলা হলো। কামান ছাড়াও এই প্রাসাদে বহু অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। বিশ্বস্ত অনুচর ও সঙ্গিনীদের সাহায্যে রাণী সেগুলিও

এমন ভাবে সুকৌশলে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখলেন, যাতে নষ্ট না হয়ে যায় কিম্বা কারুর নজরেও না পড়ে। প্রাসাদের মধ্যে সুড়ঙ্গপথে অন্যের অগম্য বহু তয়খানা ছিল—সেইখানেই অস্ত্র-শস্ত্র সব সংগোপনে সুরক্ষিত হলো।

ঝাঁসী অধিকার করে ইংরেজ সরকার জনৈক কমিশনারের উপর তার শাসনভার অর্পণ করলেন। দেশীয় রাজ্য খাস করে অধিকৃত রাজ্যের রাজস্ব কি ভাবে সেই রাজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে জন সলিভান্ নামে জনৈক নিরপেক্ষ ইংরেজ সুধী 'এ প্লী ফর দি প্রিনসেস অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লর্ড ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্য আত্মসাৎ-নীতির এক নির্ভীক সমালোচনা করেন। ঐ সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ধূয়া ধরেই রাজ্যগুলি ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লর্ড ডালহৌসির আমলে তথাকথিত দেশীয় রাজ্যগুলির কি অবস্থা ঘটে, সেই কথাই সলিভান্ সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই ভাবে বিবৃত করেন:

কোন দেশীয় রাজ্য খাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই এক জন পদস্থ ইংরেজ কমিশনারের হাতে সেই রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করা হয়। তাঁর অধীনে কতিপয় কর্মচারী নিযুক্ত থাকে। প্রকারান্তরে সেই কমিশনারই রাজ্যের রাজার পদে বসে রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব করেন। রাজ্যের দরবারের অস্তিত্ব লোপ হয়; রাজ-কর্মচারিবর্গ এবং রাজার কয়েক সহস্র সৈন্যকে বরখাস্ত করার ফলে তারা বেকার অবস্থায় পতিত হয়। রাজধানীর পূর্ব

গৌরব আর থাকে না—ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি ও বিনাশ ঘটে। রাজ্যের প্রজাদের রাষ্ট্রীয় ধনসম্পত্তি লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, ইংরেজদের সব দিক দিয়েই উন্নতি হতে থাকে; তারা স্পঞ্জের মত ভারতের গঙ্গার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে ধনসম্পদ শোষণ করে টেমস্ নদীর তীরবর্তী বিলাত নগরে নিঃসৃত করে তারই ঐশ্বর্য বাড়াতে থাকে।

ঝাঁসী রাজ্য ইংরেজ-শাসনভুক্ত হওয়ায় তার অবস্থাও এমনি শোচনীয় হতে থাকে। ঝাঁসীর প্রজারা অল্প দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারে, রাণীর আমলে তারা কত সুখে ছিল, আর এখন তারা কি ভাবে ধনে-মানে-প্রাণে মরতে বসেছে।

ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করবার প্রাকালে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ঝাঁসীর রাজকোষ পরিদর্শন করে দেখলেন, সেখানে নগদ ছয় লক্ষ টাকা এবং বহু লক্ষ টাকার দুর্লভ রত্নালঙ্কার ও জহরত প্রভৃতি আছে। পলিটিক্যাল অফিসার প্রস্তাব করলেন—এ সমস্তই রাণীকে প্রদান করা হোক। কিন্তু বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর এ প্রস্তাব পছন্দ হলো না। তিনি বললেন যে, ঐ সম্পত্তি আইন অনুসারে মৃত মহারাজের দত্তক পুত্রেরই প্রাপ্য। তাঁর মতে, ভূতপূর্ব রাজার দত্তক পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত না হলেও, রাজার নিজস্ব ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃত হতে পারেন। এ অবস্থায় ঐ সম্পত্তি সরকারী ধনাগারে গচ্ছিত থাকবে এবং

দামোদর রাও প্রাপ্তবয়স্ক হলে সুদসমেত তাঁকে প্রত্যার্পণ করা হবে। বড়লাটের নির্দেশ মত পলিটিক্যাল এজেণ্ট রাণীকে এ কথা জানালেন এবং তাঁকে মাসিক যে হারে বৃত্তি দেওয়া হবে, তারও উল্লেখ করলেন।

রাণী ঐ গচ্ছিত টাকা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না ; তবে তাঁর জন্য মাসিক যে পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন ইংরেজ সরকার, তিনি ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রাণীর এই কঠোর মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে ইংরেজ অফিসারগণ স্তব্ধ হলেন।

কিন্তু ঝাঁসী রাজকোষের ঐ ছয় লক্ষ নগদ টাকা এবং বহু লক্ষ টাকার মণি-মুক্তা-জহরত প্রভৃতি ইংরেজ-সরকারের ধনাগারে চিরদিনের মতই গচ্ছিত থেকে যায়। তার কারণ, দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে—যদিও রাণীর তখন ভাগ্য-বিপর্যয় হয়েছিল—সে টাকা বা সম্পত্তির এক কপর্দকও পাননি। কেবল মাত্র—ঝাঁসী রাজ্য খাস হবার দু'বছর পরে রাজকুমার দামোদর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করলে, তাঁর উপনয়নের সময় একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে রাণী ঐ গচ্ছিত সম্পত্তি থেকে এক লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন। প্রথমে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হননি, শেষে অনেক বিবেচনার পর জানালেন যে, রাজ্যের চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ টাকার জন্য জামিনস্বরূপ দায়ী থাকতে সম্মত হলে এ টাকা দেওয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাব অত্যন্ত অবমাননাকর ভেবে প্রথমে রাণী সম্মত হননি, শেষে তাঁর পিতার

অনুরোধে তুচ্ছ এই ব্যাপারটি নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে মনোমালিন্য না করে প্রস্তাব মত রাজ্যের চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জামানতের অনুকূলেই রাণী এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন—যে টাকা তাঁর স্বামীর তহবিলজাত। ফলে, গচ্ছিত বহু লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র এই এক লক্ষ টাকাই এ পক্ষের হস্তগত হয়েছিল এবং সেই টাকায় রাণী দামোদরের যজ্ঞোপবীত ধারণ অনুষ্ঠানটি সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন করতে সমর্থ হলেন। ঝাঁসী রাজ্য খাস হবার পর রাণীর মনের অবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ম্যালিসন যে বর্ণনা করে গেছেন, তার মর্ম এইরূপ ঃ ঝাঁসী খাস হবার পর তিন বছরের মধ্যে রাণীর অন্তর শান্ত ভাব অবলম্বন করে নাই। তাঁর মনে সর্ব্বদাই এই ধারণা জাগরূক ছিল যে, ইংরেজরা তাঁর স্বামীর বংশের অবমাননা এবং তাঁর প্রতি অতি গর্হিত ব্যবহার করেছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর এই মনোবেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয় এবং তিনি বৈরনির্যাতন আকাঙ্ক্ষায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে এই ইংরেজ জাতিকে রাণী তাঁর পরম বৈরি জেনেই পূর্ণ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দেবতার দ্বারে ধর্ণা দিয়ে মনে মনে উপযুক্ত ক্ষণ গণনা করছিলেন। কায়মনো-প্রাণে মহালক্ষ্মীর অর্চনা করতে করতে রাণী তাঁর অন্তরের প্রার্থনা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিবেদন করেন—ইংরেজ কোম্পানীর অহমিকা চূর্ণ হোক, ভারতের সুদিন আবার ফিরে আসুক, ভারতবাসীর অন্তর থেকে বৈদেশিক মোহ বিলুপ্ত হোক্।

সিপাহী বিপ্লব ও বৈপ্লবিক জীবন

(১)

ওদিকে বিঠুরেও পেশোয়ার উত্তরাধিকারীদের ভাগ্যাকাশে অনুরূপ বিপর্যয় এসেছিল—ঝাঁসীর দুর্ঘটনার কয়েক বছর পূর্বেই। পিতা মোরপন্থের কাছেই রাণী পেশোয়ার মৃত্যুসংবাদ এবং সেই সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি-সর্ত ভঙ্গের কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হন। তখন রাণী নিজেই স্বামী শোকে অভিভূতা, বাইরের কোন ব্যাপারেই তিনি মন নিবিষ্ট করতে পারতেন না। তবুও বিঠুরের এই দুর্ঘটনা তাঁর মনে গভীর বেদনার সঞ্চার করে, নিজের মনেই তিনি ভাবতে থাকেন—যে-ইংরেজের প্রতি পেশোয়ার এত বিশ্বাস ও উচ্চ ধারণা ছিল, সেই ইংরেজ পেশোয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অত বড় ঐতিহাসিক সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলে তাঁর উত্তরাধিকারী দত্তকদিগকে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন? নানা সাহেবের সম্বন্ধেও রাণী শুনেছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে তিনি খুব মেলামেশা করে থাকেন, নানা ভাবেই ইংরেজের তোয়াজ করে আনন্দ পান, এমন কি তাদের সঙ্গে খানাপিনা করতেও নাকি বাধে না, অথচ, সেই নানা সাহেবকেই পৈতৃক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করল ইংরেজ? তাই তিনি গম্ভীর মুখে পিতাকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ইংরেজের এত বড় অন্যায় হিন্দুস্থানের লোক সহ্য করে গেল? কেউ কোন প্রতিবাদ করল না?' পন্থজী মৃদু হেসে উত্তর করেন—

'ইংরেজের অগ্নিগর্ভ কামান আর জবরদস্ত সেপাই যে দেশশুদ্ধ লোকের মুখ বন্ধ করে রেখেছে মা, প্রতিবাদ কে করবে?' রাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—'পেশোয়াজীর মুখ চেয়ে নানা ভাই ত ইংরেজের সঙ্গে খুব খাতির জমিয়েছিলেন শুনেছি, তবুও ইংরেজ এমনি করে তাঁদের সর্বনাশ সাধলে। এখন নানা সাহেব কি করবেন বাবা? অন্তত তাঁর ইংরেজ-মোহ ত কেটে গেছে?' মুখখানা ভার করে পন্থজী বলেন—'নানার প্রকৃতি বোঝাই মুস্কিল মা! আমরা এই খবর পেয়ে তাঁকে যখন সান্ত্বনা দিতে গেলাম, তাঁর মুখ দেখে কে বলবে যে তিনি এ ব্যাপারে ভেঙে পড়েছেন বা মনে কিছুমাত্র আঘাত পেয়েছেন! আমাদের দেখেই হো-হো করে হেসে বললেন—আমি জানতাম যে, পিতাজীর অতি-ভক্তির বখশিস্ এই ভাবেই ইংরেজ দেবে। তাই ঐ তসবিরখানার সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলাম—'পিতাজী, ওপর থেকে দেখুন, কোটি কোটি টাকা আয়ের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আট লাখ টাকার বৃত্তিতেই তুষ্ট হয়ে যে ইংরেজের সঙ্গে দোস্তী করেছিলেন, আমাদের ক'ভাইকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলতেন—ইংরেজকে তোয়াজ করতে যেন পাণ থেকে চুণটুকুও না খসাই; এখন দেখুন—আপনি চোখ বুজতে না বুজতে আপনার সেই ইংরেজ অত বড় জমকালো সন্ধিপত্রখানা চোতা কাগজের মতন ছিঁড়ে ফেললে। তবুও ইংরেজের ওপর বিশ্বাস হারাইনি—তেমনি তোয়াজ করেই চলিছি।' রাণী নিবিষ্ট মনে কথাগুলি শুনে সেদিন জিজ্ঞাসা করেন—

'পেশোয়া এখন স্বর্গে, তাঁর ভুল-ভ্রান্তির জন্যে ছেলেদেরই ভুগতে হবে। কিন্তু নানা ভাইয়ের ভুল কি এখনো ভাঙেনি বাবা?' পন্থজী উত্তর করেন—'তা জানি না মা, তবে তিনি ভারতের ইংরেজ সরকারের এই হুকুমের বিরুদ্ধে বিলেতের সরকারের কাছে নালিশ করবেন। তাঁর পক্ষ থেকে আজিমউল্লা বিলেতে যাবে ওঁর এজেণ্ট হয়ে।' রাণী জিজ্ঞাসা করেন—'আজিমউল্লাটি কে?' পন্থজী জানান—'নানা সাহেবের এক শিষ্য। ইংরেজের হোটেলে খানসামার কাজ করত এই আজিম। নানা ত ইদানীং ইংরেজী হোটেলে যাওয়া-আসা করতেন। সেখানে আজিমকে দেখে ভারি খুসি হন। ছেলেটি চালাক-চতুর, আর চটপটে। নানা তাকে বিঠুরে এনে নিজের হাতে তৈরী করেন; এক জন ইংরেজকে মাইনে করে রেখে ইংরিজী লেখাপড়া শেখান। সে-ই এখন নানার ডান হাত। নানা তাকেই বিলেতে পাঠাচ্ছেন ঐ ব্যাপারে তদ্বির করতে।' রাণী এ খবর শুনে চুপ করে থেকে জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন—'একেই বলে কালচক্রের গতি। মহামানী পেশোয়ার বংশধরকে আজ বৃত্তির জন্যে বিলেতের ইংরেজ দরবারে আর্জী পাঠাতে হচ্ছে। এক দিন ঐ বিলেতের রাজার দূত পেশোয়ার দরবারে কোঙ্কণ প্রদেশে বাণিজ্যের সনদ পাবার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে আর্জী জানিয়েছিল। নিয়তির কি বিচিত্র লীলা!'

বিচিত্র লীলাই বটে! একদা যে স্বনামধন্য পেশোয়া

বাজীরাও ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মত এক অজেয় রণবাহিনী চালনা করে সারা ভারতে শিহরণ তুলে পেশোয়া-চক্রকে সার্বভৌম শক্তির মর্যাদা দিয়েছিলেন—দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ, নিজাম চিন কিলিচ খাঁ আসফ শা, গুর্জরপতি নবাব সরবুলন্দ খাঁ, মালবেশ্বর গিরিধর রাও প্রমুখ তৎকালের পরাক্রান্ত শক্তিসমূহ পেশোয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করে যৌথ দানের সর্তে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই বংশের শেষ পেশোয়া ঐ মহান্ পেশোয়ার গৌরবান্বিত নাম গ্রহণ করে শুধু যে পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিরাট পুরুষের অপরাজেয় নামটিকে হীনতার বন্ধন পরিয়ে কলঙ্কিত করলেন তা নয়—সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানে মহান্ পেশোয়ার বিপুল প্রতিষ্ঠার ধ্বংসস্তূপের উপর ইংরেজের সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্তির বিজয়-পতাকা প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ হলেন, ১৮১৮ অব্দের অভিশপ্ত দিবসে। ১৭৫৭ অব্দে পলাশী যুদ্ধে স্বাধীন নবাবী আমলের অবসানে ভারতের মাটিতে ইংরেজ-প্রভুত্বের ভিত্তি ওঠে, আর—এরই ষাট বছর পরে ১৮১৮ অব্দে পেশোয়া-শক্তির পতনে সেই ভিত্তির উপর সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ তুলে ইংরেজ দিক্‌বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়। ১৮১৮ অব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পুরুষানুক্রমে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্তির বিনিময়ে সমগ্র রাজপাট ইংরেজের হাতে ছেড়ে দিলেন। চতুর ইংরেজ এই সামরিক জাতটাকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছিলেন। তাই সন্ধিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অতীত প্রতিপত্তির মোহ যাতে এই পরাজিত মারাঠা নৃপতিকে

পুনরুত্তেজিত না করে তোলে বা পুনরায় মারাঠা-চক্র সংগঠনে তিনি সমর্থ না হন, সে জন্য তাঁকে তাঁর পূর্ব রাজধানী পুণা থেকে অনেক তফাতে—কানপুর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী বিঠুর প্রদেশে—নূতন আবাস-ভবনে বসবাস করতে বাধ্য করলেন। এর পর দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন দিন তিনি হৃতরাজ্য উদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হননি, এমন কি ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্রেও যোগ দেননি—বরং সন্ধিপত্রে ব্রাহ্মণসুলভ প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে ইংরেজের বিপদে অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্যই করে এসেছেন বরাবর। বার্ষিক বৃত্তি ছাড়াও বিঠুর জায়গীরের বিপুল আয় থেকে তিনি অতুল ঐশ্বর্যশালী হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধন, প্রতিশ্রুতি, সন্ধিপত্র সব ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয় বাজীরাও অপুত্রক ছিলেন। বিঠুরে এসে তিনি পর পর কতিপয় দত্তক গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর দত্তক পুত্রের অনুকূলে এই ভাবে এক উইল করেন—'ধুন্দুপন্থ নানা আমার প্রথম পুত্র, গঙ্গাধর রাও আমার সর্বকনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র, এবং সদাশিব পন্থদাদা আমার দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুরঙ্গ রাওএর পুত্র—এই তিনটি আমার পুত্র ও একটি পৌত্র। আমার মৃত্যুর পর আমার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ধুন্দুপন্থ নানা মুখ্য-প্রধানরূপে আমার পেশোয়ার গদীর অদ্বিতীয় অধিপতি হবে। ১৮৩৯ অব্দের এই উইলে তিনি জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে

পেশোয়ার গদী এবং সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী বলে উল্লেখ করেন।

পণ্ডিত রামচন্দ্র পন্থ ছিলেন পেশোয়ার পরম বন্ধু এবং সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। পেশোয়ার মৃত্যুর পর উইল অনুসারে ইনি নানা সাহেবের পক্ষ থেকে বৃত্তিপ্রার্থী হলে বড়লাট লর্ড ডালহৌসী—দত্তক পুত্র বৃত্তিপ্রাপ্ত হতে পারেন না, এই অজুহাতে নানা সাহেবকে বৃত্তি হতে বঞ্চিত করে সন্ধিপত্রের সম্মান ও পূর্ব মিত্রতার গৌরব নষ্ট করলেন। অবশ্য, বিঠুরের জায়গীরে হস্তার্পণ করলেন না বটে, কিন্তু জায়গীরের অধিবাসীদিগকে ইংরেজের আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের অধীন বলে নির্দেশ দিলেন। অথচ, বিঠুরে এসে অবধি পেশোয়াই ছিলেন বিঠুর অঞ্চলের সর্বময় স্বাধীন অধিপতি।

মৃত্যুকালে পেশোয়া জ্যেষ্ঠ দত্তক নানা সাহেব এবং তাঁর কনিষ্ঠদের কাছে ডেকে বলে যান—রাজা হয়েও আমি রাজ্যহীন হয়ে চলেছি—রাজপাট তোমাদের জন্য রেখে যেতে পারলাম না। কিন্তু যে ধনসম্পত্তি ও সুনির্দিষ্ট বৃত্তি রেখে যাচ্ছি, নির্ঝঞ্ঝাটে রাজার হালেই বংশানুক্রমে তোমাদের জীবনযাত্রা চলবে—যদি ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রতি রেখে চলো।

ইংরেজের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে চলবার জন্যে পেশোয়া পুত্রদিগকে—বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র নানাকে প্রায়ই উপদেশ দিতেন। এর কারণ হচ্ছে, নানার প্রকৃতির দিকে চেয়ে কতকগুলি লক্ষণ দেখে পেশোয়া মধ্যে মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হতেন। পেশোয়া-

কুলের অতীত গৌরব ও প্রতিপত্তির দিকে নানার অনুরাগ পেশোয়ার চিত্তে সন্দেহের রেখাপাত করে। তিনি জানতেন যে, এই প্রকৃতির ছেলেরাই উত্তরকালে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। এরা কথা কম বলে, কিন্তু এদের কোন কোন কথা যেন অন্তর বিদ্ধ করে। এক কালের যোদ্ধা ও বিচক্ষণ রাজনীতিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নানার গম্ভীর প্রকৃতি ও দু'টি আয়ত চক্ষুর অস্বাভাবিক দীপ্তি বুঝি ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেই জন্যই তিনি প্রায়ই ইংরেজদের অসাধারণ শক্তি-সামর্থ ও রণনীতির সুখ্যাতি করে তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকবার জন্যে অনুরোধ করতেন নানাকে।

কে জানে কেন, নানা ইদানীং ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রীতিমত বজায় রেখেই চলছিলেন। পেশোয়াই অবশ্য এর সূচনা করে দেন। তাঁরই ব্যবস্থায় কানপুর থেকে এক-জন পাদরী বিঠুরে এসে নানাকে ইংরেজী শেখাতে থাকেন। নানার হাতের হস্তাক্ষর দেখে খুশি হয়ে পেশোয়া তাঁকে নিজের সেক্রেটারীর পদে বাহাল করেন। বন্ধুদের কাছে বলতে থাকেন—'পুরোনো সেক্রেটারীর চেয়ে নানা বেশী কাজের লোক। তাই ত বলি, ওদের বয়সে আমরা তলোয়ার চালিয়েছি, আর অদৃষ্টের ফেরে ওরা চালাচ্ছে কলম।' পিতার কথা শুনে নানার দুই চোখ জ্বলে ওঠে। একদা যে লোক লক্ষ লক্ষ সেনা চালনা করেছেন, একটা বিশাল রাজ্য চালনা করতেন যিনি, তাঁর মুখে আজ এই কথা! এ কি বৃত্তিভোগের পরিণাম? ইংরেজের টাকা কি এমনি করে মানুষকে যাদু করে?

কিন্তু এই সময় থেকে নানা মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে মনকে সবলে দমন করে নিজেকে কৃত্রিম ইচ্ছার তালে তালে চালাতে লাগলেন। এখন থেকে প্রায়ই তিনি কানপুরে যান, সেখানকার অফিসারদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেন খুব সহজে। নানার সুন্দর চেহারা, মিষ্ট কথা এবং তোষামোদে কানপুরের হোমরা-চোমড়া ইংরেজরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁর পীঠ চাপড়ে প্রশংসা করেন। পেশোয়ার কানেও এ খবর গিয়ে পৌঁছাত; তিনি তাতে খুবই সন্তুষ্ট হতেন। সবাই দেখে, নানা যেন জোর করে মুখের গাম্ভীর্যকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, এখন সে মুখ সর্বদাই হাস্যময়। কানপুরের ইংরেজ-ললনারা এই সদা-হাস্যমুখ সুদর্শন ছেলেটির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—নানার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তাদের কি আকুলি-ব্যাকুলি!

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পণ্ডিত রামচন্দ্র পন্থ যেদিন অত বড় দুঃসংবাদ বহন করে এনে নানাকে শোনালেন, তখনও তাঁর মুখে সেই অপরূপ হাসি! এত বড় বিপর্যয়ের আঘাত সাধারণ কথা নয়; কিন্তু নানাকে এ জন্য কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন বা বিপন্ন বুঝা গেল না! ইংরেজের তরফ থেকে এমন একটা আঘাত এক দিন আসবেই, তিনি যেন অনেক আগে থেকেই মনে মনে এটা ঠিক দিয়ে রেখেছিলেন। বিঠুরের যাঁরাই এই খবর পেয়ে নানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে, তাঁরা প্রত্যেককেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতেন এই হাস্যমুখ মানুষটির অপূর্ব মুখভঙ্গি দেখে।

কানপুরে ইংরেজদের ক্লাবেও এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেখানে নানার সঙ্গে প্রত্যেকেরই আলাপ। সন্ধ্যার সময় তাঁরা সমবেত হয়ে নানার দুর্ভাগ্যের কথাই আলোচনা করছেন, প্রত্যেকের মুখ বিষণ্ণ ; তাঁদের মনে হচ্ছিল, সরকার এ ভাবে সন্ধিপত্র ছিন্ন করে ইংরেজ জাতির সততা ও সত্যনিষ্ঠার কণ্ঠ ছিন্ন করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ধিপত্র লঙ্ঘনের কুখ্যাত দৃষ্টান্তরূপে এ ঘটনা অমর হয়ে থাকবে। এই আলোচনার মধ্যে হঠাৎ নানা এসে উপস্থিত। সেই সুদর্শন চেহারা, মনোহর বেশভুষা, মুখে সেই অম্লান হাসি। অবাক হয়ে সবাই চেয়ে থাকেন নানার মুখের দিকে।

বিহসিত মুখে নানা বললেন : ভালো করে ভোজের ব্যবস্থা হোক, আজকের ভোজের সব খরচ আমার।

নানার বিপদে সমবেদনার ভাষাও কারও মুখ দিয়ে আর নির্গত হতে চায় না, সবাই ভাবে—নানা কি তামাসা করছেন? এক জন ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন : এ কি কাণ্ড! লর্ড ডালহৌসীর সিদ্ধান্তের খবর পেয়েও…

ভদ্রলোকের কথা বন্ধ হয়ে যায়, সবটা বলতে বাধে। নানা তেমনি হাসিমুখে বলেন : তাতে কি হয়েছে? লর্ড ডালহৌসী কলকাতায়, আমরা কানপুরে। তিনি এখানে থাকলে, তাঁকেও আলাদা একটা ভোজ দিতাম।

জনৈক ইংরেজনন্দিনী মিহি সুরে বললেন : কিন্তু নানা, আপনার এত বড় বিপদের দিনে ··

কথাটায় বাধা দিয়ে নানা বলে উঠলেন : আজকের বিপদই হয়ত ভবিষ্যতের সম্পদকে ডেকে আনবে। আমি ও-সবের পরোয়া করি না মিস্! আনন্দ করুন, খালি আনন্দ।

সত্যই কানপুরের ক্লাবে সেদিন প্রমোদের প্রবাহ বহে গেল। নানাই তার ব্যয়ভার বহন করলেন। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাঙ্গ-মহলেও রীতিমত চাঞ্চল্য উঠল। তাঁরা বললেন : হয় লোকটা খুব চাপা, ক্ষতিটা গায়ে মারছে না; নয় ত, মৃত পেশোয়ার সঞ্চিত এত টাকা পেয়েছে—এত বড় ক্ষতিকে গ্রাহ্যই নেই!

কিন্তু নানার মনের সত্যকার ভাব বুঝি দেবতারও অনধিগম্য ছিল। সেই মজলিসে রূপসী শ্বেতাঙ্গিনীরা যখন হাসিমুখে কৌতুক করে তাঁকে ইণ্ডিয়ান কিউপিড বলে তারিফ করে, তারই মধ্যে নানার মুখ যেন হঠাৎ বদলে যায়, তাঁর সুন্দর চোখের কালো কালো দু'টি তারা সাপের চোখের মত জ্বলে ওঠে; আবার পরক্ষণে তিনি নিজেকে সামলে নেন। ভোজের পর অশ্বপৃষ্ঠে বিঠুরে ফেরবার সময় কত কথাই তিনি ভাবতে থাকেন; প্রাসাদে প্রবেশ করে চিত্রগৃহে পেশোয়া প্রথম বাজীরাওএর দৃপ্ত প্রতিকৃতির পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আবেগকম্পিত কণ্ঠে আহ্বান জানাতে থাকেন : নেমে এসো, নেমে এসো, হে আমার ইষ্ট, আশা আমার পূর্ণ করো!

(২)

এর পর নানাকে প্রায়ই গোপনে পরামর্শ করতে দেখা যায় নানা শ্রেণীর নূতন নূতন লোকের সঙ্গে—যে সব লোক বিঠুরের

নয়, কানপুরের নয়, কোথাকার লোক তারা, কে জানে। কি সব কথা নানার সঙ্গে তাদের হয় বাইরের সবার কাছেই তা অজ্ঞাত। এই সব লোকের যাতায়াত বাড়তে থাকলে ক্রমে সংশ্লিষ্ট মহল অর্থাৎ বিঠুরের লোকজন জানতে পারেন যে, নানা সাহেব এখন বাণিজ্যে নামছেন, দেশী-বিদেশী মালপত্রের আমদানী-রপ্তানীর কাজ চালাবেন ; সেই জন্যেই নানা শ্রেণীর অপরিচিত লোকজন তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করে। এই লোকজনদের মধ্যে ইংরেজদের হোটেলের এক খানসামাকে হঠাৎ দেখে অনেকেই চমৎকৃত হলো। নানা নাকি লোকটিকে পছন্দ করে এনেছেন এবং তাঁকে নিজের অন্তরঙ্গ করবার জন্যে সেই ভাবে তালিম দিচ্ছেন।

এই লোকটির নাম হচ্ছে আজিমউল্লা। জাতিতে মুসলমান। নানার সঙ্গে এর পরিচয়ের ব্যাপারটিও বেশ কৌতুকাবহ। একদিন নানা কানপুরে গেছেন ; তাঁকে দেখেই সেখানকার রেসিডেন্সীর ইংরেজ তরুণীরা সহর্ষে ঘিরে ফেলে বলল—'খাওয়াতে হবে নানা সাহেব।'

কেউ নানার কাছে খেতে চাইলে আর কথা নেই, তাকে না খাইয়ে নানা স্থির হতে পারেন না ; তাঁর জীবনে এ একটা মস্ত খেয়াল বা অভ্যাস। তরুণী বিবিদের নিয়ে নানা হোটেলে গিয়ে খানার ফরমাস দিলেন। নবাগত এক প্রিয়দর্শন তরুণ খানসামা টেবিলে খানার খাবার পরিবেষণ করছিল। তার সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি, মিষ্ট চেহারা, প্রতিভাদৃপ্ত মুখ ও বলিষ্ঠ

আকৃতি নানাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করল। ইংরেজ মেয়েরাও এই খা[illegible]ক সপ্রতিভ ভাবে তারিফ করতে লাগল। তার কেতাদুরস্ত হাবভাব, আর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলার কায়দা দেখে তারা ভারি খুশি। যে ক'টি তরুণী খানার টেবিলে সেদিন ছিলেন, প্রত্যেকেরই ইচ্ছা—এই লোকটিকে ভাঙিয়ে নিজেদের বাঙলোয় নিয়ে যান—বাবুর্চিখানার ভার এর উপরেই ছেড়ে দেন। কিন্তু খেতে খেতেই এঁদের অজ্ঞাতে নানা কি কলকাঠি টিপে দিলেন কে জানে—পরদিনই হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে খানসামাটি বিঠুরে নানার খাস-কামরায় এসে সেলাম করল, আর নানাও তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের সেরেস্তায় বাহাল করে নিলেন। লোকে জানল, নানার এজেন্ট হয়ে এই ব্যক্তি সওদা করতে বেরুবে, তাই নানা তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে লায়েক করে নিচ্ছেন। সে যাই হোক, পরদিন থেকেই নানা আজিমউল্লার কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন—ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা যাতে সে মোটামুটি রকমে শিখতে পারে।

বিঠুরে আসার পর দ্বিতীয় বাজীরাও বহু অর্থব্যয়ে এক বিশাল শিবমন্দির তৈরী করান। নানা এখন করলেন কি, এই মন্দিরটিকে সামনে রেখে এর পিছনে এক নিভৃত আবাস-ভবন নির্মাণ করিয়ে তার নাম রাখলেন 'ব্রহ্মাবর্ত।' এটিকে ছোট-খাটো একটি কেল্লা বললেও চলে। এই নিভৃত আবাসে এর পর নানার অন্তরঙ্গগণ সমবেত হতে থাকেন। নানার অন্তরঙ্গ

হওয়াও বড় সহজ কথা নয়; কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে নানা কাউকে আমল দেন না বা তার মুখদর্শনও করেন না। সুতরাং যাঁরা এই নিভৃত আবাস-ভবনে প্রবেশাধিকার পান, তাঁরা প্রত্যেকেই পরীক্ষা-সিদ্ধ এবং নানার মন্ত্রণা-সভার সদস্য। সাধারণে জানে, এই মনোরম আবাস-ভবনটি নানা তাঁর প্রণয়িনীর জন্যই নিজের রুচি অনুসারে নির্মাণ করিয়েছেন। কিন্তু অন্তরঙ্গগণ জেনেছেন যে, নানা ধুন্ধুপন্থজী দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাওএর আদর্শে নিজের কর্ম-জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথম বাজীরাও ছিলেন একাধারে নিপুণ যোদ্ধা, বিচক্ষণ সেনাপতি, সুদক্ষ হিসাব-নবিস, অসাধারণ বাগ্মী, বিখ্যাত রাজনীতিক—কূটনীতির অদ্ভুত সাধক এবং পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন পরম প্রেমিক। সে-যুগের শ্রেষ্ঠা রূপসী বুন্দেলা-রাজ ছত্রশালের মুসলমানী পত্নীর গর্ভজাত রাজকন্যা মস্তানীর প্রতি তাঁর অপূর্ব প্রেম ও তার রহস্যময় কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে আছে। নানাও যথাশক্তি এবং বর্তমান কাল অনুযায়ী তৎপরতায় বাজীরাওয়ের কার্যাবলীর অনুসরণ করে আনন্দ পান, আর মন্ত্রগুপ্তি ব্যাপারে বুঝি বাজীরাওকেও অতিক্রম করতে সমর্থ হন। আর একটি ব্যাপারেও নানা কৃতকার্য হন—প্রেমিকা সংগ্রহে। পেশোয়া বাজীরাওএর মস্তানীর মত নানা ধুন্ধুপন্থের প্রিয়তমা প্রণয়িনী আদ্লার কাহিনীও ইতিহাস-বিশ্রুত। রূপে, গুণে, নাচে, গানে, দৈহিক শক্তি ও মস্তিষ্কের বুদ্ধি চালনায় এই তরুণীর কৃতিত্বও বিস্ময়াবহ।

মন্ত্রগুপ্তি-বিশারদ নানা অন্তরঙ্গদের সকলকেই সকল সময় মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হতেন, কিন্তু তাঁর প্রণয়িনী আদ্‌লা প্রত্যেক মন্ত্রণা-সভাতেই উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। নানার মনে এমন আশাও প্রচ্ছন্ন ছিল যে, পুণার দুর্গে পেশোয়ার বিজয়-পতাকা স্থাপিত করেই তিনি 'মস্তানী বাগে'র পাশে 'আদ্‌লা-বাগ' প্রতিষ্ঠা করে তাঁর প্রণয়িনীর স্মৃতিকেও কালজয়ী করবেন!

এখন বর্তমান প্রসংগে আসা যাক। ব্রহ্মাবর্তের মন্দির-মঞ্জিলে নানা যে-ভাবেই গুপ্ত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হোন না কেন, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির কোন অসদ্ভাব দেখা গেল না। কানপুরে প্রায়ই যান তিনি এবং পলিটিক্যাল এজেণ্টের মারফতে কলকাতায় বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর দরবারে লোক-দেখানো আবেদনও করেন—জব্দ-করা পৈতৃক বৃত্তি যাতে লাট বাহাদুর পুনর্মঞ্জুর করেন। অথচ, তিনি ভালো ভাবেই জানেন যে. তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হবে না—এ সরকার শক্তের ভক্ত, নরমের কথা কানে তুলতে অভ্যস্ত নন। নরম মাটি পেলেই বিড়ালে আঁচোড় দেয়। ইংরেজ জানে, তারা সন্ধি করেছিল যুদ্ধের পর যোদ্ধার সঙ্গে। সেই যোদ্ধার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি চুকে গেছে; আর সেই যোদ্ধার উত্তরাধিকারীকে তাঁরা কেরাণী বানিয়েছেন। এখন কেরাণীর দরখাস্ত ছিঁড়ে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলাতে এ পক্ষ থেকে আর্তস্বরে বার বার ভিক্ষুকের চীৎকারই উঠবে, সে চীৎকারে কান না

দিলেও কোন ক্ষতি নেই।...কথাগুলো মনে মনে ভাবেন নানা ; ভাবতে ভাবতে এক এক সময় তাঁর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে ; সঙ্গে সঙ্গে অমনি পৈতৃক দীর্ঘ তরবারিখানি কোষমুক্ত করে পেশোয়া বাজীরাওএর আলেখ্যের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আপন মনে কত কি বলেন !

বছর দুই আজিমকে তালিম দিয়ে নানা এমন ভাবে তাকে তৈরী করে নিলেন যে, কে বলবে—এই লোক একদিন ইংরেজের হোটেলে খানসামার কাজ করত ! যে-হাতে একদিন সে ডিসে খাবার সাজিয়ে খানার টেবিলে ধরে দিত, এখন সে কলম ধরে সেই হাতে মুসাবিদা করে ; আবার প্রয়োজন হলে কলম কানে গুঁজে কোমরে বাঁধা খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে চালাতেও পিছপাও নয় ! হঠাৎ একদিন সকলে অবাক হয়ে শুনল যে, নানার পক্ষ থেকে আজিমউল্লা ইংলণ্ডে রওনা হচ্ছেন। উদ্দেশ্য, বড়লাট লর্ড ডালহৌসী নানার আর্জী সম্বন্ধে কোন সুবিচার না করায়, নানা আজিমকেই তাঁর প্রতিনিধি করে খরচপত্র দিয়ে বিলাতে পাঠাচ্ছেন—সেখানকার কাউন্সিলে আপীল করবার জন্য।

ঠিক এই সময় নানা ঝাঁসীর সর্বনাশের কথাও শুনলেন। রাণী যে ইংরেজের হাতে রাজপাট ছেড়ে দিয়ে এই অন্যায় উৎপীড়নের জন্য বিচার-ভার উপরের অদৃশ্য শক্তির উপর অর্পণ করে তাঁরই আরাধনায় দিন কাটাচ্ছেন, গুপ্তচরমুখে এ খবরও নানা জ্ঞাত হলেন। নানা জানেন, তেজস্বিনী রাণী লক্ষীবাঈ

তাঁর বাহ্যিক আচরণে প্রসন্না নন; নানা যে শৈশবের আদর্শ ভুলে কেরাণীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, এ খবর পেয়ে রাণী তাঁকে পরিহাস করতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ত আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, রাণী ত নানার মনের গূঢ়কথা কিছুই এ পর্যন্ত শোনেননি; শুধু এইটুকুই শুনেছেন তাঁর পিতার মুখে—নানার কথাবার্ত্তা, কার্যকলাপ সবই যেন রহস্যময়!

এমনি সময় নানার এক চিঠি এল রাণী লক্ষ্মীর কাছে। নানা সেই চিঠিতে লিখেছেন: তোমার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা শুনিছি। আমাদের অবস্থার চেয়ে তোমার অবস্থাটি আরও দুর্বিষহ। শুনলাম, তুমি বিশ্ববিধাতার দরবারে আবেদন জানিয়ে আধ্যাত্মিক তদ্বির করছ। আমি জানতাম যে, একদিন আমাদেরও এ অবস্থা হবে! কিন্তু পিতাজীকে ত বুঝানো সম্ভব হয়নি—পরলোকে গিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন ইংরেজ কি চীজ! তবে আমার পক্ষে বিধাতার দরবারে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবার অবসর নেই—তাই ইহলোকেই বোঝাপড়ার তদ্বির চালাতে হচ্ছে। তুমি নানাকে ইংরেজের পদলেহী বা প্রসাদলোলুপ জেনে মনে মনে অবজ্ঞা কর নিশ্চয়ই; কিন্তু নানার স্বরূপও তোমার অজানা নয়। পিতাজী বর্তমানে সেই রূপের উপরে একটা আবরণ দিতে হয়েছিল—সে আবরণ এখনো খুলিনি। যেদিন খুলে ফেলব, সারা হিন্দুস্থান সেদিন টলমল করে উঠবে জেনো। এখনো আমাকে অভিনয় করতে হচ্ছে; সেই জন্যে আমার এক বিশ্বাসী এজেন্টকে বিলাতে পাঠাচ্ছি;

এর পিছনেও উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু দেশশুদ্ধ সবাই জনেবে যে, ভারত-সরকার কর্তৃক জব্দ করা পৈতৃক বৃত্তি পুনঃ প্রাপ্তি সম্পর্কে বিলাতের ইংরেজ-দরবারে আপীল করতেই নানা সাহেব তাঁর এক এজেণ্টকে সেখানে পাঠাচ্ছেন। আমি তোমাকে এখনি বলছি—আপীলেও আমি হারবো ; কিন্তু সেইটে সারা দুনিয়াকে জানানোই দরকার হয়েছে। এখন আমার মনে হয়, তোমারও উচিত এই সঙ্গে একজন এজেণ্ট পাঠিয়ে বিলেতে আপীল করে ওদের প্রধান ধর্মাধিকরণকে নেড়ে-চেড়ে দেখে নেওয়া।

নানার পত্র পড়ে রাণী অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন ; পত্রের প্রতি ছত্রটি তাঁকে যেন উন্মনা করে তুলল। তবে কি তিনি নানাকে ভুল বুঝেছিলেন ? তবে কি শৈশবে এই প্রতিভাবান ছেলেটিকে দেখে তাঁর সম্বন্ধে যে সব আশা পোষণ করতেন, সে সব মিথ্যা নয় ? এইদিন থেকে রাণীর অন্তরেও যেন নূতন একটি উদ্দীপনা ধীরে ধীরে শিখা বিস্তার করতে লাগল। এর-পর রাণীও নানার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করলেন—বিলাতের কাউন্সিলে তাঁর তরফ থেকে এক অভিযোগ পাঠালেন উপযুক্ত লোকের মারফৎ। কিন্তু রাণী সেই অভিযোগ-পত্রে যা লিখলেন, তাঁর মত তেজস্বিনী নারীর পক্ষেই তা সম্ভব এবং সাজে। রাণী তাঁর দরখাস্তে জানালেন : ইংরেজ সরকার আমাদিগকে ঝাঁসী রাজ্য দান করেননি। দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের শাসনকালে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক পরা-

ক্রমের কাজ করার জন্যই ঝাঁসী রাজ্য মহান্ পেশোয়ার সৌজন্যে অর্জন করেছিলেন। সুতরাং ঝাঁসীর উপর ইংরেজ সরকারের কোন অধিকার নেই। ন্যায় ও ধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ জাতির কর্তব্য - ঝাঁসী রাজ্য তার বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করা।

কিন্তু এ আপীলে কোন ফল হয় নাই ; নানা যা বলেছিলেন, তাই বর্ণে বর্ণে পরে ফলে যায়। বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স লর্ড ডালহৌসীর হুকুমই বাহাল রাখেন নানার আবেদন সম্পর্কে। কিন্তু রাণীর আবেদনের কোন উত্তরই আসে নাই ভারতবর্ষে। সম্ভবতঃ রাণীর আবেদনের তেজোদৃপ্ত কথাগুলি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তারা পরিপাক করতে পারেননি। নানা কিন্তু যথাবিহিত সম্মান দেখিয়ে বিনীত ভাবেই আবেদন পত্র দায়ের করেছিলেন বিলাতের দরবারে।

বিলাতের কর্তৃপক্ষের রায় যেদিন নানা শুনলেন, মুসড়ে পড়লেন না—আর একবার কানপুরে গিয়ে হোটেলে আর একটা বড় রকমের ভোজ ইংরেজ-মহলকে খাইয়ে বাহোবা নিলেন।

এর পর ওদেশে মাস কয়েক ঘোরাঘুরির পর আজিমউল্লাও ফিরে এলেন ব্রহ্মাবর্তে ; সেই সঙ্গে অনেক খবরও সংগ্রহ করে আনলেন। নানা তখন কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব করতে বসলেন। ঝুনো কেরাণী ব'লে আগে থেকেই তিনি ইংরেজ-মহলে নাম কিনেছেন ; এখন থেকে সেই কেরাণীর কলমে নূতন রকমের মুসাবিদার উৎপত্তি হলো, বিলি হতে লাগলো

ভারতবর্ষের দিকে দিকে—যেখানে যত ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সেনাদের ছাউনি আছে। মীরাট, বেরিলি, দিল্লী, রোহিলখণ্ড, ঝাঁসী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, মায়—বাঙলা দেশের বহরমপুর ও ব্যারাকপুরের ছাউনি পর্যন্ত। এই মুসাবিদার সঙ্গে তৈরী হলো অদ্ভুত রকমের তুটো প্রতীক। এর ফলে সারা দেশ জুড়ে সুরু হলো আশ্চর্য রকমের এক মূক আন্দোলন। এমন অদ্ভুত আন্দোলনের কথা এর আগে আর কেউ কখনো শোনেনি; আর—কোন রকম সাড়া-শব্দ না তুলে নীরবে সংগোপনে এ ভাবে সারা দেশকে জাগিয়ে তুলতেও তুনিয়ার কোন দেশে কেউ কখনো দেখেনি। এ আন্দোলনে মুখের কথা নেই, হৈ-হুল্লোড় নেই; ধর-পাকড়ের পথে কাঁটা দিয়ে এ আন্দোলন চলল নদীর স্রোতের মত অবিশ্রান্ত বেগে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত—সংকেতময় তুটি বস্তু আর মৌখিক নির্দেশ বহন করে।

(৩)

সংকেতময় সেই তুটি বস্তু বা প্রতীক—দেশবাসীর চোখে অপূর্ব কিছু নয়, সকলেরই পরিচিত। আজ হয়তো তাদের পরিচিতি অনেকের কাছে হাসির বিষয় বলে মনে হবে। কিন্তু সেদিন হাসির বস্তু হয়ে তারা আসেনি—সত্য পীরের শিরণীর মত সে-যুগের হিন্দু ও মুসলমানকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে

অভিভূত করত। সেই বস্তু দুটির প্রথমটি হচ্ছে—চাপাটি, দ্বিতীয়টি— লাল পদ্ম।

এদের কোনটি সেদিন যাঁর হাতে এসে পৌঁছাত, তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেন। হাতে আসবা মাত্রই তার আসার তাৎপর্য বুঝতে পারতেন—এর পিছান ছিল এমন এক অভিসন্ধিমুলক পটভূমিকা···বছরের পর বছর ধরে যেটি প্রস্তুত হয়েছিল।

আটার তৈরী—ছোট একখানি থালার মত আয়তনে এক ইঞ্চি পুরুস্থূরু একখানি রুটি বা চাপাটি। সাধারণতঃ গ্রামের যিনি মোড়ল—তাঁরই হাতে এসে পড়ে এই চাপাটি, বহন করে আনেন পাশের গাঁয়ের যিনি মোড়ল—তিনি। চাপাটি আসবা মাত্রই মোড়ল বুছতে পারতেন যে, আসন্ন ঝড়ের এক পরম সংকেত বহন করে এনেছে এই পবিত্র বস্তুটি। এখন তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে, সমস্ত উত্তেজনাকে চেপে রেখে প্রাপ্ত চাপাটির মান রক্ষা করা।

চাপাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার মাতব্বর লোকজন সব ছুটে আসেন মোড়লের আলয়ে। মোড়লের পরিবর্তে সময়-বিশেষে ভিন্ন গ্রামের চৌকিদারও চাপাটি বহন করে আনেন—এই গ্রামের মোড়লকে দেবার উদ্দেশ্যে। মোড়ল তখন সেই চাপাটি ভেঙে টুকরো-টুকরো করে সমবেত সকলকে বিতরণ করেন; আর, দেবপ্রসাদ বা পীরের শিরণীর মত পবিত্র ভেবে সকলেই তার অংশ গ্রহণ করে ধন্য হন। এর পর সেখানেই

উক্ত চাপাটির একটু অংশের সঙ্গে মিশিয়ে নূতন চাপাটি প্রস্তুত করে পাশের গ্রামের মোড়লের হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। হয়, মোড়ল নিজেই নূতন চাপাটি নিয়ে যান, নতুবা গ্রামের চৌকিদারের উপর এ ভার অর্পিত হয়। সঙ্গে কোন বাণী নেই, চিঠি নেই, চাপাটি এমন একটা গাম্ভীর্যময় নীরব ভঙ্গিতে যায় যে, তার বক্তব্য বিষয় অনেক আগে থেকেই জানানো হয়ে আছে। চাপাটি পাবা মাত্র প্রাপক বুঝতে পারেন যে, কি উদ্দেশ্যে প্রেরক এই পবিত্র বস্তুটি পাঠিয়েছেন তাঁরই কাছে, আর এখন তাঁকে কি করতে হবে।

এই ভাবে বছরের পর বছর ধরে এই অদ্ভুত চাপাটি ঘুরে বেড়াতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম, পরগণার পর পরগণা, জেলার পর জেলা, প্রদেশের পর প্রদেশ অতিক্রম করে, এবং এর উদ্দেশ্য এমন ভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কেউ সন্দেহ করে না, জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনও মনে করে না, স্ব স্ব কর্তব্য ভেবেই বাঁধা-ধরা নির্দেশ অনুসারে কাজ করে যান। এই চাপাটি হাতে আসবা মাত্র তাঁরা বোঝেন এর সংকেত এবং এর স্রষ্টাদের আদেশ। কাজেই, কোন গ্রামে চাপাটি আসবা মাত্র সারা অঞ্চল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে—সেই সঙ্গে বিস্ময়জনক তৎপরতার সঙ্গে চাপাটি আসার কথা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এখন দ্বিতীয় প্রতীক—লাল পদ্মের কথায় আসা যাক। চাপাটি যেমন গণ-আন্দোলনের প্রতীকরূপে গ্রামের মোড়লের হাতে এসে ক্রমে-ক্রমে জনসাধারণের ভিতরে বিশেষ পরিচিত

হয়ে ওঠে—দেশের লোক এই দ্রব্যটি দেখেই বুঝতে পারে তার উদ্দেশ্য এবং নেতাদের সংকেত ও নির্দেশ ; পক্ষান্তরে তেমনি এই লাল পদ্ম ফুলটিও ইংরেজের সেনানিবাসে দেশীয় সিপাহী-মহলে উত্তেজনাময় এক চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে।

চাপাটি যেমন কোন বিশ্বস্ত দূত বা বাহক মারফত প্রথমে গ্রামের মোড়লের হাতে আসে এবং এই আসার মধ্যে থাকে শুধু একটি সংকেত, লাল পদ্মটিও এই ভাবে সেনানিবাসে ভারতীয় রেজিমেন্টের প্রধান দেশীয় অধ্যক্ষের হাতে এসে পড়ে। এর বাহক এমন দক্ষ ও চতুর ব্যক্তি যে, ঠিক স্থান ও উপযুক্ত সময় বুঝেই সেনাধ্যক্ষ্যের হাতে ফুলটি গুঁজে দেন ; আর—এমনি এই ফুলের প্রভাব ও সম্মোহনী শক্তি যে, যত বড় পদস্থ ও মানী অফিসার তিনি হোন না কেন—তখনি দেবতার নির্মাল্যের মতন ভক্তির সঙ্গে ফুলটি মাথায় ঠেকিয়ে তিনি কর্তব্যে অবহিত না হয়ে পারেন না। তাঁর দেহ-মন যেন ফুলের পরশে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে ; সেই সঙ্গে দেশাত্মবোধের প্রেরণা তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলে। এর পর তিনিও এমনি সন্তর্পণে প্রাপ্ত রক্তপদ্মটি তাঁর ঠিক অধস্তন কর্মচারীর হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হন। সেই কর্মচারীরও অনুরূপ শ্রদ্ধায় তাঁর পরবর্তী কর্মচারী বা সৈনিকের হাতে সঁপে দেন এই রহস্যময় লাল রঙের ফুলটি। এখানেও এই প্রকার আদান-প্রদানে কোন কথা নেই, প্রশ্ন ওঠে না, কেউ বিস্ময় বোধও করেন না—সত্যই যেন ব্যাপারটি আগে থেকে জানা

হয়ে আছে। এর পর এই ভাবে একে একে এই লাল পদ্ম দেশীয় রেজিমেণ্টের প্রত্যেক অফিসার ও সিপাহীর হাতে-হাতে ঘুরে আবার যথাস্থানে—সেই প্রধান অফিসার বা অধ্যক্ষের হাতে ফিরে আসে।

আশ্চর্য এই যে, যাঁরই হাতে গিয়ে লাল পদ্ম ওঠে তাঁরই দেহের শিরায়-শিরায় রক্তে যেন দোলা লাগে ; তাঁরা প্রত্যেকেই যেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে আকুল আগ্রহে এই লাল পদ্মটির পরম প্রতীক্ষা করছিলেন। এই পদ্ম যেন তাঁদের কানে-কানে জানিয়ে দিচ্ছে—'দিন আগত ঐ···তৈরী হও!' একটি মাত্র লাল পদ্ম, পাপড়ির নীচে পাপড়ি, রক্তের মত টুক্‌টুকে লাল রঙ তার ; কিন্তু কি তেজোময়এর প্রভাব, কি প্রোজ্জ্বল এর আভা,—এই পদ্ম যেন একসঙ্গে শুদ্ধি, বিজয় ও মুক্তির প্রতীক। এই লাল বস্তুটি যেন প্রাণবন্ত হয়ে রেজিমেণ্টের সমগ্র সিপাহীকে একদেহ একমন একপ্রাণ হতে প্রেরণা দিচ্ছে ; যেন উপনিষদের ভাষায় বলেছ—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্,

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।

অর্থাৎ—'তোমরা মিলিত হও, এক কথা বল, এক মত হও। মন্ত্র সব সমান, সমিতি সমান, চিত্ত ও মন সমান—এই সত্য তোমাদের উপলব্ধি হোক।' এই লাল ফুলটি ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক সেনা-ছাউনির বীর সিপাহীদের অন্তরে যেন প্রেরণা দিতে লাগল—সব লাল হয়ে যাবে শীগগির···সেদিন এলো বলে।

প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। এখনকার মতন তখনো দেশের চার দিকে যাওয়া-আসার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই, কলকাতার মত সহরেও ট্রাম-বাস-মটর-ট্যাক্সীর কল্পনাও কেউ করেন নাই। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত সবে মাত্র রেল-লাইন খোলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সংখ্যক দু'চারিখানি গাড়ী সেই নতুন রেলপথে যাতায়াত করে। মালপত্র আমদানী-রপ্তানী হয় জলপথে—নৌকায়, বড় বড় মহাজনী কিস্তীতে; স্থলপথে—উটের পাঠে, গরু-মোষের গাড়ীতে। দেশবাসীর দেহ তখন সবল, প্রায় প্রত্যেকেই শ্রম-সহিষ্ণু। ধনী ব্যক্তিদের কথা অবশ্য আলাদা—তাঁরা যানবাহনে যাতায়াত করতেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের লোকজন দশ-বিশ ক্রোশ পথ হেঁটেই পাড়ি দিতেন। দেশের এমন অবস্থায় তখন নানা সাহেবের মত দেশনায়কের মাথা থেকে নীরবে এহেন দেশব্যাপী আন্দোলন চালাবার কি অদ্ভুত ফন্দীই বেরিয়েছিল! সভা নেই, ব্যক্তৃতা নেই, হৈ-চৈ নেই,—ঘরে তৈরী করা একখানা চাপাটি, আর জলাশয় থেকে তোলা একটি ফুলের সাহায্যে বাঙলা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ বিশাল দেশের সাধারণ অধিবাসী এবং ইংরেজের সুরক্ষিত সেনানিবাসে রেজিমেণ্টের মধ্যে অদ্ভুত উপায়ে সকলের সহজে বোধগম্য সংকেত দ্বারা রটিয়ে দেওয়া হলো: ভাই সব, বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচার চরমে উঠেছে; ওদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার দিনও এসে পড়েছে, তোমরা তৈরী হয়ে থেকো—চরম আঘাত হানবার দিনও ক্ষণটির প্রতীক্ষা কর।

এমনি এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন নানা ধুন্ধুপন্থ—যিনি মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত নন, মনের মধ্যেই সুকঠোর সংকল্প চেপে রেখে তারই প্রেরণায় ইংরেজ কোম্পানীর ভারতজোড়া সাম্রাজ্যে একই সঙ্গে আগুন জ্বালাবার ইন্ধন প্রস্তুত করতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। সেই পরিকল্পনার যুগল ফল এই—চাপাটি ও লাল পদ্ম। অপূর্ব এই দু'টি ইন্ধন বীর-সাধক নানা সাহেবের দীর্ঘ সাধনাপ্রসূত পরিকল্পনার অদ্ভুত অবদান! আর, যাঁরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিষ্ঠার সঙ্গে এই ইন্ধন অবলম্বনে কার্যে ব্রতী হলেন—প্রত্যেকেই তাঁরা কর্মযোগী, দেশের মুক্তির জন্য আত্মত্যাগী বীর, অসাধারণ কৌশলী।

নূতন কোন অঞ্চলে এই চাপাটি ও লাল পদ্ম আসবার আগেই এঁদের মধ্য থেকে এমন সব কৃতী ব্যক্তির শুভাগমন হয়, যাঁরা এদুটি বস্তুর সংকেত-রহস্য প্রচারে অভিজ্ঞ এবং দেশমাতার পায়ে জীবন উৎসর্গ করেই এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মন বুঝে নানা ভাবে রূপসজ্জা করে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যান। কেউ হন জ্যোতিষী, কেউ সাজেন বাউল, কেউ আসেন কথক হয়ে। কিন্তু সবার লক্ষ্য থাকে—কথার কৌশলে ইংরেজ কোম্পানীর দেশব্যাপী অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে শেষে এই বলে আশ্বাস দেওয়া যে, ওদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে এসেছে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন হয়েছিল, ১৮৫৭ সালে হবে

তার পতন। বড়-বড় জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছেন—ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্বের পরমায়ু একশো বছর মাত্র; ১৮৫৮ সালেই শত বর্ষ হবে পূর্ণ। সারা দেশ চাইছে ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস হোক। এরই ধুয়া তুলে দেশের দিকে দিকে চাপাটি চলেছে। চাপাটি কথা বলে না, কথা শুনতেও চায় না; কিন্তু সে এলে আর তাকে দেখলেই বুঝতে হবে—ইংরেজ কোম্পানীর উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়েই সে হাজির হয়েছে—অমনি সকলেই মনে মনে কামনা করবে—কোম্পানীর পাপের রাজ্য ধ্বংস হোক; কিন্তু হুঁশিয়ার, মুখের কথায় কেউ কিছু বলবে না। মনে মনে সবাই তৈরী হবে—এক হবে মনে-প্রাণে। চাপাটির কণিকা মাত্র গ্রহণ করলেই মনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের বল পাবে।

এমন কথা শুনে কেউ কি আর স্থির থাকতে পারে? ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচার-কাহিনী দিনে দিনে শুনে শুনে তারা অধীর হয়ে উঠেছে। ঝাঁসীর রাণী, অযোধ্যার বেগম, নানা সাহেবের প্রতি এই কোম্পানীর অকথ্য অত্যাচারের অতিরঞ্জিত আখ্যান শুনে সব প্রদেশের অধিবাসীদের অন্তরে তখন ইংরেজ-বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হচ্ছে। এমনি সময় চাপাটির প্রসঙ্গ উঠতেই আনন্দে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রত্যেক অঞ্চলের বাসিন্দারা, উল্লাসের সুরে আকুতিপূর্ণ আহ্বান জানাতে থাকে অদেখা এই চাপাটির উদ্দেশে। সুতরাং এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, এর পর চাপাটি এলে কেন যে সে অঞ্চলের প্রায় সকলেই

মুখ বুজিয়ে নীরবে তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জানায়, আর তাদের মনের তলে-তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ইংরেজবিদ্বেষ ও দেশাত্মবোধের প্রবাহ প্রচণ্ড বেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। নিখিল ভারতের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই এমনি করে প্রেরণার সঞ্চার করছিলেন নানা সাহেবের সিদ্ধ হস্তে তৈরী এক-একটি নির্ভীক বাক্‌পটু বিচক্ষণ কর্মযোগী। চাপাটির আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এই ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন তাঁরা; কিন্তু চাপাটি যখন এলো তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গেছে; তখন আর কথা নেই, প্রচারের প্রচেষ্টা নেই, তার পিছনে আন্দোলন নেই, চাপাটি নিজেই তার কাজ করে চলেছে।

বিঠুরের ব্রহ্মাবর্ত প্রাসাদে এখন প্রত্যহ নানা সাহেবের বৈঠক বসে। দিল্লীর মসনদচ্যুত-বাদশাহ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ থেকে আরম্ভ করে তান্তিয়া তোপী, আরার বৃদ্ধ রাজা কুমার সিংহ, রয়ার খঞ্জ রাজা নৃপৎ সিংহ, শঙ্করপুরের রাণা বেণী সাধু, রোহিলখণ্ডের নবাব বাহাদুর খাঁ, ফয়জাবাদের বাগ্মী আলেম আহম্মদ শা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা সাহেব সংগোপনে সংযোগ স্থাপিত করে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। নানা সাহেবের বিশ্বস্ত দূতরূপে আজিমউল্লা প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এমন ভাবে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন যে, বিঠুরের প্রধান কেন্দ্র ব্রহ্মাবর্ত প্রাসাদ থেকে সর্বত্র বহু দূরবর্তী প্রত্যেক নেতা একই সময়ে সংকেত বাক্যে বৈঠকের কার্যক্রম জ্ঞাত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনে

সমর্থ হন। বছরের পর বছর ধরে এক বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলনের এরূপ অনাড়ম্বর প্রস্তুতি সত্যই বিস্ময়াবহ ঘটনা।

এই সময় ইউরোপে রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এবং প্রায় একই সময় চীনেও সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘটায়, ভারতে বেশী ইংরেজ সৈন্য রাখা সম্ভবপর ছিল না; ভারতীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও ইউরোপে নিবদ্ধ থাকে। বিপ্লবী নেতৃবর্গ তৎপরতার সঙ্গে এই সুযোগটুকু গ্রহণ করলেন। তাঁরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলেন যে, সে সময় ভারতে ইউরোপীয় সৈন্য-সংখ্যা চল্লিশ হাজার মাত্র; কিন্তু ভারতীয় সিপাহী সেনা সংখ্যায় প্রায় সওয়া দুই লক্ষ। বিপ্লবী নেতৃবর্গ ভারতের সেনানিবাসগুলিতে লাল পদ্মের সাহায্যে প্রস্তুতির সংকেত দিয়ে এই সেনাবাহিনীকে আয়ত্ত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। একই দিনে একই সময়ে বঙ্গদেশ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত সেনাবারিকে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করবার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা নানা সাহেব প্রস্তুত করে ফেললেন।

স্থির হলো—১৮৫৭ অব্দের ২৩শে জুন বেলা ঠিক বারোটার সময় একসঙ্গে ইংরেজের সমস্ত সেনানিবাস থেকে দেশীয় সিপাহীরা বিপ্লবীরূপে আক্রমণ আরম্ভ করবে এবং সরকারী মালখানা, কালেক্টরী, কেল্লা, বুরুজ প্রভৃতি দখল করে নেবে।

কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস—তার তিন মাস আগেই বাঙলা দেশের বুকেই ইংরেজের ব্যারাকের মাঠে সেই বহ্নি হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সেদিন—২৯শে মার্চের আর এক স্মরণীয় দিন।

(৪)

এই বছরের (১৮৫৭ ইং অব্দ) এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে নানা সাহেব লক্ষ্ণৌ থেকে কাল্পী, মীরাট, আম্বালা, বেরিলি, দিল্লী প্রভৃতি ভ্রমণ ও সেই-সেই স্থানের সহযোগী নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে বিঠুরে ফিরে এলেন। এই ভ্রমণকালে তিনি ঝাঁসীতে গিয়ে রাণী লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করেছেন—এমন কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। রাণী তখন একাগ্রচিত্তে মহাশক্তির আরাধনা করছেন তপস্বিনীর মত গভীর নিষ্ঠায়। নানা সম্ভবতঃ রাণীর সেই আরাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত করেন নাই। তিনি সে সময় ঝাঁসীতে উপস্থিত হলে সে খবর অপ্রকাশ থাকত না ; যেহেতু ঝাঁসীর শাসন-ব্যবস্থা তখন ইংরেজ সরকারের হাতে। কোনও প্রকারে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা, বিশেষতঃ এর উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে কোন তথ্য ইংরেজ সরকার জ্ঞাত হবার সুযোগ না পান—এ সম্বন্ধে নানা সাহেব ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি কাল্পী পরিদর্শনে এসেও কাল্পীর নিকটবর্ত্তী ঝাঁসীতে আসা সমীচীন মনে করেন নাই।

বিশেষ-বিশেষ স্থানগুলি পরিদর্শন করে নানা কি কলকাঠি টিপে দিয়ে গেলেন, তার কোন হদিশ পাওয়া গেল না বটে ; কিন্তু এর পরেই অভিনব এক গুজব রটে গেল দেশের সর্বত্র। বহুদিন থেকেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রেজিমেণ্টের সেনাদের রাইফেলে ব্যবহার করবার জন্য নূতন রকমের এক টোটা আবিষ্কার-কার্যে

ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় সেই টোটা ব্যবহারযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত হতেই তার নামকরণ হলো—'দমদম টোটা'। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই নূতন টোটা রেজিমেণ্টগুলিতে প্রচলনে যখন সচেষ্ট হয়েছেন, সেই সময় সিপাহী-মহলে প্রচারিত হলো যে, ইংরেজ সরকার ভারতীয় সিপাহীদিগকে খৃষ্টান করবার জন্য অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। এই নূতন 'দমদম টোটা' সেই চেষ্টারই একটি অঙ্গ। গরু ও শূকরের চামড়া ও চর্বি দিয়ে টোটা এমন কায়দার তৈরি করা হয়েছে যে, দাঁত দিয়ে এই টোটা কেটে বন্দুকে ভরতে হবে। এরই ফলে, হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক, উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের আর জাত থাকবে না—তখন সহজেই তারা খৃষ্টান হয়ে যাবে। একেই সিপাহীরা নানা কারণে সরকারের প্রতি প্রসন্ন ছিল না, এর উপর এই টোটার ব্যাপারে তারা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। খবরটা প্রায় একই সময় একইসঙ্গে ইংরেজদের রেজিমেণ্টগুলির ভারতীয় সিপাহী-মহলে প্রচারিত হওয়ায় সর্বত্রই দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। অন্তঃসলিলার মত যে স্রোত বালুর ভিতরে চাপা ছিল, তা ফুটে বেরুবার উপক্রম করল, ধূমায়িত বহ্নির শিখা নির্গত হলো। আর এমনি নিয়তির নির্বন্ধ—বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রেজিমেণ্টের বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের মর্মবাণী—সারা ভারতের রাজধানী কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠবর্তী ব্যারাকপুরের ছাউনী থেকে বেঙ্গল আর্মীর ভারতীয় সিপাহীরাই সর্বাগ্রে অগ্নির অক্ষরে প্রকাশ

করে দিল। নিশীথ রাতে ব্যারাকপুরের ইংরেজ অফিসারদের বাংলোর মধ্যে যখন নৃত্যোৎসব চলেছে, সেই সময় বাংলোর চালায় লাগল আগুন, উৎসব গেল ভেঙে—আর এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় বিস্মিত ইংরেজ অফিসারগণের অন্তরে প্রশ্ন জাগল—এমন দুঃসাহসিক কাজ করল কারা? সেনাব্যারাকের চালায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া ত বড় সাধারণ কথা নয়।

এই ঘটনার পরদিনই—ব্যারাকপুর থেকে একশ' মাইল তফাতে বহরমপুরে আর এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। বেঙ্গল আর্মীর ১৯নং রেজিমেণ্টকে ব্যারাকপুর থেকে বহরমপুরে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষ সেখানকার প্যারেড ময়দানে পরীক্ষামূলক ভাবে সর্বপ্রথম 'দমদম বুলেট' ব্যবহার করতে দিলেন। কিন্তু ভারতীয় সিপাহীরা সে টোটা ব্যবহার করা দূরের কথা, স্পর্শ করতেও সম্মত হলেন না। এই রেজিমেণ্টের ইংরেজ অফিসার সিপাহীদের এ রকম অবাধ্যতায় আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই আপত্তিকারী সৈনিকরা অসঙ্কোচেই জানাল যে, সরকার তাদের প্রত্যেককে স্বধর্মচ্যুত করে খৃষ্টান করবার মতলবে এই নূতন টোটার আমদানী করেছেন—গরু-শূকরের চর্বি ও চামড়া দিয়ে এর মোড়ক তৈরী, দাঁত দিয়ে মোড়ক কেটে বন্দুকে টোটা লাগাতে হবে, সরকারের এই রকম বেইমানী তারা বরদাস্ত করবে না। ইংরেজ অফিসার এ অবস্থায় প্যারেডের মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি বহরমপুর সেনানিবাসে, গিয়ে সেনানায়ক

কর্ণেল মিচেলকে ব্যাপারটা সব বললেন। তিনি কানাঘুষায় এর আগেই টোটা সংক্রান্ত গুজবের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু সেই টোটা পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করবার সময় যে সিপাহীরা এ ভাবে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে সাহস করবে, এমন ধারণাও তিনি করেন নাই। যাই হোক, সাহেব তখনি প্যারেডের মাঠে এসে মিলিটারী মেজাজে অবাধ্য সিপাহীদের ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করলেন; কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত। প্যারেডের মাঠে সমবেত সমস্ত সিপাহী একসঙ্গে তখন রুখে দাঁড়াল; তারা নির্ভীক্ কণ্ঠে জানিয়ে দিল যে, জান দেবে তারা, তবু এ টোটা স্পর্শ করবে না। কথার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের মুখের ভাবও তখন বদলে গেল। বিচক্ষণ সেনানী মিচেল সশস্ত্র যোদ্ধাদের এই দৃষ্টি চিনতেন; তিনি তাদের মুখের ভঙ্গি ও চোখের দীপ্তি দেখে বুঝলেন যে, এরা এখন আর আগেকার সেই ক্রীতদাসের মত আজ্ঞাধীন নেটিভ নয়—এখন যেন প্রত্যেকেই আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। তিনি তখনি সেদিনের মত প্যারেড বন্ধ করে সিপাহীদের ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। সিপাহীরা ব্যারাকে গেলেও তাদের সন্দেহ দূর হলো না, তারাও তলে-তলে তৈরী হতে লাগল। এর পর কর্ণেল মিচেল কলকাতায় বহরমপুরের সিপাহীদের অবাধ্যতার খবর পাঠালেন। কলকাতার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চিন্তিত হলেন। এ সময় কাছাকাছি কোথাও গোরা রেজিমেণ্ট ছিল না; সুতরাং সিপাহীরা যদি

সহসা বিদ্রোহ উপস্থিত করে, তাহলে ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ রেঙ্গুন থেকে ৮৪ সংখ্যক গোরা রেজিমেণ্ট আনবার ব্যবস্থা করেই কর্ণেল মিচেলকে জানালেন, তিনি যেন এক সপ্তাহ পরে বহরমপুরের অবাধ্য সিপাহীদিগকে ব্যারাকপুরে ফিরিয়ে আনেন—এখানে তাদের প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা হবে। কর্ণেল মিচেলই উক্ত সিপাহী-দিগকে ব্যারাকপুর থেকে বহরমপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত তিনি এর পর সিপাহীদের প্যারেড বন্ধ করে দিলেন, সুতরাং 'দমদম টোটা' ব্যবহারের কথাটা চাপা পড়ে গেল।

লর্ড ক্যানিং এই সময় ভারতের গবর্ণর জেনারেল এবং হিয়ারসে প্রধান সেনাপতি। বড়লাট লর্ড ক্যানিং জেনারেল হিয়ারসের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বহরমপুর থেকে সিপাহী রেজিমেণ্ট ব্যারাকপুরে পৌঁছবার পূর্বেই রেঙ্গুনের গোরা রেজিমেণ্ট কলকাতায় এসে উপস্থিত হবে। তখন তাঁদের প্রথম কাজ হবে ১৯ নং রেজিমেণ্টকে প্যারেডের মাঠে নিরস্ত্র করা। বহরমপুর থেকে ১৯ নং রেজিমেণ্ট ব্যারাকপুরের ছাউনীতে এসে পৌঁছবার পূর্বেই বর্মার গোরা সেনাদল এসে পড়ল। এর পর বহরমপুরের সিপাহীরা ব্যারাকপুরে আসবা মাত্রই তাদের মধ্যে সুকৌশলে এই খবরটা প্রচার করে দেওয়া হলো যে, কতৃপক্ষ বর্মা থেকে বিস্তর গোরা সৈন্য আনিয়েছেন—হুগলী নদীর উপরে সেনা-বোঝাই জাহাজ-

গুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। খবরটা ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ সেনা-নিবাসের সর্বত্র ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়ল। কানাঘুষায় এমন কথাও শোনা গেল যে, বহরমপুরে অবাধ্যতার জন্য ১৯ নং রেজিমেন্টকে সরকার সম্ভবত নিরস্ত্র করবেন, হয়ত আরো কঠোর শাস্তিও দিতে পারেন। এই খবর ও কানাঘুষা শুনে ১৯ নং রেজিমেন্টের সিপাহীরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যেও নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলেছে, সেই সময় মঙ্গল পাঁড়ে নামে বেঙ্গল আর্মীর ৩৪ সংখ্যক সেনাদলের এক তরুণ সিপাহী বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যারাকপুরের ঘটনা সবিশেষ শুনেছিলেন, তার পর সেই সূত্রে কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থাকে অত্যন্ত আপত্তি ও অবমাননাকর মনে করে তাঁদের ব্যবস্থাবলম্বনের পূর্বেই এই অত্যাচারী বেইমান সরকারকে সায়েস্তা করবার উদ্দেশে ২৯শে মার্চ প্রত্যূষে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাঁর আবাস-কক্ষ থেকে বেরিয়ে ব্যারাকের প্রাঙ্গণে এসে সহকর্মী সিপাহীদের আহ্বান করলেন—'ভাই সব! ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়ার দিন এসেছে, সবাই তোমরা হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এসো।'

এই ভাবে আহ্বান করতে-করতে তিনি ভারতীয় ব্যাণ্ড বা রণবাদ্য বাদকদের আস্তানার সামনে গিয়ে তাদের উদ্দেশে তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন—'ভাই সব! তোমরাও দল বেঁধে বেরিয়ে এসো, ব্যাণ্ড বাজাও; সিপাহীদের মাতিয়ে দাও।'

কিন্তু এই আকস্মিক ব্যাপারে ব্যারাকের সিপাহীরা হকচকিয়ে গেল, ব্যাণ্ডওয়ালারাও বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, মনে-মনে তারা উত্তেজিত হলেও এ অবস্থায় মঙ্গল পাঁড়ের মত এক সাধারণ সিপাহীর কথায় তারা দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলো না ; দু'-চার জন সিপাহী ইতস্ততঃ ভাবে ব্যারাকের প্রাঙ্গণে এলেও তারা নীরবে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল। এই সময় সার্জেণ্ট জেনারেল হুগসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মঙ্গল পাঁড়েকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন—যে কয় জন সিপাহী নীরবে বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঁড়িয়েছিল প্রাঙ্গণে, তাদের উদ্দেশ করে। কিন্তু তারা মঙ্গল পাঁড়ের আহ্বানে যেমন উদাসীন ছিল, সাহেবের আজ্ঞা পালন সম্বন্ধেও তেমনি উদাসীন রইল। সাহেব তখন ক্রোধে ধৈর্যচ্যুত হয়ে তর্জন করতে-করতে নিজেই ছুটলেন মঙ্গল পাঁড়েকে শায়েস্তা করবার উদ্দেশে। কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ের অস্ত্রাঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে সাহেবই ধরাশায়ী হলেন। এই সময় লেফটেনাণ্ট ব্যগ সুসজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে প্যারেড গ্রাউণ্ডে আসছিলেন। তিনি দূর থেকে এ-দৃশ্য দেখেই পাঁড়ের দিকে ঘোড়া ছোটালেন। কিন্তু পাঁড়ের কাছে পৌঁছবার আগেই পাঁড়ের গুলীতে জখম হয়ে ঘোড়া আরোহীকে নিয়ে পড়ে গেল। মঙ্গল পাঁড়ে তখন সুযোগ পেয়ে ছুটলেন ধরাশায়ী সাহেবের দিকে। সাহেবও তাড়াতাড়ি উঠে পাঁড়েকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলী ছুঁড়লেন, কিন্তু সে গুলী হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট। মঙ্গল পাঁড়ে তৎক্ষণাৎ তরবারি হস্তে ব্যগ সাহেবের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করে আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত মঙ্গল পাঁড়ের সুতীক্ষ্ণ তরবারি সাহেবের বাধা দানকে ব্যর্থ করে তাঁর বুকের উপর পড়ল, রক্তাপ্লুত দেহে ব্যগ সাহেব লুটিয়ে পড়লেন প্যারেডের মাঠে। এই সময় কর্ণেল হুইলার তফাৎ থেকে এই ব্যাপার দেখে মঙ্গল পাঁড়েকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সিপাহীদিগকে হুকুম দিলেন, কিন্তু সে হুকুমে কেউ কর্ণপাত করল না, বরং একজন সিপাহী দৃঢ় কণ্ঠে বলল—"পাঁড়েজী ব্রাহ্মণ, আমরা ওঁকে গ্রেপ্তার করতে অক্ষম।" কর্ণেল তখন সেনাপতির আবাস-ভবনের দিকে ছুটলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে সেনাপতি হিয়ারসে তাঁর দুই পুত্র ও একদল গোরা সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলেই আসছিলেন; কর্ণেল হুইলার তাঁকে হুগসন ও ব্যগ সাহেবের দুর্দশার কথা বললেন। মঙ্গল পাঁড়েও তখন উত্তেজিত ভাবে প্যারেডের মাঠে পদচারণা করতে-করতে তার সহযোগী সিপাহীদিগকে পূর্বের মত আহ্বান করছিলেন। সেনাপতি হিয়ারসেকে দেখেই পাঁড়েজী হাতের তরবারি কোষবদ্ধ করে বন্দুক নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ওদিকে সেনাপতি হিয়ারসের নির্দেশে গোরা সেনাদল মঙ্গল পাঁড়েকে ঘিরে ফেলল। পাঁড়ে ভেবেছিলেন এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে অন্যান্য সিপাহীরাও তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেবে, সদলবলে তিনি গোরাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু এর পরও কোনও সিপাহী তাঁকে সাহায্য করতে এল না দেখে, তিনি আর আক্রমণ বা আত্মরক্ষার চেষ্টা

না করে ফিরিঙ্গিদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মনাশই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে বন্দুকের চোঙা নিজের বুকে লাগিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন। আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে আহত হয়ে মঙ্গল পাঁড়ে মাটির উপর পড়ে গেলেন। তখন তাঁর রক্তাপ্লুত দেহ হাস-পাতালে পাঠান হলো।

এই ঘটনার পর বেঙ্গল আর্মীর ১৯ ও ৩৪ সংখ্যক কোম্পানীর যে সকল সিপাহী ব্যারাকপুরে ছিল তাদের নিরস্ত্রীকরণ করা হলো। ৮ই এপ্রিল তারিখে মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসী হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে এ খবর দাবানলের মত চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে, বাঙলার বুকে বিপ্লবের যে বহ্নি প্রথম শিখা বিস্তার করেছিল, সেই শিখা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা ইংরেজ সেনানায়ককে সংহার করে ব্যারাক পুড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব ঘোষণা করল। দেখতে-দেখতে বিহার, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দী ও কানপুরে এই বিপ্লব-বহ্নির লেলিহান-শিখা পরিব্যাপ্ত হলো।

কিন্তু সহসা এই বিপ্লবের অকাল বোধনে নানা সাহেব প্রমুখ নেতৃবর্গ স্তম্ভিত হলেন; তাঁদের সুচিন্তিত পরিকল্পনার দিনটি যে তিনটি মাস আগেই একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে এ ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তাঁরা সে ধারণা করেন নাই। কিন্তু প্রায়ই একই সঙ্গে দিকে-দিকে যখন আগুন জ্বলে উঠল, তখন তাঁরা বিজ্ঞের মত সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হলেন।

এই সূত্রে সর্বসমক্ষে নানা সাহেবকেও মুখোস খুলে ফেলতে হলো ; সেও এক চমকপ্রদ ঘটনা !

১৮৫৭ অব্দের জুন মাস। চার দিকেই সিপাহী বিপ্লবের বহ্নি জ্বলন্ত শিখা বিস্তার করে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। কানপুর তখন সেনাবাহিনীর একটা বড় ঘাঁটি। জেনারেল স্যার হিউ হুইলার এখানে সেনা-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ; কানপুরই তাঁর হেড কোয়ার্টার। ভারতীয় রেজিমেণ্টে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থেকে মাথার চুল পাকিয়েছেন ইনি—ভারতের বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের সঙ্গেও এঁর খুব সদ্ভাব ও সম্প্রীতি। এমন দুর্যোগেও আত্মশক্তি এবং বৃটিশ জাতির প্রভাবের উপর স্যার হিউ হুইলারের গভীর আস্থা ; তিনি জানালেন—ফুৎকারে এই বিদ্রোহ-বহ্নি নিবিয়ে দেবেন, ভারতীয়দের সহায় করেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সায়েস্তা করবেন।

কানপুর ছাউনিতে এসেই স্যার হিউ হুইলার নানা সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। নানার সঙ্গে আগে থেকেই তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন ; নানার বদান্যতা, জাঁকজমকপ্রিয়তার কাহিনী ও কানপুর ছাউনীর ইংরেজ নরনারীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কথা তাঁর অবিদিত ছিল না। ছাউনীর সিপাহী-বৃন্দ এবং এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপর নানার প্রভাবের কথাও তিনি শুনেছিলেন। সুতরাং এই সঙ্কট-সময়ে নানাকেই তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জেনে মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছিলেন। সেই সূত্রেই নানাকে আহ্বান।

নানাও বুঝি এমনি একটা সুযোগের প্রতীক্ষাই করছিলেন। সুবিধাবাদী এই ইংরেজ জঙ্গী পুরুষটিকে তিনি হাড়ে হাড়ে চিনতেন। ছাউনীর ইংরেজরা নানার সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ জেনে স্যার হিউ হুইলারের ক্ষোভের কোন কারণ ছিল না, কিন্তু কানপুর-প্রবাসিনী ইংরেজ ললনারা নানার প্রতি আকৃষ্ট ও গুণমুগ্ধ জেনে তিনি মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করতেন। স্যার হিউ হুইলারের ধারণা, মেয়েদের মুখ থেকে ঘরের এমন অনেক গুপ্ত খবর বেরিয়ে আসে, বাইরের ভিন্‌দেশী লোকের কাছে সে সব কথা ফাঁস হওয়া উচিত নয়। অবশ্য, অভিজ্ঞতা-সূত্রেই স্যার হুইলার এই তথ্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ, ভারতীয় সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি নানা খবর জানবার উদ্দেশ্যে স্যার হুইলার সম্ভ্রান্তবংশীয় এক ভারতীয় ললনাকে বিবাহ করেছিলেন। অনেকেই জানতেন যে, সেনাপতি সাহেবের আসল হাতিয়ার হচ্ছেন তাঁর ভারতীয়া পত্নী এমা। পূর্বের নাম যাই থাক, বিবাহিত-জীবনে তিনি এমিলি নামেই পরিচিতা ছিলেন। এই জন্যে নানাও স্যার হিউ হুইলারের প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও অন্তরে-অন্তরে গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

স্যার হিউ হুইলারের আহ্বান-পত্র পেয়েই নানা ছাউনীতে গিয়ে সাহেবকে সেলাম করে বললেন—'হঠাৎ অধীনের প্রতি সাহেবের এ অনুগ্রহ কেন? আহ্বানের উদ্দেশ্য জানাতে আজ্ঞা হোক।'

সাহেব তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে নানার করমর্দন করে পাশের আসনে বসিয়ে প্রথমেই নানা সাহেবের নিজের ও তাঁর পরিজনদের তবিয়তের খবর নিয়ে তার পর আসল কথা পাড়লেন। হঠাৎ কিছুটা উষ্মার ভঙ্গিতে বললেন: খবর শুনেছেন ত, কতকগুলো মতলববাজ খারাপ লোক ঝুটমুট রেজিমেন্টের সিপাহীদের বিগড়াতে আরম্ভ করেছে। জায়গায়-জায়গায় অল্প-বিস্তর হাঙ্গামাও হচ্ছে। ঐ বদমায়েসগুলো শায়েস্তা না হওয়া পর্যন্ত ট্রেজারীর চার্জ এখন মিলিটারীর উপর পড়েছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন, আমাকেও এখন কি রকম মুশকিলে পড়তে হয়েছে। এখন আপনি ত আমার মুশকিল আসান করেন।

নানা যেন আকাশ থেকে পড়লেন সাহেবের কথা শুনে। তিনিও মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: সে কি সাহেব! রেজিমেন্টের অধিনায়ক হয়ে আপনি মুশকিলে পড়েছেন, আর সেই মুশকিল আসান করবার জন্যে এই অধীনকে তলব করেছেন! এমন তাজ্জবের কথা ত কখনো শুনিনি!

সাহেব আম্‌তা আমতা করে বললেন: এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন—লুঠতরাজের ভয়ে এই প্রভিন্সের বিভিন্ন ট্রেজারীর বিস্তর টাকা কানপুরের ট্রেজারীতে জমা হয়েছে; যেহেতু, এই কানপুর সরকারের সব চেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি। আমরা শুনিছি, আপনি খুব হিসিবি মানুষ আছেন, আর আপনি

ত জানেন, আমি হচ্ছি জঙ্গী মানুষ—আমার কাজ তলোয়ার নিয়ে। তাই কোম্পানীর এই সঙ্কটের সময় আমরা আপনার উপরেই এখানকার মালখানা রক্ষার ভার দিতে চাই।

নানা এখন বিপন্নের মত মুখভঙ্গি করে সবিনয়ে বললেন : সাহেব ত জানেন আমি কেরাণী—কলম চালাই, মুসাবিদা করি। বড় দায়িত্বের ভার আমি কি করে নিতে পারি ?

স্যার হুইলার বললেন : আপনি পারবেন জেনেই এ ভার আপনাকে দিচ্ছি। কোম্পানীর এই বিপদের সময় আপনার কি উচিত নয় নানা ধুন্ধুপন্থজী, সর্বতোভাবে আমাদিগকে সাহায্য করা ?

নানাও অভিনেতার মত কৃত্রিম ভঙ্গিতে পুনরায় আপত্তি তুললেন : ভার ত দিচ্ছেন, কিন্তু যদি কোন হাঙ্গামা বাধে, সমস্ত প্রদেশের টাকাকড়ি এখানকার মালখানায় মজুত আছে খবর পেয়ে সিপাহীরাই লুটতরাজ করতে আসে, তখন কি করে আমি সামলাব ?

হুইলার সাহেব এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি প্রদর্শন করলেন : সে ভয় এখানে বিলকুল নেই ; বিদ্রোহীরা আপনার দেশবাসী ভাই আছে ; আপনি মালখানার চার্জ নিয়েছেন এ খবর জানতে পারলেই তারা এর ত্রিসীমায়ও আসবে না। আমরা উত্তমরূপে বিবেচনা না করে কোন কাজ করি না।

নানাও এবার গম্ভীর ভাবে বললেন : উত্তম—আমি সম্মত হলাম।

স্যার হিউ হুইলার নিশ্চিন্ত হলেন; নানাও প্রসন্ন মনে ব্রহ্মাবর্তের প্রাসাদে ফিরে এসে বিশিষ্ট সঙ্গীদের বললেন: বিধাতার কি বিচিত্র বিচার দেখ! আমরা তাঁকে দেখি না, কিন্তু কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। নানা সাহেবের আর্জি ভারত-সরকার শোনেননি, বৃটিশ সরকার গ্রাহ্য করেননি, কিন্তু উপরের ঐ অদৃশ্য সরকার সময় বুঝেই করলেন তার অনুকূলে এই ডিক্রীজারী—যার ফলে স্যার হিউ হুইলার সুড়-সুড় করে ইংরেজ কোম্পানীর মালখানার চাবি সেই নানা ধুন্ধুপন্থের হাতেই এই ভাবে তুলে দিলেন।

সেই দিনই কানপুরে বিপ্লবের বহ্নি-রেখা ফুটে উঠল—রণোন্মত্ত সিপাহীদের তর্জনে সমগ্র সহর প্রকম্পিত হলো। সময় বুঝে নানা ধুন্ধুপন্থও স্যার হিউ হুইলারকে জানালেন: প্রয়োজন বুঝে আজ মুখের মুখোস খুলে ফেলেছি স্যার হিউ হুইলার! আমার পিতার মৃত্যুর পর যে আর্জি করেছিলাম আপনার কোম্পানীর কাছে, তা গ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু উপর থেকে সর্বদর্শী পরমেশ্বর আমার সে আর্জি করেছেন মঞ্জুর; তাই, সুদে-আসলে পাওনা বুঝে নেবার জন্য কলম ছেড়ে ধরেছি তলোয়ার। সুতরাং আজ যে ভাবে মালখানার চাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, সেই ভাবে হিন্দুস্থান ছেড়ে দিয়ে ইউরোপে পাড়ি দিতে বলুন আপনার কোম্পানীকে। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে নানা ধুন্ধুপন্থের এই এখন মূল কথা—ইংরেজ বেনিয়া, হিন্দুস্থান ছোড় দো!

(৫)

নানা সাহেবের হুমকীর সঙ্গে সঙ্গে কানপুর সেনানিবাসের সমস্ত ভারতীয় সিপাহী দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ ও পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থের নামে জয়ধ্বনি তুলে প্যারেডের মাঠে সমবেত হলো। কানপুরের ইংরেজরা বুঝলেন, নানা সাহেব সময় বুঝে মুখ থেকে ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলেছেন, তিনি এখন কোম্পানী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে উদ্যত। এই লোককেই তাঁরা অতি উদার আত্মভোলা সাদাসিধে নিরীহ ও নির্বোধ মানুষ সাব্যস্ত করেছিলেন—আগেকার নানার সঙ্গে এখনকার নানার প্রকৃতির এ কি পার্থক্য!

স্যার হিউ হুইলার বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি সহরের সমস্ত ইংরেজ নরনারী ও সেনানিবাসের ইউরোপীয় সেনাদের নিয়ে সুদৃঢ় ইংলিশ ব্যারাকে আশ্রয় নিলেন। এদিকে, মালখানার সঙ্গে সমস্ত সহর নানা সাহেবের করায়ত্ত হলো। ইংলিশ ব্যারাক পরিবেষ্টন করে সিপাহীরা আক্রমণ আরম্ভ করল—নানা সাহেব অতি কষ্টে তাদের নিরস্ত করলেন।

এই সময় শুধু সিপাহী নয়—সমগ্র দেশবাসীর উদ্দেশে এই মর্মে লক্ষ-লক্ষ ঘোষণাপত্র প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে লাগল :

হে হিন্দুস্থানের সন্তানগণ! এসো—আমরা মিলিত হয়ে আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমিকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করি। হে ভারতের হিন্দু-মুসলমান! তোমরা আর ঘুমিয়ে থেক না; চোখ মেলে চেয়ে দেখ, জন্মভূমি হিন্দুস্থান

মুক্ত করবার জন্য দিকে-দিকে কি ভাবে স্বাধীনতা-যুদ্ধের বহ্নি জ্বলে উঠেছে! এই যুদ্ধে উঁচু-নীচুর তারতম্য নেই, কেউ এখানে সেনাপতি নয়—সবাই আমরা সৈনিক; সমান আমাদের পদবী, সমান আমাদের ইজ্জৎ ও সম্মান—দেশের জন্য যারা যুদ্ধ করে, প্রাণ বিসর্জন দেয়, তারা সকলেই এক!

ভারতবাসীর এই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে ইংরেজ সাধারণ একটা মিউটিনি বা সিপাহী বিদ্রোহ বলেই উল্লেখ করেছেন। যেহেতু, এ যুদ্ধে অতি কষ্টে জয়ী হবার পর ইংরেজই যুদ্ধের ইতিহাস লেখেন। যদি ইংরেজ হারতেন, তাহলে এর ইতিহাসও রূপান্তরিত হোত। সিপাহী বিপ্লবের পর এই বিপ্লব-সংক্রান্ত সঠিক বিবরণ প্রকাশ সম্পর্কে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এতই সতর্ক ও সচেতন ছিলেন যে, প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে প্রকৃত কাহিনী লিখে প্রকাশ করতে কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিক বা প্রত্যক্ষদর্শী সাহস পান নাই। তথাপি দুঃসাহসের বশবর্তী হয়ে যাঁরা এই সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে ইতিহাস লিখেছেন, ইংরেজ লেখকদের লিখিত বর্ণনার অনুসরণ ভিন্ন তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এখন, ইংরেজদের ভারত ত্যাগের পর সিপাহী বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ আমাদের ঘটেছে, তার ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইংরেজ আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি করেছিল, তা ঠিক নয়। কতকগুলি ভারতীয় সিপাহী ভুল বুঝে বিগড়ে গিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল—ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে তার কোন

যোগ ছিল না, ইংরেজ প্রচারিত এই বৃত্তান্ত এখন অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। দেশবাসী জেনেছেন, সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজ কর্তৃপক্ষের জবরদস্ত শাসন-জনিত লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই ভারতের নেতৃবর্গ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সেদিন বিদেশী শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে বিদ্রোহ না বলে ভারতভূমির মুক্তিকল্পে মুক্তিপাগল সন্তানদের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলেই আমরা গর্ববোধ করব।

এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের পতাকাতলে সেদিন হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন; বিদেশী শাসকের হাত থেকে স্বদেশের শাসনদণ্ড কেড়ে নেবার জন্যে দুই সম্প্রদায়ই সমান ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। হিন্দুর মনে এমন ধারণা হয়নি যে, মুসলমানকে বাদ দিয়ে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, পক্ষান্তরে হিন্দুকে বঞ্চিত করে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনাও কোন মুসলমান করেননি। এমন কি, হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই দিল্লীর বাদশাহ-বংশধর পেন্সনভোগী বাহাদুর শাহকে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ব্বাধিনায়ক স্বীকার করেই যুদ্ধে নেমেছিলেন। যদিও নানা সাহেব ছিলেন এই মহাবিপ্লবের প্রবর্ত্তক ও অগ্রনায়ক, তাঁরই মস্তকপ্রসূত ও পরিকল্পনায় এর বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং বৃটির-শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মোগল-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করে মারাঠা-শক্তিই সারা ভারতে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিল, তা সত্বেও নানা সাহেব নিজেই বর্ষীয়ান্ বাদশাহ-

বংশধর বাহাদুর শাহকে স্বাধীন ভারতের সম্মানিত বাদশাহের মর্যাদা দিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। তাঁর এই মহানুভবতা অতুলনীয়।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসীর মন্দিরে মহাশক্তির আরাধনা করেন নিয়মানুবর্ত্তিতা ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রিয়তম স্বামীকে হারিয়েও তিনি যখন ভেঙ্গে না পড়ে স্বামীর নির্দেশ অনুসারে তাঁর রাজ্য ও প্রজাবর্গের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মচর্য পালনে আচারবতী হয়েও রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বিধবার পক্ষে করণীয় কেশমুণ্ডন বা বৈধব্য-বেশ ধারণে বিরত ছিলেন; কিন্তু তার জন্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত সাধনে কোন দিনই কুণ্ঠিত হননি। এই প্রায়শ্চিত্তও বড় সাধারণ কথা নয়; এ জন্য প্রত্যহ তাঁকে স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয়—তার পর তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়ে তুলসী গাছে জলদান ও তুলসী পাতায় ইষ্টদেবতার সুনির্দিষ্ট সংখ্যক নাম লিখে জলে বিসর্জন করা তাঁর নিত্য কাজ এবং এই প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ। এ ছাড়া পূজা, জপ ও শাস্ত্রানুশীলন তো আছেই। তাঁর রাজ্যশাসন ব্যবস্থার রীতি-নীতির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

দুর্বার সামরিক শক্তির প্রভাবে অহঙ্কারী ইংরেজের অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে যেদিন দৃপ্ত কণ্ঠে মৌখিক প্রতিবাদ মাত্র জানিয়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈ দুর্গ-প্রাসাদ ত্যাগ করে পুরাতন প্রাসাদে ফিরে এসে মহাশক্তির চরণতলে বিচার-প্রার্থিনী হন, তখন তিনি

অষ্টাদশ-বর্ষীয়া তরুণী মাত্র। সেদিন থেকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই মন্দিরের নিভৃত কক্ষে দেবীর আরাধনাতেই নিয়োজিত হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতীত হতে থাকে, রাণী লক্ষ্মীর আরাধনার শেষ নেই—নিষ্ঠাবতী পূজারিণীর মত একই ভাবে তিনি দেবীর আরাধনা করেন, মহাশক্তিকে জানান তাঁর অন্তর-বাণী। বীরাঙ্গনা তিনি, রাজ্ঞীরূপে দাম্ভিক ইংরেজের অন্যায় দাবীর উত্তরে তিনি যে বলেছিলেন—ঝাঁসী তিনি দেবেন না ইংরেজকে ছেড়ে; অথচ ঝাঁসীর সেই রাজপাটই তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছে, তাঁরই স্বামীর রাজ্য বাহুবলে শাসন করছে ইংরেজ কোম্পানী—রাজ্যত্যাগের পর সেই কণ্ঠবাণীই যেন অহরহ তাঁর সর্বাঙ্গে লৌহ-শলাকার মত বিদ্ধ হচ্ছে। এত বড় অন্যায়, এমন একটা জঘন্য অনাচার করেও সেই অনাচারীরা অক্ষত দেহে বিরাজ করছে। এ কি তাঁর পক্ষে কম বেদনার কথা—সর্বাঙ্গ যে তাঁর জ্বলে যাচ্ছে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের এই স্পর্দ্ধার তাপে। এর প্রতিকার না করে তো তিনি স্থির থাকতে পারেন না; তাই না শক্তি-মন্দিরে মহাশক্তির আরাধনা করছেন কায়মনোপ্রাণে!

যেদিন মহাশক্তির আসন টলে উঠল, ঝাঁসীর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে অসংখ্য কণ্ঠের বজ্রধ্বনি উঠল: ইংরেজ বেনিয়া, ঝাঁসী ছোড় দো—ঝাঁসীর মালিক রাণী লক্ষ্মীবাঈ!...সেদিন সেই রণ-হুঙ্কারে তপস্বিনী রাণীরও ধ্যান ভেঙ্গে গেল; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনলেন—বাঙলা দেশের এক ব্যারাক থেকে ইংরেজ

রেজিমেণ্টের এক ভারতীয় সিপাহী বিপ্লবী হয়ে যে আগুন জ্বেলেছে, সারা হিন্দুস্থানের ইংরেজ রেজিমেণ্টে তা ছড়িয়ে পড়েছে। ঝাঁসীর সেনা-ব্যারাকের সিপাহীরাও বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে ইংরেজের গ্রাস থেকে ঝাঁসী উদ্ধার করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে; তারা রাণীকে আবার সিংহাসনে বসাতে চায়। ঝাঁসীর রেজিমেণ্টের সমস্ত দেশীয় সিপাহী বিপ্লবীরূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে; গোরা সৈন্যদের সঙ্গে ঝাঁসীর সমস্ত ইংরেজ কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছে; তারা এখন অবরুদ্ধ। এদিকে, পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী সিপাহীরা রাণীর প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হয়ে রাণীর সহায়তাপ্রার্থী!

স্তব্ধ-বিস্ময়ে রাণী সব শুনলেন। ভাবলেন, তাঁর একান্ত আরাধনার ফলেই কি ইংরেজ কোম্পানীর বিশাল রণবাহিনীর মধ্যে এই ভাবে দারুণ অন্তর্বিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠল? তাহলে তো আর তাঁর পক্ষে দেবমন্দিরের নিভৃত কক্ষে ধ্যানমগ্ন থাকা সম্ভব নয়—মহাশক্তিই যে ধ্যান তাঁর ভেঙ্গে দিয়েছেন; অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিকার-প্রার্থিনী হয়েছিলেন; তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন মহাশক্তি; অত্যাচারীর দণ্ডের যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন শক্তিরূপা দেবী—এ সুযোগ তো তাঁর উপেক্ষা করা উচিত নয়! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেবীবন্দনা করে মহাশক্তির কাছে বিদায় নিয়ে দীর্ঘ তিন বছর পরে রাণী আবার এক অভিনব কর্তব্য পালনে অবহিত হলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর মাত্র।

এই সময় কাপ্তেন ডনলাপ ঝাঁসীর রেজিমেণ্টের অধিনায়ক, কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার স্কীন এই রাজ্যের কমিশনার ও সমগ্র রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্তা। লেফটন্যাণ্ট গর্ডন নামে জনৈক ইংরেজ অফিসার স্কীন সাহেবের সহকারী বা ডেপুটীরূপে ঝাঁসীতে নূতন এসেছেন। মীরাট, কানপুর, বেরিলী প্রভৃতি অঞ্চলের সিপাহীরা একসঙ্গে বিপ্লবী হলেও কমিশনার স্কীনের ধারণা ছিল, ঝাঁসীর সৈনিকরা সহজে বিগড়াবে না। তাঁরা খবর নিয়ে জেনেছিলেন, সিংহাসন ত্যাগের সময় ঝাঁসীর রাণীসাহেবা যদিও দিয়াশালায়ের কাঠির মত একবার জ্বলে উঠেছিলেন, কিন্তু তার পরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজ কি চীজ; সেই থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আর আর কোন রকম বেয়াদপির খবর তাঁরা পান নাই—সেই রাণী এখন দেওয়ানার মতন দেবালয়ে থাকেন, উপাসনা করে দিনযাপন করেন। যে সব রাজ্যে সিপাহীরা ক্ষেপে উঠেছে, সেই সব রাজ্যের পূর্বতন রাজবংশীয় ব্যক্তিদের কুমন্ত্রণাই তার জন্যে দায়ী। ঝাঁসীর ভূতপূর্ব রাণী যখন অবলা নারী ও বৈধব্যদশায় উদাসিনী, তখন ঝাঁসীর পল্টন বরাবরই ইংরেজের অনুগত থাকবে। তখনো পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে ভারতীয় সিপাহীদের প্রস্তুতির কথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জানতে পারেননি বলেই ঝাঁসীর সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করেছিলেন।

কিন্তু ২রা জুন সেনাবারিকের গোরাদের ঘরের চালায় হঠাৎ আগুন লাগতেই তাঁদের সেই ধারণা দূর হলো; সাহেবরা

বুঝলেন যে, বিপ্লবের বহ্নির ছোঁয়াচ এখানকার ব্যারাকেও এসেছে—এই অগ্নিক্রিয়া তারই আভাস মাত্র। তাঁরা খুব সতর্ক ভাবে রেজিমেণ্টের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এই ঘটনার পর ৪ঠা জুন একবারে হুলস্থুল কাণ্ড! ৩ নং পদাতিক পল্টনের গুরবক্স নামে এক হাবিলদার তার অধীনস্থ সিপাহীদের নিয়ে রণ-হুঙ্কার তুলে 'ষ্টার ফোর্টের' মধ্যে প্রবেশ করল। এই সুরক্ষিত ইমারতের মধ্যে রেজিমেণ্টের সমস্ত বন্দুক, গোলাগুলী, বারুদ ও রাজ্যের তহবিল থাকে। হঠাৎ এ-হেন ফোর্টটি অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপ্লবীদের হাতে পড়ায় রেজিমেণ্টের কর্তারা চোখে অন্ধকার দেখলেন।

সেনাধিনায়ক কাপ্তেন ডনলাপ ঐ ফোর্ট উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে রেজিমেণ্টের বাকি দেশী বিদেশী সমস্ত ফৌজ ব্যারাকের ময়দানে এনে প্যারেড করালেন। কাপ্তেন ডনলাপের সঙ্গে কমিশনার আলেকজাণ্ডার স্কীন, লেফট্‌ন্যাণ্ট গর্ডন প্রভৃতিও প্যারেডের স্থানে এলেন। কিন্তু প্যারেডের সময় ভারতীয় সিপাহীদের ভাবভঙ্গি দেখে তাঁরা প্রত্যেকেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও তারা প্যারেড করতে আপত্তি করেনি, কিন্তু তাহলেও তাদের মুখ ও চোখের ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা আর আগেকার মত বাধ্য বা অনুগত আদেশবাহী নয় —যে কোন মুহূর্তে বিগড়ে যেতে পারে।

এই সময় সেনানায়কের নির্দেশ মত লেফট্‌ন্যাণ্ট গর্ডন গোরাসৈনিকদিগকে চুপি-চুপি কেল্লার মধ্যে যাবার জন্যে হুকুম

দিলেন। ডনলাপ সিপাহীদের নিয়েই প্যারেড করতে থাকলেন। এরই মধ্যে গোরা সৈন্যরা কেল্লার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। ডনলাপ দেশী সিপাহীদের হাবিলদারদের বললেন: এদের এখন ব্যারাকে নিয়ে যাও; এর পর কি করা হবে সে হুকুম আমি শীঘ্রই জানাচ্ছি।

এই ব্যবস্থা করেই ডনলাপ ও স্কীন উভয়েই অশ্বারোহণে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করলেন। হাবিলদার ও সিপাহীরা সাহেবদের উদ্দেশ্য বুঝলেন যে, তাঁরা এঁদের প্রতি আস্থা হারিয়ে গোরা পল্টনকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে কেল্লার মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ হলেন। ভারতীয় সিপাহীরা তখন গুম হয়ে কেল্লার বাহিরে সেনা-ব্যারাকের মধ্যেই রইল। "ষ্টার ফোর্ট" উদ্ধারের আর কোন ব্যবস্থাই সেদিন হলো না। সিপাহীরাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহেবদের কার্যকলাপের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে, কেল্লার মধ্যে গিয়েই ডনলাপ সাহেব নো-গাঙ্গ নামক ছাউনীর গোরা রেজিমেন্টকে ঝাঁসীতে পাঠাবার জন্য এক বিশ্বস্ত সওয়ার পাঠালেন। কন্তু সে কথা ফাঁস হয়ে গেল। সেই সওয়ার নো-গাঙ্গের সেনানায়কের কাছে না গিয়ে বিপ্লবী পক্ষকে ব্যাপারটা বলে দিল। এমন ভাবে কাজটা হয়ে গেল যে, ডনলাপ কিছুই জানতে পারলেন না। নো-গাঙ্গের রেজিমেন্টের ভরসায় পরদিন সকালে ডনলাপ ও গর্ডন প্যারেডের মাঠে উপস্থিত হলেন। কেল্লা থেকে ব্যবস্থা করে গেলেন, নো-গাঙ্গ থেকে গোরা রেজিমেন্ট এসে পড়লেই কেল্লার গোরা ফৌজ তৈরী

হয়ে বেরিয়ে পড়বে। ফলে প্যারেডের মাঠে ভারতীয় সিপাহীরা দুদিক থেকে গোরা ফৌজের মাঝখানে পড়বে। কিন্তু সিপাহীরাও ব্যাপারটা বুঝে মতলব ঠিক করে রেখেছিল।

স্কীন সাহেব ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন নো-গাঙ্গের গোরা ফৌজকে এগিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে। এদিকে সেনানায়ক ডনলাপ ও লেফটেন্যান্ট গর্ডন ময়দানে সমবেত সিপাহীদিগকে কাওয়াজ (প্যারেড) করবার জন্য হুকুম দেবা মাত্র সামনের সিপাহীরা এগিয়ে এসে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ডনলাপ ও গর্ডনের উপরে। তাদের অস্ত্রাঘাতে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্যারেডের মাঠে নিহত হলেন। সিপাহীরা তখন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করতে লাগল: ফিরিঙ্গীদের নিপাত কর, নিপাত কর!

এন, সাইনটেলার নামে এক ইংরেজ অফিসার এই ব্যাপার দেখেই কমিশনার স্কীন সাহেবের সন্ধানে ছুটলেন। তিনি নগরোপকণ্ঠে নো-গাঙ্গের রেজিমেণ্টের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময় সাইনটেলার ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দুর্ঘটনার খবর দিল। স্কীন সাহেব তৎক্ষণাৎ সহরের ইংরেজ নর-নারীদের কেল্লায় আশ্রয় নেবার হুকুম জারি করলেন। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গেই সিপাহীদের বিগড়াবার খবর সহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক ইংরেজ-পরিবারে হাহাকার উঠল; হাতের কাজ ফেলে, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই ভাবেই সহরের সমস্ত ইংরেজ স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কেল্লার মধ্যে আশ্রয় নিতে ছুটলেন।

এ কাজ সম্পন্ন হতেই স্কীন সাহেবের আদেশে কেল্লার সিংহ-দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলো। স্থানে স্থানে বড়-বড় পাথর-খণ্ড এনে স্তূপাকার করে সাজিয়ে রাখা হলো। সিপাহীরা এ সময় সাহেবদের কাজে কোন রকম বাধা দিল না, কিম্বা কেল্লার উপর চড়াও হলো না। এই সুযোগে তারাও আর এক মারাত্মক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

ঝাঁসী সহর থেকে কয়েক ক্রোশ তফাতে নো-গাঙ্গের ছাউনীতে যে গোরা রেজিমেণ্ট ছিল, ঝাঁসীর সিপাহীরা প্যারেডের মাঠ থেকে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়েই সেই রেজি-মেণ্টের অপ্রস্তুত ও অসতর্ক গোরা সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় সকলকেই নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করল। এই হত্যা-কাণ্ডের পর তারা আরো উগ্র হয়ে উঠল; এইবার তারা রণ-হুঙ্কার তুলে ঝঞ্ঝার গতিতে সহরে ফিরে এসে কেল্লার দিকে ছুটল সেখানকার বিদেশীদিগকে সংহার করবার অভিপ্রায়ে।

কিন্তু হঠাৎ তাদের বিক্ষুব্ধ অন্তর-মধ্যে শুভবুদ্ধির সঞ্চার হলো। যে মহীয়সী নারী এই ঝাঁসীর প্রকৃত অধিশ্বরী—যাঁর শৌর্যময়ী দেবীমূর্তি তাদের চোখের উপর থেকে এখনো মুছে যায়নি—এই দুর্যোগের সময় তাঁকেই সহসা মনে পড়ে গেল। যে পাষণ্ড ইংরেজ তাঁর মত দেবীর রাজপাট কেড়ে নিয়ে তাঁকে দেওয়ানা বানিয়েছে, ইংরেজদের এই দুর্দিনে তিনি যদি তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেন—তাঁর লাঞ্ছনাকারী বিদেশীদিগকে কুকুরের মত হত্যা করবার জন্য তাদের

উপরে হুকুম দেন, তিনি যদি তাদের চালনা করেন—তবেই তাদের এই বিপ্লব সার্থক হবে।

যেমন চিন্তা অমনি কার্য। তৎক্ষণাৎ সেই রণোন্মত্ত বাহিনী উত্তেজিত কণ্ঠে 'রাণীমা'র নামে জয়ধ্বনি তুলে তাঁর প্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হলো। শত-সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল: 'ইংরেজ বেনিয়া—ঝাঁসী ছোড় দো! ঝাঁসীর মালিক রাণীজী লক্ষ্মীবাঈজী! জয় রাণী লক্ষ্মীবাঈজী কী জয়!'

উপাসনা-মগ্না রাণীর কর্ণে রণোন্মত্ত সিপাহীদের এই জয়ধ্বনিই দামামার ধ্বনির মত ঝঙ্কার তুলে তাঁর ধ্যান ভেঙে দেয়!

(৬)

বুদ্ধিমতী রাণী পিতা মোরপন্থজীকে আহ্বান করে এই আকস্মিক সিপাহী বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর মনে পড়ল, নানা ধুন্ধুপন্থের কথা। বিলাতে এজেন্ট পাঠাবার প্রক্কালে তিনি রাণীকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার কতিপয় ছত্র যেন রাণীর চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নানা সে পত্রে লিখেছিলেন—'শুনলাম, তুমি বিশ্ববিধাতার দরবারে আবেদন জানিয়ে আধ্যাত্মিক তদ্বির করছ; কিন্তু আমার পক্ষে বিধাতার দরবারে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবার অবসর নেই—তাই ইহলোকেই বোঝাপড়ার তদ্বির চালাতে হচ্ছে। এখনো একটা আবরণের মধ্যে থেকেই আমি নানা রকম তদ্বির করছি

কিন্তু যেদিন সেই আবরণ খুলে ফেলবো—সারা হিন্দুস্থান টলমল্ করে উঠবে জেনো।'

ভাবতে-ভাবতে রাণীর মনে হলো, নানা যেন নিজেই কথাগুলি তাঁকে শোনাচ্ছেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল ভাবে আপন মনে বলে উঠলেন: এর পিছনে নিশ্চয় কোন পাকা মাথার পরিকল্পনা আছে—সিপাহীদের এ বিপ্লব নিশ্চয়ই নিরর্থক নয়।

পন্থজী তখন জানালেন যে, যত দূর তিনি খবর পেয়েছেন, ইংরেজের বড়-বড় ছাউনীর সিপাহীরা বিগড়াতে আরম্ভ করেছে। এখন নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে। কথায়-কথায় তিনি চাপাটি, লাল পদ্ম ও নূতন টোটার প্রসঙ্গ তুলে বললেন—পিছনে নিশ্চয়ই বিশেষ চক্রান্ত আছে। সুতরাং রাণীর অনুমান যে সত্য, সে কথাও তাঁকে স্বীকার করতে হলো।

এর পর প্রশ্ন উঠল, রাণী এখন কি করবেন? সিপাহীরা কেল্লা অবরোধ করে রাণীকে তাদের নেত্রীরূপে পাবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছে; প্রাসাদের সামনে সমবেত হয়ে তারা চীৎকার করছে।

প্রাসাদ থেকেই রাণী তাদের রণ-হুঙ্কার শুনছিলেন। তারা সমস্বরে জানাচ্ছিল—রাণীজী আমাদের চালনা করুন; আমরা কেল্লার অবরোধ ভেঙে বেইমান ফিরিঙ্গীদের খতম করে আগেকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই।

রাণী কিন্তু তাদের রণ-হুঙ্কারে উত্তেজিত হলেন না। তিনি

সিপাহীদের কতিপয় নায়ককে আহ্বান করে এই বিপ্লবের মূল তত্ত্ব আবিষ্কারে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে সেদিনের নৃশংস ঘটনার সকল বৃত্তান্ত শুনেই তিনি একেবারে স্তম্ভিত হলেন। নিজের লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালার চেয়ে তাঁরই দেশের বীর সিপাহীদের নৃশংসতার জ্বালা যেন আরো তীব্র হয়ে তাঁকে বেদনা দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কঠিন হয়ে তিনি তাদের আচরণের নিন্দা করলেন, নিষ্ঠুর নৃশংস কাপুরুষ বলে সেদিনের হত্যাকারীদিগকে ধিক্‌কার দিতে লাগলেন। রাণী বললেন: তোমরা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে ইংরেজ সেনাপতি ও ছাউনীর গোরাদের সঙ্গে লড়াই করতে—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে তাদের বধ করতে পারতে, তাহলে আমি তোমাদের প্রশংসা করতুম। কিন্তু অপ্রস্তুত অসতর্ক সেনানায়ক, তাঁর সহকারী, এবং নো-গাঙ্গ ছাউনীর গোরাদের বধ করায় তোমাদের নৃশংসতাই প্রকাশ পেয়েছে, একে বীরত্ব বলা যায় না। এখনো তোমরা দুর্গে অবরুদ্ধ ইংরেজ নর-নারী এবং গোরা সৈনিকদের হত্যা করবার জন্য বদ্ধপরিকর! তোমরা ভেবেছ, ইংরেজের এই বিপদের সময় আমার প্রতি তাদের পূর্ব্বের অন্যায় আচরণ সব মনে করে আমার দেহের রক্তও নেচে উঠবে—আমি তোমাদের এই অনাচারে প্রশ্রয় দেব! তাহলে তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। এখন আমার কথা শোন—তোমরা উত্তেজনা ত্যাগ করে ছাউনীতে ফিরে যাও; কেল্লা অবরোধ করে রেখেছ ভালোই, কিন্তু কেল্লায় অবরুদ্ধ ইংরেজদের হত্যা করবার দুরাশা

তোমাদের ত্যাগ করতে হবে। সহরের বে-সামরিক ইংরেজ নর-নারী ও তাদের পুত্র-কন্যা প্রাণের ভয়ে কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছে, এ কথা ভুলে যেয়ো না। এ দুর্যোগের সময় মন স্থির করে শান্ত ভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই এখন আমাদের উচিত। তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে এখনই সম্ভবপর নয়, আমি এত দিন মন্দিরে পূজা-পাঠ নিয়েই ছিলাম, বাইরের ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংযোগই আমার ছিল না। আমাকেও এখন সমস্ত খবর জানতে হবে। আমি তোমাদের পুনরায় বলছি, তোমরা উত্তেজিত হয়ে কোন কাজ করবে না—সিপাহীরা যাতে লুঠতরাজ করে শান্তিভঙ্গ না করে, সেদিকে তোমাদেরই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। তোমরা এখন ছাউনীতেই ফিরে যাও।'

সিপাহীরা ভেবেছিল, তেজস্বিনী রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাদের বীরত্বে খুশি হয়ে বাহবা দেবেন, সানন্দে তাদের কাজের সমর্থন করবেন। কিন্তু এখন তাঁর মুখে এই ধরণের কথা শুনে তারা ক্ষুব্ধ হলো, অনেকে ক্রুদ্ধও হলো। তারা বলতে লাগল—রাজপাট হারাবার সঙ্গে সঙ্গে রাণী পূর্বের সে তেজও হারিয়ে ফেলেছেন। তাই এখন তিনি ফিরিঙ্গীদের দুষমন ভেবে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে নারাজী। কুচ পরোয়া নেই, আমরা রাণীকে বাদ দিয়েই লড়াই চালাবো—রাণীর ও সব কথা আমরা মানব না।

রাণীর প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে তারা রাণীর সম্বন্ধে রূঢ় মন্তব্য করতে লাগল। যে কয় জন উপরওয়ালা

সিপাহী রাণীর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাদের সংযত করতে পারলেন না। তাদের মুখে সেই এক কথা—যে আগুন আমরা জ্বেলেছি, তা কখনই নিজেদের হাতে নিবিয়ে দেব না; আমরা কোন অন্যায় করিনি ফিরিঙ্গীদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে। ওরা কি আমাদের মানুষ বলে ভাবত যে, ওদের ওপর দরদ দেখাব? ওরা হিন্দুস্থানের বাসিন্দাদের, হিন্দুস্থানী সিপাহীদের জানোয়ারের সামিল মনে করত, কি অন্যায় ওরা না করেছে! রাণীজী সে সব ভুলে গেলেও আমরা ভুলতে পারব না; আজ কায়দায় পেয়ে আমরাও ঐ বেইমান ফিরিঙ্গীগুলোকে জানোয়ার মনে করে কোতল করিছি, জবাই করিছি, তাতে হয়েছে কি?

এই ভাবে আলোচনা করতে-করতে হঠাৎ তারা একটা যুক্তি স্থির করে ফেলল; রাণী যদি তাদের চালনা না করেন, এই যুদ্ধে যোগ না দেন, তিনি যদি আগেকার কেল্লা মহল্লায় না গিয়ে সাবেক কালের অন্দরমহলেই থাকতে চান, তাহলে এখান থেকেই আমাদের মদত দিন—আমাদের খোরাকীর ব্যবস্থা করুন, টাকা দিন। নতুবা আমরা লুটপাট করে টাকা সংগ্রহ করব—রাণীজীকেও আমরা রেহাই দেব না।

তখনই তাদের প্রস্তাব নিয়ে এক সিপাহী এলো প্রাসাদে। রাণী তখন মন্দিরে গেছেন—মোরপন্থজী সেই প্রস্তাবের উত্তরে বললেন: রাণীজীর কাছে টাকা চেয়ে তোমরা ভুল করেছ। জানো তো, তাঁর রাজ্য এখন ইংরেজদের হাতে—রাজস্ব ওরাই

আদায় করছে; রাণীর জন্যে যে মাসোহারা বরাদ্দ করেছিল, উনি তা স্পর্শও করেননি। তোষাখানায় মজুত টাকাও ইংরেজ কোম্পানী তুলে নিয়ে গেছে। এ অবস্থায় রাণী কি করে তোমাদের আবদার রক্ষা করবেন? তোমরা রাণার কথামত এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ছাউনীতে যাও। তবে খোরাকীর কথা বা বললে, রাণী এ কথা শুনলে কখনই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না—সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। তার প্রয়োজন হলে তোমরা খবর দিও।

এই ভাবে উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়ে বিজ্ঞ প্রবীণ মোরপন্থজী সিপাহীদের কোনপ্রকারে শান্ত করতে সমর্থ হলেন; তারা দল-বদ্ধ হয়ে ছাউনীতে ফিরে গেল। রেজিমেণ্টের রসদখানা আগেই সিপাহীরা দখল করে নিয়েছিল—সুতরাং তাদের খাদ্য সম্পর্কে প্রার্থনাটি অবান্তর এবং রাণীর নিকট তাদের খাদ্য বা টাকার দাবী তাঁর প্রতি অভিমানেরই নামান্তর মাত্র।

কিন্তু মোরপন্থজী সিপাহীদের মনোভাবে আশ্বস্ত হতে পারলেন না। এ অবস্থায় রাণীর প্রাসাদ সুরক্ষিত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, রাণীর রাজত্বকালে এক দল শিক্ষিত ও অসমসাহসী সৈনিক মিছিল করে রাণীর অনুগমন করত; রাজ্যচ্যুত হবার পরও রাণী তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন—যদিও তাদের প্রাসাদে উপস্থিতির কোন প্রয়োজন ছিল না। রাণীর সেনাদলের অনেকেই ইংরেজের রেজিমেণ্টে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু এই বিশ্বস্ত দলটির কেউই

এ পর্যন্ত অন্য সরকারের চাকুরী স্বীকার করেনি। রাজ্যচ্যুত হয়ে রাণী যখন তাঁর এই বিশ্বস্ত সৈনিকগণকে অস্থায়ী ভাবে বিদায় দিয়েও তাদের বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেন, তৎকালে তাঁর পিতা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীবর্গ আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু রাণী তাতে গম্ভীর মুখে বলেন—'আমি বেশ জানি, ওরা আমাকে ত্যাগ করে আর কোথাও চাকুরী করতে পারবে না; তাই ওদের সম্বন্ধে আমারও কর্তব্য আছে।' আজ এই সঙ্কটকালে মোরপন্থজী দূরদর্শিনী রাণীর ব্যবস্থা উপলব্ধি করে চমৎকৃত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তালিকা দৃষ্টে রাণীর সেই বৃত্তিভোগী সৈনিকদের আহ্বান করে প্রাসাদ রক্ষার ভার দিলেন। তাদের সংখ্যা প্রায় দেড় শত; অবিলম্বে তারা সুসজ্জিত হয়ে রাণীর নামে জয়ধ্বনি তুলে প্রাসাদ রক্ষায় নিয়োজিত হলো।

পরদিন প্রত্যূষে নানা সাহেবের এক পত্র রাণীর হস্তগত হলো। রাণী সাগ্রহে এমনই কিছু বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতীক্ষা করছিলেন। নানা সাহেবের পূর্ব পত্রের সেই কথাগুলি সারা রাত্রি তাঁর অন্তরে নানারূপ চিন্তার সৃষ্টি করেছে। পত্র পাঠ করে তিনি বুঝলেন, সেই পত্রে সে দিন যে সব কথা নানা লিখেছিলেন, কিছুই অতিরঞ্জিত নয়। ইংরেজের সাম্রাজ্য বেষ্টন করে এই যে বিপ্লব-বহ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, তিনিই তার স্রষ্টা; তাঁরই দীর্ঘকালের নীরব প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা এত দিনে সার্থক হয়েছে। তবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দম্ভ এতই দুঃসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, অন্তরে-অন্তরে স্বাধীনতালিপ্সু

মুক্তিপাগল বীর সিপাহীদের পক্ষে আর ধৈর্য ধারণ সম্ভব হয় নাই, তাই পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্তুতির তিন মাস আগেই আকস্মিক ভাবে এই প্রচ্ছন্ন বিপ্লবের ধূমায়িত রূপ অগ্নিময়ী হয়ে ওঠে; তার পরই বিভিন্ন রেজিমেণ্টে সেই বহ্নি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। এখন কাশী, পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, মীরাট, বেরিলি, রোহিলখণ্ড, আগ্রা, দিল্লী, পেশোয়ার পর্যন্ত—যেখানে ইংরেজের যত সেনানিবাস আছে, একই অবস্থা; ইংরেজরা হয় সহর ছেড়ে পালাচ্ছে, নয় তো কেল্লার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আছে; আর ভারতীয় সিপাহীরা সমস্বরে চীৎকার করছে—'ইংরেজ বেনিয়া, ছোড় দো—হামরা হিন্দুস্থান।'

পত্রে নানা রাণীকে আরও লিখেছেন—'ইংরেজ কোম্পানীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে। কলম ছেড়ে আমি ধরেছি কৃপাণ—আর আমাদের শৈশব-বন্ধু নিরীহ তান্তিয়া টোপী সেরেস্তার নকলনবিশীর কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ফৌজ চালাচ্ছে। আমাদের বুঝি এখন নিশ্বাস ফেলবারও অবসর নেই। ঝাঁসীতেও আগুন জ্বলছে শুনেছি। ঝাঁসীর সিপাহীদের ঝাঁজ আরো বেশী; কেন না, তারা তোমার মত রাণীকে রাজপাট হারাতে দেখেছে। খুবই বাড়াবাড়ি তারা করবে জানি, কিন্তু তুমি তাদের সামলে ঝাঁসীকে তোমার তাঁবেয় রাখবার চেষ্টা করবে। আমরা যেন জেনে আশ্বস্ত হতে পারি—তুমি ঝাঁসীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছ। এ সুযোগ যেন ত্যাগ করো না।

তোমার আধ্যাত্মিক সাধনা সার্থক হয়েছে বলেই তুমি তোমার স্বামীর সিংহাসনে বসবার সুযোগ পাচ্ছ—এ কথা মনে রেখো। আমরা এখন দিল্লীর অভিমুখে চলেছি—সময়ে সাক্ষাৎ হবে।'

পত্রখানি পড়ে রাণী মনে মনে অনুতপ্ত হলেন। ভাবলেন, এই দেশপ্রেমিক অদ্ভুতকর্মা শক্তিধরকে আমি অমানুষ মনে করে কত রূঢ় কথাই বলেছি! চিঠিখানা ললাটে ঠেকিয়ে সযত্নে রেখে দিলেন। খানিক পরে মোরপন্থজী রাণীর ভূতপূর্ব দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওকে আনলেন রাণীর কাছে। রাণীর রাজ্যচ্যুতির পর রাওজী ইংরেজ সেরেস্তায় কাজ করতে বাধ্য হন। বর্তমান বিপ্লবের ফলে সেরেস্তার ইংরেজ কর্মচারীরা কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছেন, সেরেস্তা এখন বন্ধ।

বিচক্ষণ দেওয়ানকে দেখেই রাণী জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি আমাকে এখন কি পরামর্শ দিতে চান? সহরের অবস্থা দেখে আপনার কি মনে হয়?

রাওজী বললেন: আপনার প্রতি যে অবিচার ইংরেজ কোম্পানী করেছে, তারই শাস্তি দিয়েছেন পরমেশ্বর। কিন্তু এখন দায়ে পড়ে কেল্লা থেকে ইংরেজরা আপনারই অনুগ্রহ ও সাহায্য চেয়েছেন।

রাণী বললেন: কথাটা আরো স্পষ্ট করে বলুন।

দেওয়ানজী জানালেন: যদিও ইংরেজরা কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেখানে তাঁদের খাদ্যের অভাব—তাঁরা আপনার কাছে খাদ্য চেয়েছেন। ইংরেজ মেয়েরা জানিয়াছেন—তাঁদের

মান-ইজ্জত আপনাকেই রক্ষা করতে হবে; কেল্লায় তাঁরা নিরাপদ নন।

এ কথা শুনে করুণাময়ী রাণীর অন্তর বেদনায় ভরে গেল। তিনি সহানুভূতির স্বরে বললেন: আমি এখনি কেল্লায় খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু এমন ভাবে কৌশলে সাহায্য পাঠাতে হবে, সিপাহীরা যেন জানতে না পারে। আর—সাহেবদের বলবেন যে, আমি যদি সবাইকে আমার প্রাসাদে এনে আশ্রয় দিই, তাহলে সিপাহীরা কখনই তা সহ্য করবে না, তারা আমার প্রাসাদ আক্রমণ করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে, সাহেবদেরও প্রাণে মারবে। কিন্তু যদি ওঁদের নারী ও শিশুরা আমার প্রাসাদে আসতে সম্মত থাকেন, আমি নিরাপদে তাঁদের এখানে থাকবার বন্দোবস্ত করতে পারি—এখানে তাঁদের কোন অনিষ্ট হবে না। তার কারণ, নারী ও শিশুদের প্রতি অন্তত: চক্ষুলজ্জার খাতিরে কোন প্রকার অশিষ্টাচার করতে এরা সাহস পাবে না। তার পর আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কেল্লার সাহেবদের প্রতিও ওরা ভবিষ্যতে যাতে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করতে না পারে। কিন্তু সাহেবরাও, যেন মনে রাখেন, আমি সিপাহীদের কাজে উৎসাহ দিই নাই বলে এবং প্যারেডের মাঠে ও ছাউনীতে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার জন্য তিরস্কার করায়, তারা আমার প্রতিও প্রসন্ন নয়—আমার পক্ষেও এখন উভয় সঙ্কট অবস্থা।

সেই দিন থেকেই রাণী তাঁর নিপুণ অনুচরদের সাহায্যে সংগোপনে কেল্লার মধ্যে অবরুদ্ধ ইংরেজদের জন্য রুটি, মাখন,

পাক করা ডাল, ভাজি, দুধ ও ফল-মিষ্টাদি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। রাণী এ ভাবে আহার্য্য না পাঠালে গোরা সেনাদল ও অসামরিক সাহেবদের সপরিবারে অনশনে থাকতে হোত; কারণ, কেল্লার মধ্যে খাদ্য সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং তার অবকাশও সাহেবরা পান নাই।

সত্যই এ অবস্থায় রাণীর সমক্ষে উভয় সঙ্কট উপস্থিত হলো। এক দিকে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে সিপাহীরা তাঁরই নেত্রীত্ব প্রত্যাশী এবং এ যুদ্ধের প্রবর্তক নানা ধুন্ধুপন্থজীও তাঁকে প্ররোচিত করছেন। অন্য দিকে যে দাম্ভিক ইংরেজ কোম্পানী তাঁর যুক্তি প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বাহুবলে ঝাঁসী রাজ্য অধিকার করেছিল, এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তারা তাঁরই আশ্রয়প্রার্থী! ভারতের চিরন্তনী নৈতিক অবদান—মানবতার দিক দিয়ে গভীর বেদনশীল অনুভূতি এই মহীয়সী নারীকে অভিভূত করল, বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থী ইংরেজ নর-নারীদের বিরুদ্ধাচারিণী হতে এ অবস্থায় কিছুতেই তাঁর চিত্ত সাড়া দিল না; তিনি বিচক্ষণ দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওজীর মাধ্যমে তাঁর দুঃসাহসী অদ্ভুতকর্ম্মা সুবিশ্বস্ত অনুচরদের সাহায্যে কেল্লার মধ্যে অতি সন্তর্পণে সর্ববিধ সাহায্য পাঠাতে লাগলেন।

রাণী সিপাহীদের পক্ষ সমর্থন না করায় তারা ভগ্নোত্তম হয়ে পড়ল এবং ঘন-ঘন বৈঠক বসিয়ে কর্তব্য স্থির করতে লাগল। ওদিকে রাণীকে এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও উদাসীন দেখে রাণীর স্বামীবংশীয় সদাশিব রাও সিপাহীদের হাত করে

এই সুযোগে ঝাঁসীর গদী দখল করতে সচেষ্ট হলেন। ঝাঁসীর অপুত্রক মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে তাঁর কৌলিক সম্বন্ধ থাকায় মহারাজের মৃত্যুর পর তিনিও ঝাঁসীর এক দাবীদার ছিলেন। কিন্তু মহারাজ গঙ্গাধর মৃত্যুর পূর্বেই দত্তক গ্রহণ করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাঁর দাবীর পথ রুদ্ধ করে দিয়ে যান। রাণীর রাজত্ব কালেও এই সদাশিব রাও রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার উপদ্রব সৃষ্টি করে ইংরেজ সরকারের অন্তরে এই ধারণার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন যে, নারীর শাসনে কোন রাজ্য কখনো সুষ্ঠুভাবে শাসিত হতে পারে না। কিন্তু তেজস্বিনী রাণী লক্ষ্মীবাঈ পদে পদে সদাশিবের প্রয়াস-চালিত অশান্তি দমন করে নারীর শাসন-শক্তির প্রভাব দেখিয়ে দিয়েছিলেন সকলকে। অনেকে বলেন, সদাশিব রাওয়ের সেই অপপ্রয়াসের পিছনে ছিল ইংরেজের উস্কানি। সদাশিব-সৃষ্ট সেই উপদ্রবগুলির উল্লেখ করেই শঠতাপূর্বক ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন যে, রাণীর রাজ্য মধ্যে নানারূপ অশান্তি-উপদ্রব চলছে—যে জন্য শান্তিকামী ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন, পাছে তাঁর রাজ্য থেকে উৎপন্ন অশান্তি-বহ্নি ইংরেজ রাজ্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু রাণী দৃঢ় স্বরে ইংরেজের এই উক্তি অলীক প্রতিপন্ন করে ইংরেজ দূতকে অপ্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। তথাপি, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় নাই, রাণীকে গদী ত্যাগ করতেই হয়েছিল। রাণীর রাজ্যচ্যুতির পর এই সদাশিব রাও প্রচুর অর্থমূল্যে ঝাঁসীর গদী ক্রয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজও এই

স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষটিকে হাড়ে-হাড়ে চিনতেন, প্রয়োজনের খাতিরে তাঁকে সযত্নে তালিম দিলেও, নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থের মোহ ত্যাগ করতে পারেন নাই ; সুতরাং সদাশিব তখন কল্কে না পেয়ে ইংরেজদের উপর মনে-মনে খুবই চটেছিলেন। এখন সেই ইংরেজকে বিপন্ন দেখে, আর রাণীও সিপাহীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শুনে, তিনি তাড়াতাড়ি সিপাহীদের ছাউনীতে গিয়ে প্রস্তাব করলেন : 'তোমরা যদি সম্মত হও, আমাকে সাহায্য কর, আমিই তাহলে ঝাঁসীর গদী দখল করে বসি—তোমাদের কোন ভয়-ভাবনা থাকবে না, আমার অধীনেই কাজ করবে।'

সাধারণ সিপাহীরা সদাশিব রাওয়ের কথায় উল্লাসে চীৎকার করে উঠল, তাঁর প্রস্তাব লুফে নিল। কিন্তু তাদের উপরওয়ালারা আগে থেকেই এই লোকটিকে চিনতেন, তাঁরা রাওজীকে হাতে রেখে সিপাহীদের বুঝিয়ে বললেন যে, তাড়াতাড়ি কিছু করা ঠিক নয়। আমরা রাণীকেই গদীতে বসিয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে চাই, এই ব্যক্তি রাণীর দুষমন আর ফিরিঙ্গীদের গোয়েন্দা ছিল ; একে বিশ্বাস করে এখনি গদীতে না বসিয়ে এর ভাবগতিক দেখা যাক, তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

এর পর তাঁরা সদাশিব রাওকে বললেন : 'কেল্লার ফিরিঙ্গী-গুলোকে নিকাশ না করে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আপনি যদি ওদের খতম করবার ভার নিতে পারেন, আমরা

আপনার হুকুম মত কাজ করব।' সদাশিব রাও সম্মত হলেন। ইংরেজ রেজিমেণ্টে যে ক'টা কামান ছিল, কেল্লার মধ্যে সেগুলো অবিন্যস্ত ভাবেই ফেলে রাখা হয়েছিল—বুরুজের উপর আর তুলে বসানো হয় নাই। তার কারণ, প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-শক্তি তখন ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—ঝাঁসী আক্রান্ত হবার কল্পনাও তাঁরা কেউ করতেন না, কাজেই, কামানগুলোর সম্বন্ধে কোন যত্ন নেওয়াই হয় নাই। এখন সেই কামানগুলির সাহায্যেই কেল্লার ইংরেজরা আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু কামানের গোলা-বারুদ 'ষ্টার ফোর্টে'র মধ্যে থাকায় পূর্বেই বিপ্লবীদের হস্তগত হয়েছিল; দুর্গের মধ্যে সামান্য যে সব মাল-মশলা পাওয়া গেল, তারই সাহায্যে একটা কামান দাগবার ব্যবস্থা করে ফেললেন অবরুদ্ধ ইংরেজরা। সিপাহীরা কেল্লা আক্রমণ করতেই কেল্লার প্রাচীরের রন্ধ্র থেকে কামান দাগতে লাগল দক্ষ হস্তে ইংরেজের এক গোরা গোলন্দাজ। তোপের আওয়াজ হতেই সিপাইরা সভয়ে হঠে এলো। সদাশিব তখন কতকগুলো পুরানো তোপ সংগ্রহ করে এনে কেল্লার ওপর দাগবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কেল্লার সাহেবরা ব্যাপার দেখে বুঝলেন, পুরানো ধরণের তোপখানা হলেও প্রচুর গোলা-বারুদ যখন সিপাহীদের হাতে, তখন কেল্লা রক্ষা করা কঠিন—একটা তোপের সাহায্যে সামান্য পরিমাণ গোলা-বারুদ নিয়ে তাঁদের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করা অসম্ভব। সেই দিনই তাঁরা সবিনয়ে রাণীকে জানালেন:

'আপনি দয়া করে আমাদের মহিলা ও শিশুদের আপনার প্রাসাদে আশ্রয় দিন, আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।'

রাণী উত্তরে জানালেন: আমি তো আগেই এ প্রস্তাব করেছিলাম। আজই রাত্রে আমি তাঁদের প্রাসাদে আনবার ব্যবস্থা করব, কিন্তু খুব গোপনে। ঘুণাক্ষরেও যেন এ খবর আমার বিশ্বাসী অনুচরবর্গ ছাড়া কেউ না জানতে পারে।

এই প্রসঙ্গে রাণী স্কীন সাহেবকে এ কথাও জানালেন: আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও তোমরা বিপন্ন জেনে আমি প্রতিশোধ নেবার কোন চেষ্টা করি নাই; কিন্তু আমার রাজত্ব কালে তোমরা বরাবর যাকে আমার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলে, তোমাদের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে যে লোক আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তোমরা যাকে পরম মিত্র ভাবতে, সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সদাশিব রাওই তোমাদের এই চরম সঙ্কটে সিপাহীদের পক্ষ নিয়েছে, সেই ব্যক্তিই তোপখানা যোগাড় করে তোমাদের নিপাতের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।

রাণীর এই শ্লেষোক্তি শুনে চরমকালে বোধ হয় দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত পলিটিক্যাল এজেন্ট, জবরদস্ত কমিশনার আলেকজাণ্ডার স্কীন সাহেবের চৈতন্য হয়েছিল; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই—কত মহানুভব ও মহীয়সী নারী এই রাণী লক্ষ্মীবাঈ—স্বামীর মৃত্যুর পর সকল ক্ষমতা লুণ্ঠন করে পুরাতন প্রাসাদে বসবাস করতে তাঁরাই যাঁকে বাধ্য করেছিলেন।

সেই রাত্রেই রাণী যথাবিহিত তৎপরতায় সিপাহীদের

অগোচরে কেল্লার ইংরেজ মহিলা ও শিশুদিগকে তাঁর প্রাসাদে এনে আতিথ্য সৎকার করলেন। রাণী নিজে প্রত্যেক নারীর সঙ্গে আলাপ করে অভয় দিয়ে তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন। আহারের সময় নিজে উপস্থিত থেকে পরিদর্শন করতে লাগলেন।

কিন্তু তিন দিন পরেই সাহেবদের মত ঘুরে গেল। তার কারণ, ইতিমধ্যে সিপাহীরা কেল্লার উপর তোপ দেগেও কোন রকম সাফল্য লাভ করতে পারল না—দক্ষ গোলন্দাজের অভাবে সব উত্তম তাদের ব্যর্থ হলো। পক্ষান্তরে ইংরেজদের সেই একটি মাত্র তোপ থেকে নিক্ষিপ্ত কতিপয় গোলার আঘাতে তারা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তাদের ছুটো কামান ইংরেজের গোলায় বিগড়ে গেল, কতিপয় সিপাহীও প্রাণ হারালো। সিপাহীরা পুনরায় হটে এল।

সদাশিব এই সময় ছু'মুখো সাপের মত একসঙ্গে দংশন করে বিষ ঢালতে আরম্ভ করল ছুপক্ষের ওপরে। সিপাহীদিগকে বলল : সাহেবদের ভয় দেখিয়ে আমি কাজ উদ্ধার করছি দেখ ; আমার এক বিশ্বাসী লোককে দূত করে পাঠাতে চাই, সে ওদের হাল-চাল দেখে আসুক। আমি জানাতে চাই—ভালোয় ভালোয় কেল্লা ছেড়ে দাও, নৈলে কেউ বাঁচাবে না। কেল্লা ছেড়ে দিলে আমরা কাউকে প্রাণে মারব না।

প্রস্তাবটা সিপাহীদের ভালোই লাগল। সদাশিবের এক পার্শ্বচর চিঠি নিয়ে কেল্লায় গেল। কিন্তু তাকে বাইরে রেখে

কেল্লার ফটক থেকে দরজা না খুলেই কৌশলে সে চিঠি তুলে নেওয়া হলো। সদাশিবের চিঠির মর্ম হচ্ছে: 'আগে যেমন আমি হুজুরদের গোলাম ছিলাম, এখনো তাই আছি। রাণীর সঙ্গে সিপাহীদের দর-কষাকষি চলেছে—রাণী এদের হাতে দাবী মত টাকা দিলেই ঝাঁসীর গদীতে তাঁকে বসানো হবে। রাণী এখন সেই ফিকিরে আছেন—টাকার যোগাড় করছেন। রাণীর গদীতে বসা মানেই হুজুরদের নিপাত করা। কেল্লার ভিতরের প্রাসাদেই ছিল ঝাঁসীর সাবেক গদী-ঘর। সেই জন্যই কেল্লা দখল করবার আশায় সিপাহীরা ক্ষেপে উঠেছে। বেগতিক দেখে হুজুরদের স্বার্থের দিকেই চেয়ে আমি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। এরা যে সব পুরানো তোপ যোগাড় করেছে, চুপি-চুপি আমি বিগড়ে দিয়েছি—তার সাক্ষী আজকের লড়াই। আমি থাকতে হুজুরদের কোন ভয় নেই। কাল তোপখানা মেরামত হবে, পরশু সকাল থেকে আবার আক্রমণ চলবে। এখন আমার এই চিঠির এই ভাবে এক জবাব হুজুররা দিন—'আমরা কেল্লা ছেড়ে দিতে সম্মত আছি।' এই জবাব পেলেই বুঝব, হুজুররা আমার উপর বিশ্বাস রাখেন।'

সাহেবদের তখন রন্ধ্রগত শনি; কাজেই সদাশিবের চিঠি পড়ে রাণীর উপর যেমন আস্থা হারালেন, তেমনি সদাশিবের অনুরোধও রাখলেন না; তাঁর চিঠির জবাবে জানালেন—'বেইমান বিদ্রোহীদের তরফ থেকে এ প্রস্তাব করতে তোমার লজ্জা হলো না। যদি তোমার কথায় সিপাহীরা নিরস্ত্র হয়ে

কেল্লার সামনে এসে দাঁড়ায়—তাহলে আমরা তোমার উপর আস্থা রাখতে পারি।'

সেই দিনই সাহেবরা রাণীর প্রাসাদ থেকে ইংরেজ মহিলা ও শিশুদিগকে কেল্লায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। গোপন ভাবে রাণীর প্রাসাদ থেকে কেল্লায় যাতায়াতের যে ভাবে ব্যবস্থা ছিল, সেই ভাবেই তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো। হঠাৎ এ ভাবে মহিলা ও শিশুগণকে কেল্লায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাণী যখন বাধা দেন, আপত্তি করেন, তখন ইংরেজ তরফ থেকে রাণীকে বলা হয়—তবে কি ইংরেজ মহিলাদের আয়ত্তে পেয়ে নজরবন্দিনী করে প্রাসাদে রাখাই রাণীর অভিপ্রায়? এ কথার পর তিনি আর কোন আপত্তি তুললেন না; যেমন সন্তর্পণে ও গোপনে তাঁদের আনা হয়েছিল, সেই ভাবেই পুনরায় তাঁদের নিরাপদে কেল্লায় পৌঁছে দেওয়া হলো। তাঁদের সঙ্গে রাণী তিন মণ ময়দার রুটি ও সেই অনুযায়ী অন্যান্য প্রচুর আহার্য দিলেন এবং কেল্লায় ফিরে যাবার পর ও নিয়মিত ভাবে সেখানে আহার্য পাঠাবার ত্রুটি হলো না। অবশ্য তৃতীয় দিবসে তার আর প্রয়োজন হয় নাই—নিজেদের ভুলেই কেল্লার ইংরেজরা নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন।

ইংরেজ মহিলাগণ কেল্লায় যখন প্রত্যাবর্তন করেন, রাণী সেই সময় স্কীন সাহেবকে জানিয়েছিলেন যে, মেয়েদের কেল্লায় নিয়ে গিয়ে তাঁরা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন নাই; সিপাহীদের ভাবগতিক ভাল নয়। তিনি যদি কোন রকমে ওদের চোখে

খুলো দিয়ে সদলবলে কেল্লা থেকে বেরিয়ে তিহরী রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন, তাহলেই এ সঙ্কটে রক্ষা পাবেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়,—আত্মসমর্পণের অবস্থাই এসে পড়ে, সে সময় যেন রাণীকে খবর দেন।

কিন্তু রাণীর এ উপদেশেও স্কীন সাহেব কর্ণপাত করলেন না; তিনি বোধ হয় সাব্যস্ত করেছিলেন, তাঁদের বিপত্তিকালে আহার্যাদি যোগান দেওয়া রাণীর অবশ্য কর্তব্য। তিনি দম্ভের সঙ্গে কেল্লা রক্ষা করতেই উদ্যোগী হলেন। ওদিকে ঝাঁসার অন্তর্গত করেরা নামক অঞ্চলের কেল্লা থেকে এক দল সিপাহী জয়ধ্বনি তুলে ঝাঁসীতে এসে এখানকার সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিল। এই দলে কতিপয় দক্ষ গোলন্দাজ ছিল। কেল্লায় ইংরেজ মহিলাদের প্রত্যাবর্তনের পর তৃতীয় দিনে মিলিত সিপাহী দল নূতন উদ্যমে কেল্লার উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। সিদ্ধহস্ত গোলন্দাজের হাতে পড়ে সেই পুরানো কামানগুলি অবিশ্রান্ত ভাবে এমন অগ্নিবর্ষণ করল যে, ইংরেজরা বিব্রত হয়ে পড়ল; গোলা-গুলীর অভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের কামান নিস্তব্ধ হলো এবং স্কীন সাহেবের সহকারী গর্ডন সাহেব বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। নিরুপায় হয়ে সেই অবস্থায় কেল্লা থেকে সাদা পতাকা তুলে ইংরেজরা সন্ধি-প্রার্থী হলেন। ইতিমধ্যে নিজেদের ভ্রম বুঝতে পেরে তাঁরা রাণীর প্রাসাদে যে দূত পাঠান,—প্রহরারত সিপাহীদের হাতে পড়ে সে ব্যক্তি নিহত হয় এবং এই সূত্রে অবরুদ্ধ ইংরেজদের

প্রতি রাণীর করুণাপূর্ণ সহায়তার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সিপাহীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সদাশিব রাও সময় বুঝে তাদের উত্তেজনা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাতে থাকেন রাণীর এই ইংরেজ প্রীতির প্রসঙ্গ তুলে। ফলে, সিপাহীদের অনেকে রাণীর প্রাসাদ লুণ্ঠন করে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করল। কিন্তু অধিকাংশ সিপাহী এ প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল যে, বেনিয়া কোম্পানীর রাজগী যাওয়া মানেই ঝাঁসীতে রাণীজীর আমল ফিরে আসা। রাণীর জন্যেই আমাদের লড়াই করা—আমরা তাঁর হাবেলীতে ঢুকব হানাদার হয়ে? আরে ছো, ছো।

ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করা মাত্র তাদের একটা ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা হলো। সিপাহীদের মধ্যে যারা রাণীর প্রাসাদ লুণ্ঠনের প্রস্তাব তুলেছিল, তারাই বন্দী ও বন্দিনীদিগকে প্রহরার দায়িত্ব গ্রহণ করল—এদের অধিকাংশই করেরা কেল্লার সিপাহী, এরা অত্যন্ত উদ্ধত ও নৃশংস। সদাশিব রাও এদের উপরে বিশেষ প্রভাব স্থাপিত করতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি তাদের অনুসরণ না করে কেল্লার উপর প্রভুত্ব স্থাপনে ব্যগ্র হলেন। তাঁর ইচ্ছা যে, সদ্য-সদ্যই সেই রাত্রে তাঁকে কেল্লা-সংলগ্ন প্রাসাদের সাবেক গদী-ঘরে নিয়ে গিয়ে ঝাঁসীর মহারাজ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সিপাহীদের দলপতিরা মুখে যাই বলুন, অন্তরে-অন্তরে রাণীর পক্ষপাতী থাকায় কৌশলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলেন। এমন সময় খবর

এলো, করেরার সিপাহীরা ব্যারাকে আবদ্ধ ইংরেজ নর-নারী সকলকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে—তাদের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই।

তখন দলপতিদের অনুরোধে সদাশিব রাওকেই সেনা-ব্যারাকে ছুটতে হলো। তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার ফটক পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল। সদাশিব অকুস্থলে গিয়ে দেখলেন, সেনা-ব্যারাকের বিশাল গৃহতল ও প্রাঙ্গণে নররক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, ব্যারাকের মধ্যে বন্দীদের আনবার পর বক্সী আলি নামে করেরার এক উদ্ধত সিপাহী ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে এসে বলেছিল যে, সদাশিব রাওজী হুকুম দিয়েছেন—বন্দীদের কোতল করা হোক, কেউ যেন কোন রকমে রেহাই না পায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই তলোয়ার খুলে সর্বাগ্রে স্কীন সাহেবের শিরশ্ছেদ করে,—সে একলাই সাতজন সাহেবের মাথা কেটেছে। এর পরে প্রত্যেক সিপাহী যেন হত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এক ঘড়ির মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়।

সদাশিব রাও নিজেও এ ভীষণ দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এর পর কেল্লায় ফিরে গিয়ে দেখেন, ফটক বন্ধ করা হয়েছে এবং সিপাহীদলপতিরা বাহিরের কামানগুলি গোলা-বারুদের সঙ্গে কেল্লার ভিতরে নিয়ে গেছেন। কেল্লা থেকে তাঁকে জানানো হলো—সদাশিব রাও যদি নিজের জান-মান

বাঁচাতে চান, করেরার সিপাহীদের নিয়ে সহর ছেড়ে সরে পড়ুন। এত বড় নৃশংসাচার করুণাময়ী রাণী কখনো সহ্য করবেন না।

রাওজী বুঝলেন, তিনি এক চক্রান্তজালে বেষ্টিত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ সিপাহীদের ছাউনীতে ফিরে গিয়ে দেখলেন, তারাও আতঙ্কে মুসড়ে পড়েছে। এর পর সেই রাত্রেই তিনি তাদের নিয়ে করেরা অভিমুখে কুচ করলেন।

(৭)

সেই গভীর রাত্রে রেসিডেন্সীর ব্যারাকে ইংরেজ নর-নারীদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সময় রাণী শয়নকক্ষে নিদ্রিতা। সারা দিনের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও প্রতীক্ষার পর অধিক রাত্রেই তিনি শয়ন-কক্ষে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন। রেসিডেন্সীর দিকে হল্লা শুনে রাণীরই জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর অকুস্থলে উপস্থিত হয়, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তিই দুঃসংবাদ বহন করে এনে রাণীর পিতা পন্থজীকে জানায়। তিনিও ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ রাণীর দুই প্রিয় সহচরী মন্দার ও কাশীকে ডেকে বললেন: রাণী যদিও ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাহলেও তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে এ খবর এখনই দেওয়া উচিত।

জেগে উঠেই এই ভীষণ খবর শুনে রাণী শিউরে উঠলেন; তখনি তিনি বেশ পরিবর্তন করে দুই সহচরী ও একদল রক্ষী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ধাবিত হলেন। তাঁর নির্দেশমত

এক দল অনুচর মশাল জ্বেলে পথ প্রদর্শন করে চলল। দুর্ঘটনা-স্থলে গিয়ে স্বচক্ষে নিহতদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শবদেহ দেখে রাণী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি স্বয়ং তন্ন-তন্ন করে দেখতে লাগলেন —তখনো কেউ বেঁচে আছে কি না! রাণীর সেই চেষ্টার ফলে কতিপয় অ-সামরিক নর-নারীর সন্ধান পাওয়া গেল—যাঁরা প্রাণভয়ে নিহতদের মধ্যে মৃতের মত ভাণ করে অসাড় ভাবে পড়েছিলেন। তাঁদের অভয় দিয়ে রাণী বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ স্থানে সেই রাত্রেই পাঠিয়ে দিলেন; তার পর নিহতদের সংকার সম্বন্ধেও যথোচিত নির্দেশ দিয়ে প্রাসাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় ঝাঁসীর কেল্লা থেকে সিপাহীদের কতিপয় দলপতি তাঁর সামনে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করে জানাল যে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে তারা কেউ দায়ী নয়; ঝাঁসীর গদীর সেই পুরানো দাবীদার সদাশিব রাও করেরি কেল্লার সিপাহীদের হাত করে এই কাণ্ড করেছে। তার খুবই আশা ছিল, এই রাতেই কেল্লার গদী-ঘরে গিয়ে গদীতে বসে ঝাঁসীর মহারাজ খেতাব নেবে। কিন্তু তারাই রাওজীর সে মতলব ব্যর্থ করে দিয়েছে। এখন রাণীজী তাদের উপর প্রসন্না হয়ে ঝাঁসীর গদীতে বসুন—তাদের চালনা করুন।

রাণী বললেন: এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে আমি এমন ব্যথা পেয়েছি যে, ও-সব কথা ভাববার মত অবস্থা আমার এখন নয়। ভেবে-চিন্তে পরে আমার অভিপ্রায় জানাব। এখন আমার

ইচ্ছা, যাদের হত্যা করা হয়েছে, সকাল হলেই যেন তাদের সমাধির ব্যবস্থা করা হয়। আমি সে বন্দোবস্ত করেছি; তোমরাও সেদিকে লক্ষ্য রেখ—উদ্ধত সিপাহীরা শবের প্রতি যেন কোন রকম অশ্রদ্ধা বা অসম্মান না করে।

সিপাহী দলপতিরা সমস্বরে রাণীর আজ্ঞাপালনে সম্মতি জানাল। রাণীও সদলবলে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

কিন্তু এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে রাণী লক্ষ্মীবাঈ নির্লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও, বিরোধী পক্ষের অপপ্রচারের ফলে অন্যান্য স্থানের ইংরেজ কর্তৃপক্ষদের মনে এইরূপ ধারণা দৃঢ় হয় যে, এতে রাণীর হাত ছিল—তাঁর আজ্ঞাতেই করেরি কেল্লার সিপাহীরা বন্দীদের হত্যা করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাণীর অজ্ঞাতসারেই যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং সে জন্য রাণী মনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। দুর্ঘটনার পর তাঁরই উদ্যোগে বিহিত বিধানে মৃতদেহগুলির সমাধির ব্যবস্থা হয়। রাত্রির অন্ধকারে যে কয় জন ইংরেজ নর-নারী কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মার্টিন নামে এক ইংরেজ এই বিপ্লব অবসানের বহু দিন পরে (১৮৮৯ অব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে) রাণীর দত্তক পুত্র দামোদর রাওজীকে এই মর্মে এক পত্র লিখেছিলেন: বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ঝাঁসীর হত্যাকাণ্ডের জন্য আপনার মহীয়সী মাতাকে দায়ী সাব্যস্ত করেছিলেন—সে বৃত্তান্ত আমার চেয়ে বেশী কেউ জ্ঞাত

নন। ১৮৫৭ অব্দে ঝাঁসীর ব্যারাকে বন্দী ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষদের হত্যায় রাণীর কোন হাত ছিল না, বরং তিনি বরাবর অবরুদ্ধ কেল্লায় সংগোপনে আমাদের আহার যুগিয়েছিলেন ; তিনি স্কীন সাহেবকে তেহরি বা দতিয়ার রাজার এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেবার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু মেজর স্কীন ও তাঁর সহকারী লেফটন্যাণ্ট গর্ডন সে কথায় কর্ণপাত করেননি। রাণী সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন। আমি যে সে ঘটনার পরও প্রাণরক্ষায় সমর্থ হই, সে শুধু রাণীর অনুগ্রহে। আমরা যে ক'জন প্রাণে বেঁচেছিলাম, রাণী আমাদের রক্ষার জন্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করেন নাই।

ঐতিহাসিক কে সাহেবও ঐ হত্যা-ব্যাপারে রাণীকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করেন নাই। তিনি লিখেছেন—'হত্যাকাণ্ডের সময় রাণীর নিজস্ব কোন অনুচর বা সৈনিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। এক দল অনিয়মিত সিপাহী কর্তৃক এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।'

উক্ত ঘটনার পরদিন রাণী খবর পেলেন যে, গত রাত্রেই সদাশিব রাও করেরি কেল্লা দখল করে সেখানেই ঝাঁসীর মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেছেন। করেরির সিপাহীরা তাঁকে মহারাজের সম্মান দিয়ে ঝাঁসীর গদীতে বসবার জন্য প্ররোচিত করছে। সদাশিব এখন মহা উৎসাহে সৈন্য সংগ্রহ করছেন। ঝাঁসীর সিপাহীরা পাছে তাঁকে বাধা দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ এক দল শক্তিশালী নূতন বাহিনী গঠন করছেন। এই অবস্থায় রাণীর

পিতা পন্থজী, দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এবং ঝাঁসীর কেল্লার সিপাহী-নায়কগণ রাণীকে ঝাঁসীর গদীতে আরোহণ করে ঝাঁসী রক্ষার জন্য অনুরোধ জানালেন। রাণী তখন সিপাহীনায়কদিগকে কতকগুলি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে সর্বসম্মতিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর পরে পূর্ববৎ রাজ্ঞীর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঝাঁসীর দুর্গ-প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করলেন।

রাজ্যভার গ্রহণের পূর্বে দুর্গের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমবেত সমগ্র সেনানী ও সৈনিকগণকে ধর্মের নামে শপথ করে স্বীকৃতি দিতে হলো যে, শেষ পর্যন্ত তারা প্রত্যেকে রাণীকে অনুসরণ করবে, রাণীর আজ্ঞায় জীবন পর্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। তাদের এখন কর্তব্য হবে প্রাণপণে ঝাঁসীকে রক্ষা করা। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তারা কোন প্রকার নৃশংসাচার করবে না, লুণ্ঠনেও হত্যাকাণ্ডে কখনো যোগ দেবে না। ঝাঁসীকে সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ ও সর্বশ্রীমণ্ডিত করে তোলাই হবে তাদের কর্তব্য।

দীর্ঘকাল পরে পূর্বের সেই আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষায় সজ্জিতা রাণীকে ঝাঁসীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা দেখে সহস্র সহস্র কণ্ঠে তাঁর নামে জয়ধ্বনি তুলে সৈনিক ও নাগরিকগণ সহর্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করল। রাণীও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন: আমার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করবার যে সুযোগ জগদীশ্বর আমাকে দিলেন, আমি সযত্নে তাকে সার্থক করব। আমার এখন প্রথম কর্তব্য হচ্ছে—ঝাঁসীর পরম শত্রু সদাশিব রাওয়ের দণ্ডবিধান। ঝাঁসী আক্রমণ করবার জন্য সেই দেশবৈরী সৈন্যসজ্জা [illegible]

কিন্তু আমার ইচ্ছা, তার সেই সজ্জা সম্পূর্ণ হবার আগেই তাকে শাস্তিদান করা হোক।

রাণীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁসীর সেনানী ও সৈনিক-গণের শত শত তরবারি সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হয়ে উঠল, অসংখ্য কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল—রাণী মায়ী কি জয়, মহারাণী লক্ষ্মীবাঈজী কি জয়!

দুর্গ ও রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করে এক দল দ্রুতগামী ও শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে রাণী ত্রিশ মাইল দূরবর্তী করেরি দুর্গ অভিমুখে রওনা হলেন। সেনানী ও সৈনিকদের উপর যুদ্ধ করবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার পাত্রীই তিনি নন, তাই, স্বয়ং বীরাঙ্গনা সহচরীদের সঙ্গে রণসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে অশ্বারোহণে বাহিনী-মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে সৈনিকদের অন্তরে বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন। সদাশিব রাও কল্পনাও করেননি যে, রাণী তাঁর মত-পরিবর্তন করে সেনাদল নিয়ে করেরি আক্রমণে অগ্রবর্তিনী হবেন। তিনি সুখস্বপ্ন দেখছিলেন—করেরি থেকে রণযাত্রা করে রাজধানীতে বিজয়-গর্বে প্রবেশ করবেন, বিদ্রোহী সিপাহীরা সসম্ভ্রমে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে ঝাঁসীর গদীতে তাঁকে বসিয়ে ধন্য হবে। কিন্তু সে সুখস্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেল ঝাঁসীর শক্তিশালী রণবাহিনীর আকস্মিক আবির্ভাবে ও তাদের মিলিত কণ্ঠে রাণী লক্ষ্মীবাঈজীর নামে জয়ধ্বনির প্রমত্ত আরাবে। করেরির সিপাহীরা রাণীকে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে রণস্থলে দেখেই অবাক হয়ে গেল! কোথায়

তারা শত্রুপক্ষকে প্রতি-আক্রমণ করবে, সে স্থলে মুক্তকণ্ঠে রাণীর জয় ঘোষণা করে তাঁর সেনাদলের সঙ্গেই মিশে গেল, তারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগল—মহারাণীকে দেখেই আমাদের মনে পড়ছে রণচণ্ডীর কথা, অসুরদলনী দুর্গার কথা ; আমাদের মোহ দূর হয়েছে, আমরাও রাণীর সেবক, তাঁর সন্তান। ওদিকে কেল্লার সিপাহীরাও ফটক খুলে দিয়ে রাণীর জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে তুলল। সদাশিব রাও বুঝলেন, এখানেও তাঁর কপাল ভেঙেছে ; তিনি তাঁর নিজস্ব রক্ষীদল নিয়ে অতি কষ্টে গুপ্তপথে কেল্লা ত্যাগ করে গোয়ালিয়র অভিমুখে পলায়ন করলেন।

করেরিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রাণী রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর নিজস্ব উন্নত পরিকল্পনায় রাজ্যের সংস্কার সাধনে ব্রতী হলেন। পূর্বে যে-সব কর্মচারীকে ইংরেজ সরকার বরখাস্ত করেছিলেন, রাণী তাঁদের আহ্বান করে কোনও না কোন কার্যে নিযুক্ত করলেন। প্রজাবর্গের কল্যাণমূলক যে-সব দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যয়সাধ্য বলে ইংরেজ বন্ধ করেছিলেন, রাণীর আদেশে সেই সব প্রতিষ্ঠানের দ্বার পুনর্মুক্ত হলো। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে রাণী রণবাহিনীর পুষ্টি সাধনে সচেষ্ট হলেন ; রাজ্যের সমর্থ ব্যক্তিগণকে নিয়মিত ভাবে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবার বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো, দলে দলে নূতন নূতন যোদ্ধারা সেনাদলে যোগ দিতে লাগল। নারীদের সম্বন্ধেও রাণী উদাসীন রইলেন না, নিজেই অগ্রণী হয়ে তাদের নিয়ে আপৎকালের উপযোগী

যেসব শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন—পরবর্তী সংগ্রামের সময় এই নারীবাহিনীর অসামান্য দক্ষতার নিদর্শন পেয়ে ইংরেজ সেনা-নায়কেরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

নানা ভাবে যখন স্বাধীন ঝাঁসীর সংস্কার-কার্য চলেছে, সেই সময় সদাশিব রাও পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়রাধিপতি সিন্ধিয়া মহারাজের এক দল সৈন্য নিয়ে পুনরায় ঝাঁসী অভিমুখে কুচ করলেন। গুপ্তচর মুখে এ খবর পেয়েই রাণী সসৈন্য ঝাঁসীর সীমান্তে এসে তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। রাণীর এই কৌশলময় আয়োজন সর্বাংশে সার্থক হলো—ঝাঁসীর এলাকায় প্রবেশ করা মাত্র ঝাঁসীর রণবাহিনী এমন অতর্কিত ভাবে তাদের ঘিরে ফেলল যে, বেড়াজালে মাছের ঝাঁকের মত তাদের অবস্থা হলো। প্রায় বিনা রক্তপাতে রাণী বিজয়িনীরূপে সদাশিবের সঙ্গে সিন্ধিয়ার সেনাগণকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। কিছু দিন পরে কতিপয় সর্তাধীনে রাণী সদাশিব রাওকে মুক্তি দিলেন। সিন্ধিয়ার সেনাদলও মুক্তি পেয়ে নূতন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে গোয়ালিয়রে ফিরে গেল। তারা মুক্তকণ্ঠে রাণীর রাজনীতি ও সেনাদলের প্রতি স্নেহ-প্রীতির যে সব কাহিনী প্রচার করতে লাগল, তার ফলে সিন্ধিয়ার সমগ্র বাহিনী ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী-বাঈএর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ল। সিন্ধিয়া মিয়াজীরাও দেখলেন, ঝাঁসীর বিরুদ্ধে সেনাদের পাঠিয়ে

তিনি আর এক নূতন বিপত্তি ডেকে এনেছেন তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে দিন কাটাতে লাগলেন।

ঝাঁসীর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বোরছার দেওয়ান নথে খাঁ এ সময় খুব প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। ঝাঁসী ইংরেজের হস্তচ্যুত হওয়ায় তিনি ঝাঁসীকে বোরছার অন্তর্ভুক্ত করবার স্বপ্ন দেখছিলেন। বোরছার মালিকও এক নারী, তিনি রাণী লড়য়িবাঈ নামে প্রসিদ্ধা। কিন্তু দেওয়ান নথে খাঁই রাজ্যের সর্বেসর্বা। তিনি নিজের অধীনে প্রায় বিশ হাজার সৈনিক সমবেত করে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন যে, রাণী লক্ষ্মীবাঈ যদি ঝাঁসীর গদী ছেড়ে দেন, তাঁর রাণী তাঁকে একটা মোটা মাসোহারা দেবেন এবং ইংরেজ সরকার যে পরিমাণ টাকা দিতেন, বোরছা-সরকার তার দ্বিগুণ টাকা দেবেন। রাজ্যশাসনের ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে রাণীর পক্ষে তাঁর যুক্তি গ্রহণ করাই সঙ্গত। রাণী নথে খাঁর দূতকে এই মর্মে প্রত্যুত্তর দিলেন যে, ঝাঁসীর রাণী ইংরেজ সরকারের মাসোহারা কোন দিন স্পর্শও করেন নাই—তাই জগদীশ্বরী মহালক্ষ্মীর প্রসাদে তিনি আবার ঝাঁসীর গদীতে বসেছেন। আর, রাজ্যশাসন হচ্ছে তাঁর কাছে সহজ স্বাভাবিক সংস্কারের মত—তিনি এ কাজকে ঝঞ্ঝাট মনে করেন না। সুতরাং দেওয়ান সাহেব ঝাঁসীর চিন্তা ত্যাগ করে নিজেদের রাজ্যের প্রতি সে চিন্তা নিবিষ্ট করুন।

নথে খাঁ বুঝলেন, এ রাণী বড় সাধারণ চীজ নন। তিনি তখন উগ্র ভাবে জানালেন—রাণী যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত

না হন, তাহলে তিনি বোরছার শক্তিশালী সেনাদল নিয়ে ঝাঁসী আক্রমণ করবেন। রাণীও প্রত্যুত্তরে জানালেন—'ঝাঁসী আক্রমণ করতে আসবার আগে দেওয়ান সাহেব যেন মনে ঠিক দিয়ে রাখেন—আমরা তাঁকে ও তাঁর লোক-লস্করদিগকে নারী বানিয়ে ছাড়ব। সদাশিব রাওয়ের অদৃষ্টেও এই দুর্ভোগ ঘটেছিল।' কিন্তু বিশ হাজার ফৌজের অধি-নায়ক নথে খাঁ রাণীর কথায় জ্বলে উঠলেন এবং তাঁর সাহসী সৈনিকগণ যে অবলা নারী নন, বলবান পুরুষ—হাতে-কলমে সেটা দেখিয়ে দেবার জন্যে মহোৎসাহে ঝাঁসী আক্রমণে প্রবৃত্ত হলেন। শুধু তাই নয়, ঝাঁসীর রাণীর অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্য বোরছার রাণী লড়য়িবাঈকে প্ররোচিত করে সুসজ্জিত এক বৃহৎ চতুর্দোলায় চাপিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যস্থলে রেখে রণযাত্রা করলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈও তৎপরতার সঙ্গে এই প্রবল সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। তিন বছর পূর্বে রাজ্য-চ্যুতির প্রাক্কালে তিনি ঝাঁসীর যে কয়টি বিখ্যাত কামান দুর্গের বাহিরে রাজপ্রাসাদের (রাজ্যচ্যুত অবস্থায় তিনি যে প্রাসাদে অবস্থিতি করতেন) উদ্যান মধ্যে মাটির নীচে প্রোথিত করে রেখেছিলেন, সেগুলি ভূগর্ভ থেকে তুলে সংস্কারের আদেশ দিলেন। গুপ্ত কক্ষগুলির মধ্যে যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগোপনে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল, সেগুলিও সুশাণিত করে ব্যবহারোপ-যোগী করা হোল। এ ছাড়াও দক্ষ কর্মকারগণ তাদের কারখানায়

রাষ্ট্রের ব্যয়ে দিবা-রাত্রি কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে লাগল। সেদিন দূরদর্শিনী রাণীকে যাঁরা মাটির নীচে কামান লুকিয়ে রাখতে দেখে কৌতুক বোধ করেছিলেন, গুপ্ত তয়খানার মধ্যে প্রহরণ-সমূহ সঞ্চয় করে রাখবার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে হেসেছিলেন, এখন তাঁরা চমৎকৃত হলেন।

বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে নথে খাঁ ঝাঁসীর সীমান্তে এসে দেখলেন, ঝাঁসীর রাণীর তরফ থেকে বাধা দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই। তিনি বুঝলেন, রাণী হয়ত ধারণা করতে পারেননি যে, তিনি সত্য সত্যই এত বড় একটা রণবাহিনী নিয়ে ঝাঁসীতে হানা দেবেন। এর পর নথে খাঁ যখন ঝাঁসীর মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন, সেই সময় রাণীর এক দূত বস্ত্রাবৃত দুটি পাত্র নিয়ে নথে খাঁর সঙ্গে ভেট করতে এলেন। ঝাঁসীর রাণী উপহার পাঠিয়েছেন ভেবে নথে খাঁ সেই দূতকে সামনে আহ্বান করলেন। দূত সেখানে উপস্থিত হয়েই পাত্র দুইটির আবরণ মুক্ত করলেন। তখন দেখা গেল, একটি পাত্রে রয়েছে পাঁচটি গোলা, আর একটি পাত্রে কিছু বারুদ। দূত সবিনয়ে জানালেন : রাণীজী আপনার জন্যে এই উপহার পাঠিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, এর পরও যদি আপনি ঝাঁসীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেন, তাহলে এই প্রকার উপহার নিয়ে তিনি আপনাকে অভ্যর্থনা করবেন।

এ ভাবে রাণীর উপেক্ষা ও পরিহাসে ধৈর্যচ্যুত হয়ে নথে খাঁ রাণীর দূতকে বললেন—'তোমার রাণীজীকে বলবে, ঝাঁসীর

গদীতে বসবার জন্যে বোরছার রাণী [illegible] চেপে ঝাঁসীতে এসেছেন। তিনি ঝাঁসীর গদীতে বসলে, ঝাঁসীর রাণী যেদিন সোণার থালায় মোহর সাজিয়ে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দয়া ভিক্ষা করবেন, সেই দিন তাঁর সঙ্গে এই তামাসার বোঝাপড়া হবে।'

দূতের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নথে খাঁ ঝাঁসীর কেল্লার উদ্দেশ্যে কুচ করবার জন্য সেনাদলকে হুকুম দিলেন। অবাধেই এই বিপুল বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে এল। ইংরেজরা ঝাঁসীর কেল্লার বুরুজের উপর কামান সাজানো প্রয়োজন মনে করেননি। রাণী কিন্তু রাজ্যভার নিয়েই বুরুজে বুরুজে দূরপাল্লার কামান বসিয়েছিলেন। এ ছাড়া শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের লক্ষ্য এড়াবার জন্য রাতারাতি রাজধানীর উপকণ্ঠে বৃক্ষবল্লরীর আড়ালে কতিপয় তোপমঞ্চ তৈরী করে তাঁর সুবিখ্যাত ঘনবজ্র, অগ্নিবর্ষ, শত্রু-সংহার, কড়কবিজলী, আজাদী প্রভৃতি কামানগুলি এমন ভাবে স্থাপিত করেছিলেন যে, সহসা সেগুলির দিকে পথচারীদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় না। রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা করেই রাণী ঝাঁসীর সামন্তবর্গ, সরদার ও ঠাকুর উপাধিধারী ভূস্বামীদের সাহায্যপ্রার্থীনী হন; ফলে, দলে দলে তাঁরা রাণীর আহ্বানে রাজধানীতে সমবেত হতে থাকেন। জহরসিংহ নামে এক অভিজ্ঞ, সাহসী ও বিশ্বস্ত যোদ্ধার হাতে রণ-কঙ্কণ পরিয়ে রাণী তাঁকে সেনাপতির মর্যাদা দিলেন। সিদ্ধহস্ত গোলন্দাজ যোদ্ধা গোশ খাঁকেও ঐ ভাবে কঙ্কণ উপহার দিয়ে রাণী তাঁকে

গোলন্দাজবাহিনী পরিচালনার ভার দিলেন। নিজেও তিনি পূর্ববৎ রণরঙ্গিণী বেশে তাঁর প্রিয় অশ্বে আরোহণ করে সমস্ত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। মন্দার, কাশী প্রমুখ রাণীর সহচরীরাও রণসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে রাণীর আজ্ঞানুবর্তিনী হলেন। তোপমঞ্চের পিছনে সংগোপনে সহস্র সহস্র সাহসী সৈনিক প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল; অথচ, চারিদিক নিস্তব্ধ—কে বলবে যে গোপনে গোপনে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক মারণ-যজ্ঞের আয়োজন চলেছে!

সসৈন্য নথে খাঁ রাজধানীর দক্ষিণ ভাগে উপস্থিত হলেন—তখনও রাণীর পক্ষ থেকে আক্রমণের কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। তিনি তখন সমগ্র বাহিনীকে ঝঞ্ঝার বেগে এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। একটু পরে এই দল মঞ্চে স্থাপিত তোপগুলির নাগালের মধ্যে আসা মাত্রই গোশ খাঁ গোলা বর্ষণের হুকুম দিলেন। অমনি আকাশ-বাতাস ও সমগ্র ভূভাগ প্রকম্পিত করে ঝাঁসীর অতিকায় কামানগুলির মুখনিঃসৃত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিময় গোলা সন্নিহিত শত্রুবাহিনীর উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে পলকের মধ্যে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটাল। প্রথম গোলাটি বজ্রনাদ তুলে নথে খাঁর চালিত বাহিনীর পুরোভাগে উন্নত ধ্বজ-পতাকা ধ্বংস করে সেনা-দলের মধ্যে পড়ে বিদীর্ণ হয়ে গেল—বহু সৈন্য তাতে হতাহত হলো, ঘোড়াগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাল। এই দুর্ঘটনাকে এক দিকে যেমন অত্যন্ত অকল্যাণকর ভেবে বোয়ছার নায়কগণ

উদ্বিগ্ন হলেন, পক্ষান্তরে ঝাঁসীর রাণীর রণকৌশলের এই নমুনা দেখে বোরছা-বাহিনীকে আতঙ্কিত করে তুলল। দেওয়ান নথে খাঁও তৎক্ষণাৎ বোরছার তোপখানা থেকে তোপ দাগবার হুকুম দিলেন। কিন্তু গোলন্দাজরা শত্রুর কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে লক্ষ্যহীন ভাবেই তোপ দাগতে লাগল। রাণীর তোপখানা এমন ভাবে স্থাপিত হয়েছিল যে, প্রয়োজন অনুসারে কামানগুলির মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গোলা দাগবার কোন অসুবিধা ছিল না। বোরছার তোপখানা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকায় সে সুযোগ ঘটে নাই। উপরন্তু ঝাঁসীর বর্মাবৃত এক দল দুঃসাহসী সৈনিকের প্রতি ভার দেওয়া হয়েছিল, তারা প্রাণপণ প্রয়াসে বোরছার তোপখানা দখল করে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করবে। সে সুযোগ সহজেই এসে গেল। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বোরছার তোপখানা পূর্ব থেকে সতর্ক এই দুঃসাহসী সৈনিকদের আয়ত্তে আসা মাত্র গুপ্তস্থান থেকে ঝাঁসীর তীরন্দাজ ও বন্দুকধারী সেনাদল আত্মপ্রকাশ করে সিদ্ধহস্তে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ও গুলি বর্ষণ করতে লাগল। এই দারুণ বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বোরছা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। রঘুনাথ সিংহ প্রমুখ ঝাঁসীর অভিজ্ঞ সেনানীরা সসৈন্য পলাতক শত্রুদের অনুসরণ করলেন। নথে খাঁ অতঃপর অতিকষ্টে বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশকে নিরাপদ স্থানে সন্নিবেশিত করে রাণীর কাছে সন্ধিপ্রার্থী হতে বাধ্য হলেন। ঝাঁসীর রাণীর আদর্শেই দেওয়ান নথে খাঁ

রাজা সত্বেও রাণী লড়য়িবাঈকে প্রাধান্য দিয়ে রণস্থলে এনেছিলেন। বোরছার অধিকাংশ সৈন্য রাজা ও রাণীকে রক্ষা করবার জন্য তাঁদের চতুর্দোলার চারদিকে সমবেত হয়েছিল। অধিক নরহত্যায় রাণী লক্ষ্মীবাঈএরও আগ্রহ ছিল না। এখন দেওয়ানের বিপক্ষে রাজশিবিরে অসন্তুষ্ট রাজকর্মচারীদের এক বৈঠক বসল। সকলেই দেওয়ানজীর হঠকারিতার নিন্দা করে ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য রাজাকে পরামর্শ দিলেন। রাজাও দেওয়ান নথে খাঁকে আহ্বান করে অমাত্য-বর্গের অভিমত জানালেন। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে নথে খাঁ সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ফলে, যুদ্ধের খরচ-স্বরূপ কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে বোরছা-রাজ ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে বোরছার রাণীর সৌখ্যমূলক সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হলেন। এই সন্ধিবন্ধনের সময় সুসজ্জিত শান্তি-শিবিরে দুই রাণীতে মিলন হলো—সমরক্ষেত্রে আনন্দের স্রোত বইল।

কিন্তু পরে দেওয়ান নথে খাঁ বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের ইংরেজ ঘাঁটির কর্তা মেজর হ্যামিল্টনের বরাবর এই মর্মে এক ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যেই তিনি ঝাঁসী আক্রমণ করেছিলেন। কূটবুদ্ধি দেওয়ান ভবিষ্যৎ ভেবে এই ভাবে তাঁর স্বার্থরক্ষার এক চাল চেলে রাখেন।

সে-যাই হোক, বোরছার সঙ্গে সংগ্রামে এত সহজে ও সগৌরবে জয়লাভ করায় ঝাঁসীর খ্যাতি ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে

পড়ল, সেই সঙ্গে মহীয়সী বীরাঙ্গনা রাণীর নাম লোকের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল। নানা সাহেব এ সময় নানা দিকে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় যদিও ঝাঁসীতে আসতে পারেননি, কিন্তু রাণীকে তিনি পত্রযোগে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহ দিলেন। সারা ভারত তৎকালে অগ্নিময় হয়ে উঠেছে; সবার মুখে এক কথা—যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

এই মহাবিপ্লবের প্রথম মুখে ইংরেজরা প্রায় প্রত্যেক সহর থেকেই বিতাড়িত হয়ে শুষ্ক পত্ররাশির মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন সহর দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। বিপ্লবীদের পক্ষে প্রথম ত্রুটি হয়েছিল, সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হবার তিন মাস আগেই আকস্মিক ভাবে বিপ্লব সুরু করায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লবী নায়কদের তৎপরতায় বিপ্লব এমন ভাবে সর্বত্র ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ইংরেজরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে সেই বহুবিচ্ছিন্ন বিপ্লব-শিখাকে একমুখী করে তোলবার জন্য নানা সাহেব, তাান্তিয়া প্রমুখ নেতারা বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হলেও, অধিকাংশ বিপ্লবীর অহমিকা, হঠকারিতা ও সামরিক শিক্ষার অভাবের জন্যে এবং পক্ষান্তরে ইংরেজের কূটবুদ্ধির অসামান্য প্রভাবে তাঁদের মধ্যে এমন সব ভুল-ত্রুটি ঘটতে থাকে যে, তাঁরা পদে পদে বিভ্রান্ত হন—বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র সুদৃঢ় হয়ে উঠতে বাধা পায়, আর সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদেরই দেশের লোক নিজেরাই স্বার্থের খাতিরে

ইংরেজের তুষ্টি-বিধানের জন্যে সেই যোগসূত্রকে ছিন্ন করতে সাহায্য করে।

একটা প্রবাদ আছে, বিপদ এলে ইংরেজ জাতটার সাহস আরো বাড়ে, বুদ্ধি খোলে। তাই দেখি, এত বিপদেও ইংরেজ হাল ছেড়ে দেয়নি—পরাজয়ের প্রথম ধাক্কা কোন রকমে সামলে নিয়েই ইংরেজ সেনানায়কগণ তাঁদের শিক্ষালব্ধ সামরিক বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা আরো গভীর ভাবে অনুশীলন করে প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হলেন। তাঁরা হিসেব করে দেখলেন যে, ভারতের চার দিকে একমুখী হয়ে চলেছে বীর সিপাহীদের বিজয়-পর্ব। দেড় বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের এক লক্ষ বর্গ-মাইলেরও বেশী জমি তারা দখল করে নিয়েছে, তার ফলে সাড়ে চার কোটি ভারতবাসী স্বাধীন হয়েছে। অসংখ্য নগর, বড় বড় দুর্গ, বন্দীশালা তারা অধিকার করে নিয়েছে। এ সব পুনরুদ্ধার না করলে ইংরেজের প্রেষ্টিজ থাকবে না। এর জন্যে শক্তি, বুদ্ধি, কূটকৌশল, অন্যায়, অধর্ম যা-কিছু প্রয়োজন নির্বিচারেই চালিয়ে যেতে হবে। ফলে, দেড় বছরের মধ্যেই ইংরেজ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হলো। বিলেত থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে ইউরোপীয় সৈন্য এলো, সেই সঙ্গে নূতন ধরণের এক মারাত্মক অস্ত্রও এল প্রচুর পরিমাণে। এই অস্ত্রটি হচ্ছে—এনফিল্ নামে নবাবিষ্কৃত দূর পাল্লার রাইফেল; এর গুলী সাংঘাতিক, আর বহু দূর থেকে লক্ষ্য বিদ্ধ করে। এ ছাড়া পাঞ্জাবের শিখশক্তিকেও দলভুক্ত করল ইংরেজ, নেপালের

গুর্খা সৈন্যও ইংরেজের পাশে এসে দাঁড়াল, ভারতের কতকগুলি সামরিক শক্তিসম্পন্ন উপজাতি, হায়দ্রাবাদ ও ভূপালের রাজশক্তি ইংরেজকে সাহায্য করতে সম্মত হলো; মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে ইংরেজের যে দেশী সেনাবাহিনী ছিল, তারাও ইংরেজের দলে যোগ দিল। এই ভাবে পরিপুষ্ট হয়ে ও বিপুল শক্তি-সঞ্চয় করে দুই বিখ্যাত ইংরেজ সেনানায়ক সসৈন্যে দুদিক দিয়ে এই বিপ্লব দমনে অগ্রসর হলেন। এক দিক থেকে স্যার কলিন ক্যাম্পবেল, আর এক দিক থেকে স্যার হিউরোজ—উভয়েই বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেনাপতি। কাম্পবেল উত্তর-ভারতের বিপ্লবী কেন্দ্রগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হবার সুযোগ-সুবিধা আগে থেকেই ছিন্ন করে এক-একটি কেন্দ্রকে সবলে চূর্ণ করতে অগ্রসর হলেন। সার হিউরোজ বিরাট বাহিনী নিয়ে ঝাঁসীর অভিমুখে অভিযান করলেন। ঝাঁসীর দিকেই তখন ইংরেজের দৃষ্টি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

২৩শে মার্চ তারিখে ঝাঁসী থেকে চৌদ্দ মাইল তফাতে এসে জেনারেল হিউরোজ শিবির পাতলেন। রাণী এ সংবাদ পেয়েই নিজের নারীসত্তা ভুলে গিয়ে পুরুষের মত অদম্য শক্তিতে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুর্গপ্রান্তরে সেনাদের সমবেত করে রাণী তাঁদের সামনে এসে বললেন : ঝাঁসীর বীর সন্তানগণ! আমি তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব; যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—জয় বা মৃত্যু। হয় আমি তোমাদের জয়ে

না হয় মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাব। প্রতিজ্ঞা কর তোমরা—জীবন থাকতে ঝাঁসীর পতাকা শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে না।

অসংখ্য কণ্ঠ থেকে ধ্বনি উঠল: 'জীবন থাকতে আমরা ঝাঁসীর পতাকা শত্রুর হাতে দেব না।'

এর পর রাণী সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ইংরেজ সেনাপতির অভ্যর্থনার যে আয়োজন করলেন, ভারতে তা অপূর্ব। ওদিকে জেনারেল রোজ শিবির তুলে ঝাঁসী অভিমুখে অগ্রসর হয়েই বুঝলেন, তিনি এক অসাধারণ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চলেছেন। এই প্রতিপক্ষকে প্রথমে নারী ভেবে তিনি অবজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু এখন বুঝলেন, তাঁর মস্ত ভুল হয়েছিল। স্যার হিউরোজ যতই অগ্রসর হন, দেখেন—চার দিকে আগুনের শিখা লক্-লক্ করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে; শস্য-ক্ষেত্র, প্রান্তর, অরণ্য—প্রজ্বলিত হচ্ছে। রোজ বুঝলেন, ঝাঁসীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল অগ্নিসাৎ করে রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ সেনার রসদ সংগ্রহের উপায় ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সেই দারুণ উত্তাপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া ইংরেজ সেনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। এদিকে সঙ্গে যে রসদ ছিল, তাঁবু ফেলে বিশ্রাম কালেই সব শেষ হয়ে গেছে। এখন রসদের জন্যে সেনাদল অস্থির হয়ে উঠেছে। রোজ স্থির করতে পারলেন না—এ অবস্থায় কি করবেন? বিনা রসদে আরো এগিয়ে যাওয়া কি সঙ্গত হবে। কিন্তু এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন তিহরীর রাজা সাহেব। এই তিহরীরাজ ইংরেজের পক্ষপাতী, রাণী তা

জানতেন। সেই জন্যই ঝাঁসীর বিপ্লবের সময় স্কীন সাহেবকে তিনি তিহরীরাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন ইংরেজের এই মহা বিপত্তি দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রচুর রসদ পাঠিয়ে রাজা সাহেব রাণীর প্রথম সামরিক কৌশলকে ব্যর্থ করে দিলেন।

অতঃপর জেনারেল রোজ ঝাঁসীর দ্বারে এসেই সেনা সমাবেশ করলেন। নগরের প্রবেশ পথে দশটি বড় বড় ফটক ছিল। এগুলি ছাড়াও চারটি গোপন খিড়কী দরজার ব্যবস্থা করেন রাণী। দুর্গবাসী ভিন্ন অন্যের পক্ষে এই দ্বারগুলি অগম্য। নগর পরিবেষ্টন করেই রোজ দুর্গ আক্রমণ করলেন। রাণীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তাঁর ঘনগর্জ্জ কামান অগ্ন্যুদ্গার করে ইংরেজের কামানের প্রত্যুত্তর দিল। ২১শে মার্চ থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ দিন ইংরেজ-সেনা ঝাঁসী অবরোধ করে রাণীর সৈন্যের সঙ্গে অহোরাত্রি যুদ্ধ চালালেন। সপ্তম দিনে সন্ধ্যার সময় ইংরেজদের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে বাম দিকে দুর্গ-প্রাচীরের একাংশ ভেঙে পড়ল। রাণী সেই অবস্থায় আপদকালের জন্য সংরক্ষিত আপাদমস্তক-বর্মাবৃত রক্ষীদলকে সেই অংশে আনিয়ে এমন ভাবে বিষাক্ত তীর বর্ষণের হুকুম দিলেন যে, রাত্রির অন্ধকারে ক্লান্ত শ্রান্ত ইংরেজ সেনাদল সে পথে আর অগ্রসর হতে পারল না। পর দিন প্রত্যুষে ভগ্ন প্রাচীর পথে কেল্লা প্রবেশ করা হবে সিদ্ধান্ত করে ইংরেজ পক্ষ সেই রাত্রির মত নিরস্ত হলেন। এদিকে রাণীর নির্দেশ মত সুদক্ষ মেরামত-

কারী মিস্ত্রীদল কালো কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ আবৃত করে ভগ্ন অংশ মেরামত করতে লাগল এবং প্রভাতের পূর্বেই রাতারাতি এমন নিপুণ ভাবে প্রাচীরের ভগ্নাংশ গড়ে ফেলল যে, কে বলবে—এই অংশ ভেঙে পড়েছিল। ও-দিকে ঊষাগমের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সেনা বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে সেই ভগ্ন পথে অগ্রসর হয়েই অবাক বিস্ময়ে দেখল, কেল্লা-প্রাচীর পূর্ববৎ অভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে; আর—প্রাচীর থেকে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাবৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজের এই ভুলে এক দিনেই বহু সৈন্য জীবনা দিলেন এবং লেফ্‌টন্যান্ট ডিক, মিকলব্যান বোনেস, ফকস্ প্রভৃতি কতিপয় নামকরা সেনানীও মৃত্যু বরণ করলেন।

রাণী আহার-নিদ্রা অগ্রাহ্য করে অভিজ্ঞ সেনাপতির মত অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যে ভাবে সমর পরিচালনা করতে লাগলেন, তার ফলে জেনারেল রোজের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অবিশ্রান্ত ভাবে ভীষণ সংগ্রামে ইংরেজদের যুদ্ধোপকরণ সব নিঃশেষ হয়ে গেল। নানা সাহেব এ সময় ইংরেজ সেনাপতি স্যার ক্যাম্পবেলের গতিরোধের জন্য বিপ্লবী কেন্দ্রগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকায় একান্ত আগ্রহ ও ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ঝাঁসীতে এসে রাণীর সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন না। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি বিশ হাজার সৈন্য সহ তান্তিয়া তোপীকে ঝাঁসীতে পাঠালেন। জেনারেল রোজও নিরূপায় হয়ে তিহরীর রাজার কাছে সৈন্য, রসদ ও গোলা-বারুদ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিহরী-রাজ রোজ সাহেবের

প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ দিলেন যে, রাজ্যের শিক্ষিত গুর্খা পল্টন, কতিপয় দূরপাল্লার কামান ও প্রচুর গোলা বারুদ শীঘ্রই ঝাঁসীতে পাঠিয়ে তিনি ধন্য হবেন। রোজ এ সংবাদে আশ্বস্ত হলেন। এই সময় হঠাৎ এক বিশ্বস্ত গুপ্তচর রোজ সাহেবের কাছে খবর আনল—তাস্তিয়া তোপী বিস্তর ফৌজ নিয়ে ঝাঁসীর উদ্ধারে আসছেন; কিন্তু তাঁর সৈন্যদল এত দ্রুত এগিয়ে এসেছে যে, সঙ্গের তোপখানা পিছিয়ে পড়েছে অনেক দূরে। এ খবর শুনে রোজ যেমন শঙ্কিত হলেন, তেমনি একটা আশার পথও দেখলেন। তিনি মনে মনে একটা সংকল্প এঁটে তৎক্ষণাৎ রিজার্ভ রাখা গোলা-বারুদ সমস্ত সংগ্রহ করে দূর-পাল্লার বড় বড় কামানগুলো সাজিয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন।

ইংরেজরা এদেশী গুপ্তচরদিগকে নানা বেশে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছিল; তারাই এখন বিপ্লবী পক্ষের কালস্বরূপ হয়ে অনর্থ ঘটাতে লাগল। জেনারেল রোজ অবরোধ বজায় রেখে সংগোপনে তিহরী-রাজের কাছে সাহায্যের ভরসা পেয়ে তাস্তিয়ার বিরুদ্ধে ধাবিত হলেন। ঝাঁসী থেকে কুচ করে রোজ সাহেব অতি সন্তর্পণে ক্রোশের পর ক্রোশ এগিয়ে চলেছেন—ওদিকে রাত্রিও আসন্ন হয়ে এসেছে; এমন সময় আর এক গুপ্তচর খবর আনল—মাইল খানেক তফাতে রোজ সাহেব প্রথম যেখানে তাঁবু ফেলেছিলেন—তাস্তিয়া তাঁর অগ্রগামী অশ্বারোহী সেনাদলের সঙ্গে সেই ময়দানে এখ

বিশ্রাম করছেন। তাঁর ফৌজ খুব শ্রান্ত তোপখানা এসে পড়লেই ঝাঁসীর দিকে কুচ করবেন।

রোজ সাহেব বুঝলেন, তাহলেই সর্বনাশ—পিছনে ঝাঁসীর কেল্লা, সামনে ফৌজ নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ তান্তিয়া। তিনি তখন আরও তৎপর হ'য়ে তোপখানা ও তার পিছনে সঙ্গীন-ধারী পল্টন নিয়ে তান্তিয়া তোপীকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করতে ছুটলেন। তোপীর পরিশ্রান্ত বাহিনী বিস্তীর্ণ একটা প্রান্তরে তাঁবু ফেলে তখন নৈশ ভোজনে রত—এমনি সময় রোজের গোলন্দাজগণ বৃষ্টিধারাবৎ গোলাবর্ষণ করে তাদের অভ্যর্থনা করল—আক্রান্ত সিপাহীরা অস্ত্রধারণেরও অবসর পেল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বিশাল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং রোজের বিজয়োন্মত্ত সেনাবাহিনী অগ্রবর্তী হয়ে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত তোপীর তোপখানা—বিস্তর রণসম্ভার সহ দখল করে নিল।

নৈশ ভোজনের প্রারম্ভে তান্তিয়া সেই প্রান্তর থেকে সাংকেতিক হাউই ছুঁড়ে অগ্নির অক্ষরে তাঁর আগমন-বার্তা ঝাঁসী দুর্গে রাণীকে জানিয়ে দেন। তার ফলে রাণীর রণ-বাহিনী সাগ্রহে তান্তিয়ার প্রতীক্ষা করতে থাকে। এমন সময় এই দুঃসংবাদে তারা ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু রাণী কিছুমাত্র নিরাশ না হয়ে স্বয়ং সেনাদলের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে উৎসাহ দিয়ে এবং দুর্গ-প্রাচীরের উপরে উঠে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে ফিরতে লাগলেন। রাণীর

পক্ষে এ ভাবে আশাভঙ্গ এবং জেনারেল রোজের পক্ষে শুভযোগ সত্ত্বেও ঝাঁসীর বীর-বাহিনীর তুমুল বিক্রমে ইংরেজ সেনা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। এমন কি, এক সময় ইংরেজের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল যে, জেনারেল রোজ অবরোধ তুলে তফাতে সরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলেন। কিন্তু ইংরেজ শুধু অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে না, সেই সঙ্গে কূটবুদ্ধি ও যতরকম ছল-চাতুরী আছে—সেগুলিও অতি সন্তর্পণে প্রয়োজনে লাগাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যে তেহরী-রাজ যুদ্ধের প্রারম্ভে রসদ দিয়ে ইংরেজকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি এই সময় রোজের আকুল প্রার্থনায় প্রচুর রণবল পাঠালেন ইংরেজ শিবিরে এবং রাণীর দুর্গের যে অংশের রক্ষা-ভার ছিল দুলারী ঠাকুর নামে এক অভিজ্ঞ বুন্দেলা সরদারের উপর—ইংরেজের কাছ থেকে টাকা খেয়ে সেই বিশ্বাসঘাতক দুর্গের দক্ষিণ দ্বার খুলে দিয়ে ঝাঁসীর সঙ্গে রাণীর পতনের পথ প্রশস্ত করে দিল। দুর্গের অপরাংশে যুদ্ধরত সেনাদল স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখল যে, দুলারী ঠাকুর-রক্ষিত দক্ষিণ দ্বার দিয়ে পিল-পিল করে গোরা সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করছে। রাণীও নির্বাক্ দৃষ্টিতে দেখলেন এ দৃশ্য, তাঁর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। যেদিকে তিনি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ছিলেন, সেই দিক দিয়েই পরাজয় নিদারুণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রক্ষীবাহিনী নিয়ে বাধা দিতে ছুটলেন, প্রথম অভিযাত্রী গোরা দলকে আক্রমণ করে নির্মূলও করলেন ; কিন্তু পিছন থেকে তখন স্রোতের মত অসংখ্য সেনাদল দুর্গে প্রবেশ

করছিল। রাণীর সেনাপতিরা অতি কষ্টে তাঁকে দুর্গের এক নিরাপদ অংশে নিয়ে গেলেন। রাণী তখন নিজেও আহতা হয়েছেন; কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে সেই অবস্থাতেই সেইখানে মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করে কর্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হলেন। কর্ত্তব্য স্থির করেই রাণী পুরুষ-বেশে সজ্জিতা হলেন; দত্তকপুত্র দামোদর তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক; রাণী তাকে শক্ত শালে জড়িয়ে নিজের পীঠে বেঁধে নিলেন— যোদ্ধারা যে ভাবে সামরিক উপকরণ পীঠে তুলে নেয়। সেই অবস্থায় রাণী কাশী, মন্দার প্রভৃতি তাঁর বীরাঙ্গনা সহচরী এবং বাছা-বাছা পঞ্চাশ জন শক্তিশালী নির্ভীক দুঃসাহসী যোদ্ধার সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে অসম সাহসে গোরাদের শিবির ভেদ করে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে জেনারেল রোজ সদলবলে কেল্লায় প্রবেশ করে দেখলেন—রাণী নেই, তিনি তাঁদের চোখে ধূলি দিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেছেন। তখনি এ ব্যাপারে তদন্ত আরম্ভ হতে প্রকাশ পেল যে, রাত্রির অন্ধকারে একটি দল কেল্লা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় রক্ষীদলকে জানায় যে, তারা তিহরীর সেনানী নথে খাঁর দল। রক্ষীরা এরূপ পরিচয় পেয়ে তাদের গতিরোধ করেনি। রোজ বুঝলেন, ধূর্ত্তামীতেও এই নারী অসামান্যা—এভাবে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে তিনি দুর্গত্যাগ করেছেন। জেনারেল রোজ তৎক্ষণাৎ সেনানী বোকারকে এক দল অশ্বারোহী গোরা সৈন্যসহ রাণীর অনুসরণে পাঠালেন।

ঝাঁসী থেকে বেরিয়ে রাণী সদলবলে কাল্পী অভিমুখে ছুটলেন। সুসময়ে একদা এই পথে রাণী স্বামীর সঙ্গে কাল্পীর জঙ্গলে সখের শিকার খেলতে গিয়েছিলেন—সেই সুখস্মৃতি মনে পড়তেই চোখ ছুটি তাঁর অশ্রুময় হয়ে উঠল।

ভোরের সময় রাণী তাঁর দলটি নিয়ে কাল্পীর কাছাকাছি ভান্দিরা নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হলেন। সারারাত্রি তাঁরা অভুক্ত—জলস্পর্শেরও অবসর পান নাই। এই অবস্থায় প্রাতঃ-কৃত্যাদি তাড়াতাড়ি সেরে প্রাতঃরাশে সবে মাত্র তাঁরা বসেছেন, এমন সময় পিছনের দিকে তাকাতেই দেখলেন—ধূলার একটা কুণ্ডলী ধোঁয়ার আকৃতি ধরে তাঁদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। রাণা বললেন: আমাদের চাতুরী রেজ সাহেব ধরে ফেলেছেন, তাই পলাতকদের ধরবার জন্যে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন।

সাথীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল: তাহলে এখন আমরা কি করব?

রাণী বললেন: আমাদের অদৃষ্টে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে খাবারও ফুরসদ নেই; তবুও যে ভাবে পার—খেয়ে নাও, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে দাঁড়াও, কাল্পীতে যাবার আর সময় নেই; ঘোড়াগুলো এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে—এখন আর ছুটতে পারবে না। তার চেয়ে এসো, আমরা এইখানেই যুদ্ধের জন্য ঘুরে দাঁড়াই।

খেতে খেতেই রাণীর সঙ্গীরা সকলে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। দামোদরকে আগেই খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাশী ও

মন্দারের কাছে তাকে দিয়ে রাণী একটু তফাতে তাদের সরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাণী একটা ব্যূহ নির্মাণ করে রক্ষীদের সাজিয়ে দাঁড়ালেন। এমনি সময় অশ্বারোহী দল নিয়ে বোকার ঝড়ের বেগে এসে পড়লেন, কিন্তু তিনিই সর্বাগ্রে আক্রান্ত হয়ে ঘোড়া থেকে লুটিয়ে পড়লেন। সেনানীর মৃত্যু দেখে এবং হঠাৎ চারদিক দিয়ে আক্রান্ত হয়ে পথশ্রান্ত গোরা অশ্বারোহীদের উৎসাহবহ্নি এমন ভাবে নিবে গেল যে, একটি ইংরেজকেও এখানকার দুঃসংবাদ বহন করে জেনারেল রোজের কাছে আর ফিরে যেতে হলো না।

অতঃপর রাণী সদলবলে কাল্পীতে এসে দেখলেন, নানা সাহেবের ছোট ভাই রাও সাহেব সেখানে সৈন্য সজ্জা করছেন। হতাবশিষ্ট ও ছত্রভঙ্গ সেনাদের নিয়ে তান্তিয়া তোপীও কাল্পীতে উপস্থিত হয়েছেন। রাণী তাঁর প্রিয় অশ্বটির পীঠ থেকে নামবামাত্র অবসন্ন দেহে সে লুটিয়ে পড়ল। রাণীও তাড়াতাড়ি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আর্ত্তকণ্ঠে বললেন: আমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে তুই কি পালিয়ে যাবি রে! না— তা হবে না, তোকে উঠতে হবে, আমি আবার তোর পীঠে উঠে লড়াই করব।

রাণীর ইঙ্গিতে অনুচররা ছুটে এলো। রাণী তাদের উপর তাঁর প্রিয় বিজলীর পরিচর্যার ভার দিয়ে বেশ পরিবর্তন করতে গেলেন।

রাণীর আগমন বার্তায় কাল্পীর ঘাঁটিতে নূতন করে যেন

উৎসাহের জোয়ার এলো। শত শত কণ্ঠে রাণীর নামে জয়ধ্বনি উঠল। রাণীকে দেখে তান্তিয়া মুখখানা নত করে অপরাধীর মত নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন—অতর্কিত আক্রমণ-জনিত পরাজয়ের গ্লানি তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারলে তিনি ত জীবনে শান্তি পাবেন না। রাণী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন: যা হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। সামনেই ত আমাদের মস্ত পরীক্ষা রয়েছে, তবে আর ভাবনা কি?

এর পর রাণী রাও সাহেবের সামনে গিয়ে তাঁর পদতলে নিজের দীর্ঘ যুগ্ম তরবারি রেখে সবিনয়ে বললেন: আমার স্বামীর পূর্বপুরুষ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আপনাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে ঝাঁসী রাজ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই ঝাঁসীর উত্তরাধিকারিণী আমি। ঝাঁসী হারিয়ে ঝাঁসী উদ্ধারের জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

রাণীর কথায় অভিভূত হয়ে রাও সাহেব তরবারি-যুগল রাণীর হাতেই পুনরায় অর্পণ করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন: ঝাঁসী উদ্ধারের জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। রাণী এ পর্যন্ত যা করেছেন, যে ভাবে অদ্ভুত শৌর্য দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এই আদর্শ তরবারি ধারণ করবার যোগ্য অধিকারিণী রাণী নিজে। আমরা রাণীকেই পুরোভাগে রেখে যুদ্ধ করব—ঝাঁসী উদ্ধারের জন্য।

কাল্পীতে রাণীর আগমনের পরেই রাও সাহেবের আহ্বানে

বান্দার নবাব, শাহগড়ের রাজা ও রাণাপুরের রাও তাঁদের সেনাদল নিয়ে কাল্পীতে এসে মিত্র বাহিনীর দলপুষ্ট করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে তান্তিয়া তোপী সম্মিলিত দলের সেনাপতি হলেন। এই সময় রাণী বললেন: আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি, রোজ সাহেবকে সাহায্য করবার জন্য সেনাপতি হুইটলেফ আসছেন। তার আগেই রোজকে আক্রমণ করা আমাদের উচিত।

তখনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু এঁরা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে খবর এল যে, জেনারেল রোজ মিলিত বাহিনী নিয়ে কাল্পীর পথে এগিয়ে আসছেন। কাল্পী থেকে ৪২ মাইল দূরে কুঁচ গাঁও নামক স্থানে উভয় সেনাদলে সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু ইংরেজ পক্ষের প্রবল তোপখানার গোলা বর্ষণে রাও সাহেবের সম্মিলিত সেনাদলে রীতিমত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। রাণী দেখলেন, তিনি যে নিয়মানুবর্তী নির্ভীক সুস্থির সেনাদল নিয়ে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত, এখানে তার পদে পদে অভাব। বিভিন্ন রাজ্যের পাঁচ মিশালি সৈন্য মিলিত হলেও সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় যুদ্ধের সময় সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছে। ওদিকে সুশিক্ষিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ইংরেজ সেনা। রাণী বুঝলেন, সম্মিলিত বাহিনীকে ঠিক মত শিক্ষা না দিয়ে তাড়াতাড়ি যুদ্ধে নামিয়ে তাঁরা খুবই ভুল করেছেন। কুঁচ গাঁওএর যুদ্ধের পরিণাম খুবই শোচনীয় হলো। রাণী দেখলেন, সময় থাকতে পরাজিত সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে না গেলে সকলকেই মরা

পড়তে বা মৃত্যু বরণ করতে হবে। এ অবস্থায় সৈন্যদিগকে পিছু হঠিয়ে অন্তর্দ্ধান করাই মস্ত কৃতিত্ব। কুঁচ গাঁওয়ের যুদ্ধে সে কৃতিত্ব রাণী পূর্ণমাত্রায় দেখালেন। দক্ষ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে চমৎকৃত হলেন।

কুঁচ গাঁও থেকে রাণী, রাও সাহেব ও অন্যান্য নেতৃবর্গ পুনরায় কাল্পীতে ফিরে এলেন। এখানে পরাজয়ের দরুণ প্রত্যেক দল যখন অপর দলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বাহাদুরী নিতে ব্যস্ত, সেই সময় রাণী এসে বললেন: যুদ্ধে যখন পরাজয় হয়েছে, সে অপবাদ প্রত্যেককে নিতে হবে। আর—কেন পরাজয় হয়েছে, তার কারণ জেনে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া চাই। আমাদের এই পরাজয়ের প্রধান কারণ—শৃঙ্খলা ও সংগঠনের অভাব। যুদ্ধের সময় সেনানীরা স্ব স্ব প্রধান হয়েই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে। এখন শপথ করুন সকলে—কুঁচ গাঁওয়ের পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা কেউ ঘুমাব না।

রাণীর কথায় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়ে সকলেই সমস্বরে রাণীর উক্তি আবৃত্তি করে রাণীর নামে পুনরায় জয়ধ্বনি তুলল।

তাত্তিয়া খবর পেয়েছিলেন, হায়দ্রাবাদের নিজামের দেখাদেখি গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াও জেনারেল রোজের রণবাহিনীকে সাহায্য কররার জন্য উসখুস করছেন, কিন্তু গোয়ালিয়রের সৈনিকরা ইংরাজবিরোধী এবং সিপাহীদের পক্ষপাতী বলেই তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হয় নাই। রাণী এ কাহিনী শুনেই বললেন: তাহলে আমাদের উচিত এই সুযোগে

গোয়ালিয়র দুর্গ সর্বাগ্রে দখল করে এবং সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ঝাঁসীর উদ্ধারে ফিরে আসা।···রাণীর এই যুক্তি তাত্তিয়াও সঙ্গত ভেবে সমর্থন করলেন। এর পর সসৈন্য গোয়ালিয়র অভিমুখে রাণী ধাবিত হলেন; বীর তাত্তিয়াও তাঁর সেনাদলকে সংগঠিত করে চালিত করতে লাগলেন।

সিন্ধিয়া রাণীর আগমন-বার্তা পেয়ে বাধা দেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল রোজের কাছেও খবর পাঠালেন। রোজ সাহেব তখন মধ্য-ভারতের 'সর্বত্র তন্ন-তন্ন করে রাণীর সন্ধান করছিলেন; কিন্তু রাণী বিদ্যুদ্বেগে তাঁর অবরোধ ভেদ করে যাদুকরীর মত গোয়ালিয়র আক্রমণে সচেষ্ট শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন। জেনারেল রোজ তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে গোয়ালিয়র অভিমুখে কুচ করলেন। এদিকে সিন্ধিয়ার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিরোধ চূর্ণ করে রাণী যখন গোয়ালিয়র দুর্গের উপর ঝাঁসীর বিজয়-কেতন স্থাপিত করেছেন, ঠিক সেই সময়ে অসংখ্য তোপের শব্দে চতুর্দিক্ প্রকম্পিত করে গোয়ালিয়রে জেনারেল রোজের বাহিনীর আগমন-বার্তা ঘোষণা করল। এবার আরম্ভ হলো নূতন করে হাতাহাতি যুদ্ধ—গোয়ালিয়রের সকল স্থান জুড়ে চলতে লাগল ভীষণ রণতাণ্ডব। ১৮ই জুন তারিখে সারা দিনব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধে রাণীর সেনাদল বিধ্বস্তপ্রায় হলে, তিনি রামচন্দ্ররাও দেশমুখ নামক এক বিশ্বস্ত সরদারের হাতে দামোদরকে অর্পণ করে কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ও সহচরীদের নিয়ে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করে অরণ্য অভিমুখে

ধাবিত হলেন। কতিপয় গোরা সৈনিকও রাণীকে বন্দিনী করবার জন্য তাঁর অনুসরণ করল। সেই অবস্থায় রাণী সহসা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সন্নিহিত গোরা সৈনিককে আক্রমণ করে খড়্গাঘাতে শমনসদনে পাঠিয়ে পুনরায় অগ্রবর্তিনী হলেন। খানিক পরে গুলীর শব্দের সঙ্গে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে রাণী পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, তিন জন গোরা একসঙ্গে তাঁর দুই সহচরী কাশী ও মন্দারকে আক্রমণ করেছে— শত্রু-গুলীতে তারা উভয়েই আহতা হয়ে আর্তনাদ তুলেছে। রাণী তৎক্ষণাৎ ঘোড়াকে ঘুরিয়ে একাই সেই তিন জন গোরার সম্মুখীন হলেন। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জনৈক গোরার সঙ্গীনে রাণীর কমনীয় আননের একাংশ একটি চোখের সঙ্গে ছিন্ন হলো; সেই অবস্থায় রক্তাপ্লুত দেহে আহতা ব্যাঘ্রীর মত রাণী একে একে তিন আততায়ীকে নিহত করে পুনরায় অরণ্যমুখী হলেন। আহত অবস্থায় অশ্বটি অতিকষ্টে রাণীকে পৃষ্ঠে বহন করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। এদিকে রামচন্দ্ররাও দেশমুখ দামোদরকে কোলে নিয়ে বনপথে অতি সন্তর্পণে আসতে আসতে রাণীকে এই অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখনই তিনি আহতা রাণীকে গঙ্গাদাস বাবাজী নামে এক সাধুর কুটীরে নিয়ে গেলেন। সেখানে রাণীকে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল পান করান হলো। সুশীতল পবিত্র গঙ্গাজল পান করে রাণী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে স্নেহপূর্ণলোচনে রামচন্দ্রের ক্রোড়স্থিত দামোদরের দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করলেন; পরক্ষণে তাঁর চক্ষু

চিরদিনের মত দীপ্তিহীন হলো—মহীয়সী রাণীর অমর আত্মা সূর্যমণ্ডল ভেদ করে অমরধামে চলে গেল। রণমৃত্যুর পর দেহমুক্ত আত্মার দিব্যগতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে :

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥

রণমৃত্যুর ফলে তেজস্বিনী বীরনারী রাণী লক্ষ্মীবাঈএর দেহমুক্ত আত্মারও সেই দিব্যগতি প্রাপ্তি হলো—ভূতলে অমর হয়ে রইল তাঁর অতুলনীয় কীর্তি।

রাণী লক্ষ্মীবাঈএর দত্তক পুত্র দামোদর রাওয়ের পরিণাম কাহিনী

[সিপাহী-বিপ্লব অবসানের প্রায় দু'বছর পরে ইংরেজ রাণীর পালক পুত্র দামোদর রাওএর সন্ধান পায়। মাতৃ বিয়োগের পর এই বালকের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন পরিচয় নেই। দামোদর রাও নিজেই তাঁর নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ের এক কাহিনী মহারাষ্ট্র ভাষায় লিপিবদ্ধ করে ঐতিহাসিকদের কর্ত্তব্যের পথ সহজ করে দিয়েছেন। সেই কাহিনী খুব সংক্ষেপে পরিশিষ্টে বিবৃত হলো।]

রাণী লক্ষ্মীবাঈএর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র দামোদর রাও অসহায় হয়ে পড়লেন। রাণীর দলের অনেকে ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও তাঁর কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর দামোদর রাওয়ের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। রাণীর পূতাস্থি সংগ্রহ করে সর্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ, রঘুনাথ সিংহ, গণপত রাও মারাঠা, ছনে খাঁ রিসালদার প্রভৃতি দামোদর রাওকে নিয়ে গোয়ালিয়র ত্যাগ করলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল ৬০ জন সৈনিক, ২২টি ঘোড়া ও ৬টি উট।

দামোদর রাওএর গন্তব্যস্থল ছিল চন্দেরী। কিন্তু সহজ পথে গেলে পাছে তাঁরা ইংরেজদের হাতে পড়েন, সেই জন্য তাঁরা দুর্গম বনের মধ্য দিয়ে চললেন। ইংরেজদের ভয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের আশ্রয় দিতে সাহস করত না। কখনও অনাহারে,

কখনও বা অর্দ্ধাহারে তাঁরা দিন যাপন করতে লাগলেন। ভাগ্যহীন দামোদর রাওএর দুঃখ কষ্টের অন্ত রইল না।

দু'মাস অবর্ণনীয় কষ্টভোগের পর তাঁরা চন্দেরী ললিতপুর পরগনার তালবেট কোঠরা নামক গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হলেন। গ্রামের ঠাকুর দেওয়ান শঙ্করসিংহ ও গম্ভীরসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁরা কিছু দিনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ঠাকুর সাহেবরা ইংরাজদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে রাণীর অনুগত লোকজনদের গ্রামে আশ্রয় দিতে প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হলেন বটে, তবে সংগোপনে জানিয়ে দিলেন যে, দামোদর রাও সানুচর যদি কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে গোপনে থাকেন, তবে তাঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করতে পারেন। এই ব্যবস্থা খুব সমীচীন বোধ না হলেও বাধ্য হয়ে তাঁদের রাজী হতে হল। তালবেট কোঠরার জঙ্গলেই দামোদর রাওএর বসতির ব্যবস্থা হল।

ইংরেজদের দৃষ্টিপথে পড়বার সম্ভাবনা যাতে না থাকে, সেই জন্য তাঁরা ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করলেন। রাণীর পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথ সিংহ দামোদর রাওএর সঙ্গে তালবেট কোঠরায় রয়ে গেলেন। ঠাকুর সাহেবরা মাসিক ৫০০৲ টাকার বিনিময়ে ১২ জন লোকের উপযোগী খাদ্য-সামগ্রী বনের মধ্যে পাঠাতে লাগলেন। উপরন্তু ৪টি উট ও ৯টি ঘোড়া আপনাদের কাছে রেখে পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁদের কাছ থেকে ইংরেজ-সৈন্যের গতিবিধিরও খবর পাওয়া যেতে লাগল।

তালবেট কোঠরার গহন অরণ্যে, কখনও গুহামধ্যে, কখনও বা গাছের উপর মঞ্চে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার প্রকোপ সহ্য করে দামোদর রাও দু'বৎসর কাটালেন। কিন্তু বালক দামোদর রাওএর এত কষ্ট সহ্য করবার শক্তি ছিল না—তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বনের মধ্যে চিকিৎসক পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু চিকিৎসার অভাবে পাছে দামোদর রাও মারা যান, সেই জন্য তাঁর অনুচরবর্গ সুচিকিৎসক শঙ্করসিংহ ঠাকুরকে অনেক অনুরোধ করে নিয়ে এলেন, তাঁর চিকিৎসায় দামোদর রাও আরোগ্য লাভ করলেন।

রাণীর মৃত্যুর সময় দামোদর রাওএর কাছে সোনা রূপা ও জহরাদি ছাড়া নগদ প্রায় ৭০ হাজার টাকা ছিল। ঠাকুর সাহেবদের প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সব নগদ টাকা শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি মণিমুক্তা ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করতে লাগলেন। কিন্তু সেই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলির ন্যায্য মূল্য স্থির করতে না পেরে ওজন দরেই তার মূল্য পেলেন। দামোদর রাওএর অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন ঠাকুর সাহেবরা। যখন তাঁরা বেশ ভালভাবে বুঝতে পারলেন যে, দামোদর রাও প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, তখন তাঁরা সেই অসহায় অবস্থায় তাঁকে স্থান ত্যাগ করবার আদেশ দিলেন। তাঁদের কাছে গচ্ছিত ৯টি ঘোড়া ও ৪টি উটের মধ্যে মাত্র ৩টি ঘোড়া তাঁরা ফিরিয়ে দিয়ে জানালেন যে, বাকীগুলি মারা গেছে।

দশ-বার জন অনুচর সমেত দামোদর রাও আবার অনিশ্চিতের

পথে পা বাড়ালেন। প্রথমে তাঁরা সিন্ধিয়া সরকারের রাজ্য মধ্যে 'সিপ্রি কোহ্লারম' নামক একস্থানে উপস্থিত হলেন। পথে আরও ১০।১২ জন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। এইস্থানে তাঁরা একটি উদ্যানে অবস্থান করতে লাগলেন। এই অবস্থায় স্থানীয় কমাওয়েসদার বা করসংগ্রাহক তাঁদের ঝাঁসীর রাণীর দলের লোক বলে সন্দেহ করে সকলকে বন্দী করতে উদ্যত হন। রঘুনাথ সিংহ তখন তাঁকে দামোদর রাওএর প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে কিছু অর্থ দিলে তিনি তুষ্ট হয়ে দামোদর রাওকে ছেড়ে দেন। এর পর তাঁরা পাটন জিলার অন্তর্গত 'ছীপা বড়োদে' গ্রামে উপস্থিত হলেন। এই স্থানের কমাওয়েসদার তাঁদের আসার খবর পাওয়া মাত্রই তাঁদের সকলকে গ্রামের মধ্যে বন্দী করে রাখলেন। তিন দিন তাঁরা একটি গড়ের মধ্যে আটক হয়ে রইলেন। চতুর্থ দিন ২৫ জন সৈন্যের বেষ্টনী মধ্যে থেকে তাঁরা পাটনের এজেন্ট সাহেবের নিকট প্রেরিত হলেন। কমাওয়েস-দার দামোদর রাওএর ঘোড়া ৩টি ও সমুদয় আসবাব পত্র আত্মসাৎ করলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈএর বিশ্বস্ত অনুচরেরা পাছে দামোদর রাও পথশ্রম সহ্য করতে না পারেন, সেই জন্য তাঁকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন।

ছীপা বড়োদের তিন মাইল দূরে এক নদীর তীরে সকলে উপস্থিত হলে দামোদর রাও শৌচাদি করবার জন্য অবতরণ করলেন ; এই সময় হতে তাঁর জীবন এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হল। নদীতীরে হঠাৎ সেনাবিভাগের দু'জন ইংরেজ অফিসারকে

দেখা গেল এবং তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈএর বিশ্বস্ত অনুচর গণপত রাও। তিনি দামোদর রাওকে দেখতে পেয়েই সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন তাঁদের আগ্রহে অপহৃত তিনটি ঘোড়া ও সমস্ত আসবাবপত্র দামোদর রাওকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করতে কমাওয়েসদার বাধ্য হলেন। এই সময় দামোদর রাও সানুচর ইংরেজদের হস্তগত হলেন।

দামোদর রাও যখন গোয়ালিয়র ত্যাগ করে তালবেট কোঠরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অনুচরেরা ৬টি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এইরূপএক দলে গণপত রাও মারাঠা ও হুনে খাঁ রিসালদার পাটন অঞ্চলে গমন করেন এবং সেখানকার রাজা পৃথ্বী সিংহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পাটনের কিছু দূরে আগর নামক স্থানে ইংরেজদের এক সেনানিবাস ছিল। মেজর ফ্লীক নামে এক সদাশয় ইংরেজ সেখানকার পোলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। হুনে খাঁর সঙ্গে মেজর ফ্লীকএর বিশেষ হৃদ্যতা হওয়ায় হুনে খাঁ তাঁকে দামোদর রাওএর দুরবস্থার কথা জানালেন। মেজর ফ্লীক দামোদর রাওএর দুরবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁকে আশ্রয় দিতে সানন্দে রাজী হলেন। এই সময় মধ্য-ভারতের পোলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন কর্ণেল সেক্সপীয়র। তাঁর কর্মস্থান তখন ইন্দোর। মেজর ফ্লীক হুনে খাঁর প্রার্থনার বিষয় তাঁকে জানালে তিনিও তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। মেজর ফ্লীকএর আদেশে হুনে খাঁ

পাটনে 'সেনট্রাল ইণ্ডিয়া হর্স' নামক সৈন্যদলের দু'জন ঘোড়সওয়ারএর সঙ্গে দামোদর রাওকে নিয়ে যাবার জন্য পাটনে এলেন। পাটনে এসেই হুনে খাঁ গণপত রাও মারাঠাকে দামোদর রাওকে আনবার জন্য প্রেরণ করেন। দামোদর রাওএর গতিবিধি কিছুই হুনে খাঁ বা গণপত রাও মারাঠার অগোচর ছিল না। দামোদর রাওএর দুর্দ্দশা দেখে গণপত রাও অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। এই দিন হতে দামোদর রাওএর কায়িক কষ্টের কিছু লাঘব হলো।

পাটনের রাজা পৃথ্বী সিংহ দামোদর রাওকে বিশেষ সমাদর করলেন। রাজা প্রত্যহ দামোদর রাওকে ১০৲ টাকা করে তাঁর নিজের ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য দিতে লাগলেন। তিনি দামোদর রাওকে আরও আশ্বাস দিলেন যে, আজমীরের রেসিডেণ্ট সাহেবকে দিয়ে তাঁর জন্য ভালবন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দামোদর রাওকে সর্বদা অনুসরণ করছিল। তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ইংরেজদের প্রতিশ্রুতির উপরও তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। রাজা পৃথ্বীসিংহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে দামোদর রাওকে পাটনের ২ মাইল দূরে 'মেঘজীন' নামে এক স্থানে বাস করবার জন্য আদেশ দিলেন। মতানৈক্য হ'লেও দামোদর রাওএর আহারাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য পূর্বাবস্থার কোন ব্যতিক্রম তিনি করেননি। এইভাবে প্রায় তিন মাস দামোদর রাওকে পাটনে থাকতে হলো।

অনেক লেখালেখির পর আজমীরের রেসিডেণ্টের আদেশে

রাজা পৃথ্বীসিং দামোদর রাওকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। বিদায় নেবার সময় রাজা দামোদর রাওকে পাথেয়স্বরূপ ৬০০৲ টাকা এবং সেই সঙ্গে দুটি উট ও দুটি গাভী উপহার দিলেন।

কয়েক দিন পরে তাঁরা আগরের ছাউনীতে উপস্থিত হলেন। মেজর ফ্লীক দামোদর রাওকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সাহেবকে উপঢৌকন দিতে দামোদর রাওএর শেষ সম্বল ৩২ তোলা ওজনের সোনার বালা দু'টি বিক্রয় করতে হল। দামোদর এবার সত্যই একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পড়লেন।

দামোদর পাটনে এসেছেন সংবাদ পেয়ে তাঁর প্রাণরক্ষক, রাণীজীর বিশ্বস্ত সর্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ ৭।৮টি ঘোড়া ও ৯।১০ জন অনুচর সহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অন্যান্য অনুচরেরাও সকলে এইস্থানে মিলিত হলেন। রামচন্দ্র রাও দেশ-মুখ, গণপত রাও ও রঘুনাথ সিংহ মেজর ফ্লীককে দামোদর রাও-এর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করবার জন্য সমবেত ভাবে অনুরোধ করলেন। মেজর ফ্লীক মহৎ প্রকৃতির লোক হলেও দামোদর রাওএর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করবার ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল না। মধ্য-ভারতের রেসিডেণ্টই ছিলেন এই ব্যাপারে ব্যবস্থা করবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তা। সেই জন্য মেজর ফ্লীক দামোদর রাওকে ইন্দোরে পাঠালেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে দামোদর ইন্দোরের সেনানিবাসে উপস্থিত হলেন।

ইন্দোরের রেসিডেণ্ট স্যার রিচমণ্ড সেক্সপীয়র তাঁর মুন্সী

ধরমনারায়ণ নামে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের উপর দামোদর রাও-এর তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। দামোদর রাওএর অনুচরদের ভিতর থেকে ৪।৫ জন ছাড়া আর সকলকে ধরমনারায়ণ বিদায় দিলেন। ভারত সরকার দামোদর রাওএর জন্য মাসিক দেড়শত টাকা মাত্র বৃত্তির বন্দোবস্ত করলেন। বার্ষিক ৫০।৫৫ লক্ষ টাকা আয়-সম্পন্ন ঝাঁসী রাজ্যের অধীশ্বর ইংরাজ সরকারের আশ্রয়ে এইভাবে সামান্য বৃত্তিভোগী হয়ে ইন্দোরে বাস করতে লাগলেন। নিয়তির কি নির্মম বিধান!

সমাপ্ত